নব্য ভারত
(ক্ষত্রাণী)

পরমারাধ্য শ্রীযুত অবিনাশ চন্দ্র গুহ, এম্-এ, বি-এল্
পিতৃদেব মহোদয়ের লিখিত বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত
[redacted] প্রবন্ধাদির সমাবেশ।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ গুহ কর্তৃক সংগৃহীত

কলিকাতা, ৩রাই আশ্বিন,
সোমবার, তেরশত সাঁইত্রিশ।

Khirman-i-adab — (Pr.) — lit. store-house of literature.
Majmua-i-mazāmin — (Pr.) — প্রবন্ধ।



রামচন্দ্রপুরং নাম বিদ্যতে যৎ পদং [redacted] ভুবি।
বরিশাল ইতি খ্যাতে নগরে [redacted] গুনি সেবিতে ॥
বসতি কোবিদস্তত্র গুনবান্ গুহবংশজঃ।
অবিনাশাভিধঃ শ্রীমান্ নানাভাষাবিশারদঃ ॥
অধীশ্বরো দত্তভুবঃ ব্যবহারা[redacted]ভিজ্ঞস্তু সঃ।
ধীমতো নন্দনস্তস্য দান্তো দ্বিজেন্দ্রনামকঃ।
বিদ্বজ্জন-বিনোদায় উচ্চাতি পিতৃলেখনম্ ॥

সূচীপত্র।

কবিতা।

(বর্ণানুক্রমিক)

[redacted]

[redacted] নাম।	যে পত্রিকা হইতে গৃহীত।	পত্রাঙ্ক।
সাবর্ষা-গীতি (চতুর্দ্দশপদী কবিতা)	নব্যভারত, [redacted] শ্রাবণ।	২১৮
সারঙ্গলী ব্রাহ্মণ	নব্যভারত, সন ১৩০২, শ্রাবণ।	২০১
স্বভীম কান্ত (চতুর্দ্দশপদী কবিতা)	নব্যভারত, সন ১২৯৯, মাঘ।	৫২৫
*সমঙ্গলোপহার	নব্যভারত, সন ১৩০৪, ফাল্গুন।	৫৬১
১৪। শ্রীশ্রী মহামায়া বিগ্রহে	কায়স্থ-সমাজ, সন ১৩৪৪, শ্রাবণ।	

---

*নব্যভারত, সন ১৩০৪ সাল, ফাল্গুন, পৃষ্ঠা ৫৬১ স্থিত গীতের স্বরলিপি।

রাগ বসন্ত — তাল তেতালা। +

+ গানের স্বরলিপি প্রকাশন— "মন্দিরা," ভাদ্র—১৩৬১, পৃ: ৬১০-৬১৭; "সঙ্গীত-বিজ্ঞান প্রবেশিকা," জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়, ১৩৬১, পৃ: ৩০-৩২। (দুইটি, ধা কোমল পঞ্চম বিবাদী)

আস্থায়ী

০				২				+				৩			
সা	সা	নি	ধ	নি	সা	ম	ম	গ	ম	ধ	ম	ম	ম	গ	০
কে	তু	মি	এ	লে	০	ব	হ্নি	ল	০	য়ে	র	স	ন্	তে	০
র্সা	ধ	নি	র্সা	নি	নি	ধ	ম	গ	ম	ধ	মা	গ	ঋ	সা	০
এ	দি	বা	ন	যৌ	০	ব	ন	য	মু	না	রি	ব	ঙ্	কে	০

অন্তরা

০				২				+				৩			
র্গ	র্গ	র্ম	ধ	র্সা	০	র্সা	র্সা	নি	নি	ধ	মা	মা	ধ	নি	র্সা
১। চ	ল	হু	ভী	ম	ন	জী	০	প	ল	ত	র	কে	র	মী	রু
২। ক	ন	ক	ক	ল	সী	জ	য়	ঢু	ও	ঢু	ও	ক	লি	কা	য়
র্সা	র্গ	র্ঋ	র্সা	নি	ধ	র্সা	র্সা	র্সা	নি	ধ	মা	গ	ঋ	সা	০
ঝক	তে	হি	য়	পি	দ্দ	রি	য়	ক	০	ঙ্কি	র	স	ন্	তে	০
যথা	র	তো	না	সা	[illegible]	সা	লে	সে	০	অ	শে	অ	ঙ্	গে	০

সমালোচনী।

[redacted]

(বর্ণানুক্রমিক)

[redacted] নাম।	যে [redacted] পত্রিকা হইতে গৃহীত।	পত্রাঙ্ক।
"এষা"র নামকরণ (১)	নব্যভারত, সন ১৩২৫, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ়।	৯১-১০৩
"এষা"র নামকরণ (২)	নব্যভারত, সন ১৩২৫, চৈত্র।	৫৪৪-৫৫৪
ঐন্দ্র মহর্ষিভবেষক (বৈদিক প্রবন্ধ)	ভারতী, সন ১৩০৯, অগ্রহায়ণ।	৭৪৫-৭৬০
পূর্ণ বাবুর নূতন চিন্তা	নব্যভারত, সন ১৩০৭, মাঘ।	৫১৩-৫১৯
ভাষাতত্ত্ব (১)	নব্যভারত, সন ১৩০৮, মাঘ।	৫৫৩-৫৬২
ভাষাতত্ত্ব (২)	নব্যভারত, সন ১৩০৯, বৈশাখ।	১৪-২৯
সময়বাদ পরীক্ষা (১)	নব্যভারত, সন ১৩০৯, ফাল্গুন।	৬০১-৬০৩
সময়বাদ পরীক্ষা (২)	নব্যভারত, সন ১৩১০, ভাদ্র।	২৬১-২৬৮
মুদীর দোকান	নব্যভারত, সন ১৩১৭, মাঘ।	৬২৫-৬৩৪
সমস্যা-কল্পলতা	নব্যভারত, সন ১৩০৭, চৈত্র।	৬৪৪-৬৪৭

[redacted] নাম।   যে পত্রিকা হইতে গৃহীত।   পত্রাঙ্ক।

ক্ষিতীন্দ্রনাথের নূতন গ্রন্থ   নব্যভারত, সন ১৩০৮, কার্তিক।   ৩৬৬-৩৭৩

—o—

নব্য ভারত, সন ১৩০৪ সাল, ফাল্গুন, পৃষ্ঠা ৬৬১ স্থিত গীতের স্বরলিপি।

রাগ সিন্ধু ভৈরবী — তাল তেতালা। +

+গানের স্বরলিপি প্রকাশন — "মন্দিরা", ভাদ্র—১৩৬১, পৃ: ৩১৩-৩১৭; "সঙ্গীত-বিজ্ঞান প্রবেশিকা", [redacted] কার্তিক-অগ্রহায়ণ, ১৩৩১, পৃ: ১০২-১০৪। (ঋ, গ, ধ, নি)

আস্থায়ী

০ সা সা ঋ ঋ	গ গ ম প	+ নি নি নিধ ধ	৩ প ০ ০ ০
ব সি বি যে	ক ত না রী	শু নে হা০ সি	পা০ ০য়
০ প নি ধ নি	ধ নি ধ নি	+ ঋ গ মনি ধ	৩ প ০ ০ ০
বি বা হ যে	ভা ল বা সা	সে কি বা০ সি	হ০ ০য়

অন্তরা

০ প ম প ধ	নি সা সা ঋসা	+ নি নি ধ নি	প ধ নিধ
গাঁথি ০ পা তি	মে লী শু লে০	ব স নে রে	বেঁধে চুলে
যাসে ০ ভো কা	লে র শু সে০	শু সি তে শু	সিতে হাসে
০ প নি ধ নি	ধ নি ধ নি	+ ম প ধ নিধ	প ০ ০ ০
গা দি লি য়া ম	লি য়া হে লে	ক র ভা রে ০	ফি০ ০য়
যা সে আ ত র	প্রে হ হা রে	সে কি ক ভু ০	যা০ ০য়

পদ্যের প্রথম পঙ্‌ক্তি।

(অকারাদিক্রমে সজ্জিত)

পদ্যের প্রথম পঙ্‌ক্তি। পদ্যের নাম। পত্রাঙ্ক।

ভুল এসে ভেঙ্গে গেছে, হায়! ("একাকী"), ৬০৮-৬১০

সায়াহ্ন-গগন-ভালে ম্লান রবি-লেখা ("বর্ষা-গীতি"), ২১৮
(চতুর্দ্দশপদী কবিতা)

এবং ভারত, সন ১৩০৪ সাল, ফাল্গুন, পৃষ্ঠা ৫৬৭ মুদ্রিত গীতের স্বরলিপি।
+গানের স্বরলিপি প্রকাশন — "মন্দিরা", ভাদ্র–১৩৬১, পৃঃ ৩৭০–৩৭১; "সঙ্গীত-বিজ্ঞান প্রবেশিকা", অগ্রহায়ণ, ১৩৩২, পৃঃ ৪১-৪৪।

রাগ জয়জয়ন্তী — ঠুংরী। + (দুই তিন সম্পূর্ণ)

আস্থায়ী

সা নি | ধ নি | ধ প | প ০ | রে গ | ম ধ | প মগ | রে গ
হে রি | তো ০ | সে কা | র ০ | হ রি | ন ০ | ন য়০ | নী ০
সা সা | রে ০ | রে রে | রে ০ | রে গ | ম প | প প | ধনি সাঋা
ফু ল | শ ০ | য় নে | সু ০ | ০ ম | র ০ | য় নী | রে০০০
সা সানি
(হে রি ০)

অন্তরা

প প | প প | ধ সা | সা ০ | সা সা | সা নি | ধ নি | সা ০ |
ফু লে | ফু ০ | লে ভু | ল ০ | আঁ খি | না পা | এ কু | ল ০ |
০ সাসা | সা ঋা | ঋা ঋা | ঋা ঋা | গা ঋা | সা নি | ধ নি
০ ফুল | সা য় | রে ০ | ফু ০ | লে না | য় ০ | রী ০
ধ প | * | ধ প |
রে ০ | | রি তু |
প প | প ধ | ধ ধ | ধ ধ | নি ধ | প সা | নি সা | ধ নি
চ কো | র ০ | চাঁ দি | না য় | ক রি | চে ০ | হা য় | হা ০
ধ প | ধ সা | নি সা | ধ নি * | ঋা গ | ম প | ধনি সাঋা | (সা সানি)
০ য় | হা ০ | সে রি | তু ০ | ব ০ | য় নী | রে০০০ | (হে রি ০)

রমণী।

১

অনন্ত মহিমা হ'তে ঝরে কত ফুল
রমণী একটী তার,
ধরণী ভূষণ-সার,
চৌদিকে ফোটায় হাসি, শোভারে অতুল,
চন্দ্র তারা হেরে তাহা হইয়া আকুল।

২

দরশে তাহার জাগে কত হর্ষখেলা,
পরশে পুণ্যের আলো
ঘোচেরে শ্মশান কালো—
স্নেহ প্রেমেতেই দেখি ত্রিভুবন ফেলা!
মূর্খ সে যে জন তারে করে অবহেলা।

৩

হৃদয়ে মধুর বাজে কথাটী রমণী,
মানব আকুল কত
তার তরে অবিরত
সবাই উদ্দেশে তার গায় আগমনী,
রমণী এ সংসারের শ্রেষ্ঠ রত্ন-মণি।

৪

এ জগত রঙ্গভূমে ঘুচে যায় রঙ্গ,
নীরস মরুর প্রায়,
হয় প্রাণ মন কায়,
সমুদয় অভিনয় হ'য়ে যায় ভঙ্গ,
যদিরে অগ্রাহ্য করি রমণীর সঙ্গ।

৫

এ ধরায় তীর্থ যেন রমণীদর্শন,
প্রতি কটাক্ষে তাহার,
বহে প্রণয়ের ধার,
রোমাঞ্চের ফুলবাণ হয়রে বর্ষণ,
রমণীরে ছেড়ে ছার কবিতা দর্শন।

৬

এত দুঃখ এত তাপ মান অভিমান,
মরমের লীলা খেলা,
এই জীবনের মেলা,
সকলি হইয়া যেত ধীরে অবসান,
যদি না বুঝিত কেহ রমণীর মান।

৭

ভুবন-বিজয়ী জানি রমণীর নাম,
মধুর আবেশ-বলে,
তাহার আদেশ চলে,
সে আদেশ শিরোধার্য্য মন-অভিরাম,
রমণীই এ ধরার সুধা, স্বর্গধাম।

শ্রীহিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বসন্তে নিমন্ত্রণ।

অন্ধ-হৃদি বিভাসিনি, এস এস আজি,
তোমারই হাসি মেখে দেখ অই সাজি,
আইল বাসন্তী উষা ধরারে জাগা'তে
সম্ভাষি' আদরে তারে হিমশয্যা হ'তে,
অই দেখ নভঃ যেন অমিয়া হাসিয়া
বিষণ্ণ ধরার বক্ষে পড়েছে গলিয়া;
হের অই সুকোমল কিরণ-হিল্লোল
সুধীরে চুম্বিছে তার আরক্ত কপোল।
সাগর নাচিছে আজ কতই উল্লাসে,
ছুটিছে তটিনী দেখ প্রেমের বিলাসে,
নিঝর শুনিয়া ওই মধুময় গান,
কাননে নিজনে বসি মিলাইছে তান;
কুসুম কলিকা গুলি হাসি ছড়াইয়া,
সুষুপ্ত ধরারে আজ দিল জাগাইয়া,
তুমি যথা মোর পানে চাহি আঁখি খুলি'
দিয়েছিলে জাগাইয়ে সুধাস্রোত ঢালি'।
এস তবে এস আজ হেথা হতে' দূরে,
ছাড়ি পাপ লোকালয় চল সেই পুরে,
কাননে কুসুম গুলি রয়েছে ফুটিয়া,
সেথায় আদরে ওরা লইবে ডাকিয়া;
কিম্বা অই মেঘ পরে দুজনে বসিয়া,
বসন্ত মলয়স্রোতে যাবগো ভাসিয়া,
সেথায় বসিয়া গা'ব পরাণের গান,
তারকারা হেসে হেসে মিলাইবে তান;

গ্রহ হতে গ্রহান্তরে হবে প্রতিধ্বনি ;
একতানে গাবে গান প্রকৃতি-জননী।
এস তবে এস আজ হৃদি-প্রভাসিনি,
আইল বসন্ত অই জাগিল মেদিনী।
প্রাণের বসন্ত তুমি এস একবার,
ও তব মধুর তাপে গলুক তুষার।
নৈরাশ কুঝটি রাশি দেহলো ভাঙ্গিয়া,
নবীন উষার আলো উঠুক হাসিয়া।
এস আজ যাই সেথা প্রকৃতির কাছে,
যেথায় তটিনী আসি সাগর চুম্বিছে ;
সেথায় সাগর বক্ষ উঠিছে ফুলিয়া,
গরবে শশীর দেহ বুকেতে চাপিয়া ;
প্রেম-মন্দাকিনী যেথা চলেছে উছলি,
সাধের পরাণ আজ দিগে সেথা ঢালি'।
ছাড়ি এই পাপধরা ঊর্দ্ধ নভতল,
প্রাণে প্রাণে মিশাইয়ে ভ্রমিব যুগল ;
রোধিতে হবে না সেথা হৃদয়ের স্তরে।
প্রাণের সঙ্গীত-ধারা সংসারের ডরে।

শ্রীঅনঙ্গমোহন ঘোষ।

রমণী।

অনন্ত তরঙ্গময় সংসার-সাগর,
উপরে শোভিছ তার তুমি ধ্রুবতারা,
চিরশুভ্র স্নিগ্ধ জ্যোতি নরের নির্ভর,
নৈলে তারা পদে পদে হ'ত পথহারা।
ও মুখ নিরখি সবে ভবে বাঁধে ঘর,
তুমি গেহ আছ বলে গৃহী তারে কয়,
অমৃত পরশে তব অরণ্য, নগর,
তোমার অভাব যথা সাহারা নিশ্চয়।
ভালবাসা, ভক্তি, প্রীতি, দয়া, মায়া, স্নেহ,
জগত যাহার বলে চলে অনুক্ষণ,
সে গুলি কি তুমি ছাড়া অন্য আর কেহ ?
মধুর মোহিনী শক্তি মধ্য-আকর্ষণ !
তব দয়া ল'য়ে নর হয় দয়াবান,
সারল্য উদারতায় উদার সরল,
তোমার মহত্ত্বে তার হৃদয় মহান,
বিশেষণ সে যে, তুমি বিশেষ্য কেবল !
রমণি ! মণিরখনি ! ভাবে তাই কবি—
কি বলে সম্ভাষে তোমা,—মানবী কি দেবী ?

শ্রীমনোমোহন সেন।

বর্ষা-গীতি। *

সায়াহ্ন-গগন-ভালে ম্লান রবি-লেখা
আসন্ন-প্রদোষ-ছায় গিয়াছে মুছিয়া,
বিলোল, তরঙ্গায়িত নীলিমার রেখা
থরে থরে কৃষ্ণমেঘে যাইছে ঢাকিয়া !
কি জানি কি মন্ত্রে রুদ্ধ ব্রহ্মাণ্ড-নিশ্বাস,
কি ত্রিদিব-সুরে বাঁধা বিশ্ব চরাচর,—
প্রকৃতি সেজেছে, ভুলি' অনন্ত বিলাস,
নীরদ-বিভূতিমাখা যোগিনী সুন্দর !
যোগিনী বসিয়া ধীর সমাধি-আসনে,
কারণ-সলিলে যথা নারায়ণ-কায়,
নিখিল করাল জ্বালা দহিছে পরাণে,
ধ্বনিছে ভৈরব-রাগ জগত-বীণায় !
সহসা থামিল গীত।—আঁখি ছল ছল,
টুটিছে তাপসী-প্রাণ—ঝরে জল—জল !!

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র গুহ।

* স্বরলিপি প্রকাশন — "সঙ্গীত-বিজ্ঞান প্রবেশিকা", আষাঢ়, ১৩৬৪, পৃ: ৪০-৪৬।

ভগবদ্ভক্ত জগদীশ্বর গুপ্ত।

নব্যভারতের পাঠকগণ শুনিয়া চমকিত হইবেন যে, যে মহাত্মা, বিগত ৯ বৎসর যাবৎ, বঙ্গের অদ্বিতীয় ভক্তচূড়ামণি শ্রীচৈতন্যের অপূর্ব্ব জীবনকাহিনী, সুললিত ও সরস

ডাক্তার ওয়াইজ সাহেব আর একটী জনপ্রবাদ অবলম্বনে লিখিয়াছেন যে, প্রবল পরাক্রমশালী বাবা আদম নামে এক মুসলমান ফকীর একদল সৈন্যসহ বিক্রমপুরে আগমন করেন, তিনি বর্ত্তমান কাজিকসবা গ্রামের তিন মাইল উত্তরপূর্ব্বস্থিত আবদুল্লাপুরে শিবির সন্নিবেশিত করেন। ফকীর বল্লাল সেনকে স্বীয় আগমনবার্ত্তা জ্ঞাপনের অভিপ্রায়ে রাজবাটীর অভ্যন্তরে গোমাংস নিক্ষেপ করে। রাজা কিছুকাল পরে ইহা দর্শন করিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন এবং ঘটনার প্রকৃত তথ্য অনুসন্ধানের জন্য চতুর্দ্দিকে গুপ্ত চর প্রেরণ করেন। প্রেরিত অনুচরদিগের মধ্যে একজন দ্রুতপদে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া রাজাকে সংবাদ দিল যে, রাজবাটী হইতে পাঁচ মাইল দূরে একদল বিদেশীয় সৈন্য তাঁহার রাজ্য আক্রমণের নিমিত্ত শিবির সন্নিবেশিত করিয়া অবস্থিতি করিতেছে এবং তাহাদের অধিনায়ক রাজবাটীর অনতিদূরে নিবিষ্টচিত্তে ও ধ্যাননিমীলিত নেত্রে ঈশ্বর সমীপে প্রার্থনায় মগ্ন আছে। অনতিবিলম্বে বল্লাল অশ্বারোহণে তথায় উপনীত হইয়া, হস্তস্থিত তরবারির এক আঘাতেই ধ্যানমগ্ন ফকীরের মস্তক ছেদন করেন। পক্ষান্তরে ইহাও শুনা যায় যে, আবদুল্লাপুরে হিন্দু সৈন্য মুসলমানদিগের হস্তে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হয় এবং রাজা দ্বিতীয় বল্লালসেন যুদ্ধে নিহত হয়। এই জনপ্রবাদ যে ঐতিহাসিক সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই।

শ্রীত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য্য।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা।

গীতি কবিতা।

ঢালিনু চরণ-তলে উন্মত্ত চুম্বনরে প্রেমেতে মাখিয়া,
ঢালিনু ঢালিনু কত তপ্ত অশ্রুজলরে হতাশে কাঁদিয়া;
চরণে ঠেলিল বালা, অশ্রু চুম্বনের মালা;
আহা মোর উপহার সৈকতে লুটায় রে, সাগরে চাহিয়া;
উপেক্ষিয়া অনাদরে সিন্ধু দূরে যায় রে, তরঙ্গ তুলিয়া।

(২)

এখনো ঝরিছে অশ্রু কপোল বহিয়া রে; কেন ঝরে আর?
চুম্বন-পিয়াস-জ্বালা কেনই অধরেরে জ্বলে অনিবার?
আমি চুমি বেলা ভূমি; কোথা সিন্ধু কোথা তুমি?
লাবণ্য তরঙ্গমালা খেলিতেছে দূরেরে, এসো একবার;
এ মোর চুম্বন অশ্রু পরশিয়া যাওরে, চরণে তোমার।

(৩)

যত ফোঁটা অশ্রুজল পড়িবে ধরায় রে তোর নাম করি,
যে ক'টি চুম্বন হেথা পড়িবে খসিয়ারে তোরি নাম স্মরি,
মাণিক্য মুকুতা হবে, ধূলায় পড়িয়া রবে,
তখন আদরে বালা লইও তাহায় রে, পোরো বক্ষোপরি;
তা হলে চুম্বন অশ্রু শুধু বরষিয়ারে যাব সুখে মরি।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

দামোদর।

এ জগতে কবি বুঝি এক দামোদর,
লেলিহান, জ্বালামুখ প্রলয় পিয়াস,—
গণ্ডূষে চুষিয়া নিয়া বিশ্ব নীলাম্বর
হু হু করে মহাশূন্যে ভৈরব-নিশ্বাস!
জ্বলে যে বাড়ব-কুণ্ড প্রাণ-বেদিকায়,
এ নিখিল-সৃষ্টি তাহে এক ফোঁটা জল,
তবু সে পাগল কবি উৎকট-ক্ষুধায়
চুমিছে আগুনে পুড়ি' যূথিকা-কপোল!

অতর্পিত হোম-বহ্নি মরত ছাড়িয়া,
ঝলসি' বিমান-মার্গ করাল-শিখায়,
ঊর্দ্ধে—আরো ঊর্দ্ধে ওই ছুটেছে নাচিয়া
ব্রহ্মাণ্ড-নির্ঝর-মূলে, অসীম-সীমায়।
সহসা এ'কি এ'! এ' যে ধূম—নিরবাণ!
পড়িয়াছে পূর্ণাহুতি, হোতা ভগবান্!

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র গুহ।

দুটী।

মহাসিন্ধু নিস্তরঙ্গ, জগৎ বিজন,
নাহি শব্দ, নাহি শ্বাস, প্রাণি-কোলাহল,
পশুপাখী-আনাগোনা, পাখীর কূজন ;—
অচেতন যেন শূলী পিয়ি হলাহল।
মাথার উপরে শুধু জেগে বসে' চাঁদ,
থমকি পায়ের কাছে যমুনার ঢেউ,
তাহারি বুকেতে ভাসে শশীর সুছাঁদ ;—
চারিপাশে কোনদিকে নাহি আর কেউ।
শুধু অনন্তের কোলে জেগে দুটী প্রাণী—
কি-যেন প্রেমের ভরে আকুল পরাণে,
কি-যেন আগ্রহ-লয়ে নিচল নয়ানে
শুধু চেয়ে, কারো মুখে নাহি কোন বাণী।
হৃদয়ের দরপণ আঁখির অন্তরে
ফুটিছে প্রাণের ছায়া অক্ষরে অক্ষরে!

শ্রীপ্রকাশচন্দ্র ঘোষ।

বিধবা।

১

যাও সবে, স'রে যাও ; কেউ গো থেকোনা ওর কাছে ;
একাকিনী থাক্ ও পড়িয়া ;
তোমাদের শুষ্ক-শ্বাসে ও কুসুম বাঁচে কিনা বাঁচে ;
বৃন্ত ছিঁড়ি পড়িবে ঝরিয়া!

২

কৃষ্ণ-একাদশী আজি ; চারিটি দিবস থেমে থেকো ;
কেউ যেন যেওনা সেথায় ;
চারিধারে বৃত্তাকারে রক্তময় গণ্ডী দিয়া রেখো ;
ব'লে দিও, কেউ না মাড়ায়!

৩

দিনে দ্বি-প্রহরে সেথা দূর হ'তে আবর্ত্তে উড়িয়া
ধূলা তুলি ঘুরিবে পবন ;
পাখী কেউ আসিবে না ; আসে যদি, তরাসে কাঁপিয়া
ছুটিয়া করিবে পলায়ন!

৪

ধূলি আর বায়ু সাথে গ্রীষ্মের প্রখর কররাশি
চারি ধারে ঢালিবে অনল ;
আকাশ-কটাহ-তলে অতি ঊর্দ্ধে, ঊর্দ্ধে ভাসি
সাদা মেঘ ছুটিবে কেবল।

৫

রজনীতে দ্বি-প্রহরে, স্তব্ধতার বুকেতে বসিয়া
নিশীথিনী করিবেক ধ্যান,
মাঝে মাঝে শূন্যে চাহি ফেরু শুধু উঠিবে কাঁদিয়া,
বিস্তারিয়া বিকট ব্যাদান।

৬

কদাচিৎ অন্ধকার ভেদ করি দীর্ঘ, নিম্নচূড়
উল্কা এক পড়িবে খসিয়া ;
নিষ্ঠুর আলোকে তা'র দু'একটা পেচক বাদুড়
ভয় পেয়ে পড়িবে লুটিয়া!

৭

উন্মুক্ত গবাক্ষ-পথে হুহু করি বহিবে পবন,
অবাধে করিবে আনাগোনা ;—
কপাটে কপাটে শব্দ, পিশাচের গানের মতন,
যা'বে কভু যা'বে না বা শোনা!

যেন কাঙালিনী মেয়ে, বহে ধীর সমীরণ।
আকাশে বিহ্বল চাঁদ, বসন্তে উজ্জ্বল বন।
রাঙা ঠোঁঠে, ফোটে হাসি, চেয়ে আছে চাঁদ
পানে।

গলে দোলে ফুলমালা, প্রেম-কথা কাণে কাণে।
নয়নে নয়নে টানে, অধীর অধীর প্রাণ।
প্রেমিক প্রেমিকা মনে, উথলে মিলন গান।
চুম্বন আবেশে ঘন, অধর কাঁপিছে ধীরে।
বদ্ধ আলিঙ্গন পাশে, আকুল নয়ন-নীরে।
প্রভাত হইল নিশি, জাগিল সে রাজবালা,
ভাসাল' যমুনা জলে, ফুল-শয্যা, ফুলমালা।

৫। তটিনী।

মেদুর অম্বর ছায়া, ভগন দুর্গের কায়া,
পড়িয়াছে স্বচ্ছ শ্যাম তটিনীর জলে।
আন্‌মনে তরী বেয়ে, চ'লেছি পুরবী গেয়ে,
রাঙা-রবি ডুবিছে অচলে।
সায়াহ্ণ ঘনায়ে আসে, আঁধারে আলোকে মেশে,
মিশে যায় তালবন, আঁধারের কোলে।
বিস্তীর্ণ বালুর তট, সুনীল আকাশ পট,
কেঁপে ওঠে থির নীরে সমীর হিল্লোলে।
স্নিগ্ধ শ্যাম মেঘস্তর, বায়ু বহে ঝরঝর,
ভাসে শূন্যে ম্লান হাসি নিশীথের তারা।
ক্ষুদ্র ভাঙা ঊর্ম্মি-মালা, লুটিছে চুমিছে বেলা,
চন্দ্রমা চুমিছে ধরা হয়ে মাতোয়ারা।
তটিনীর কল-ভাষে, দূর-স্মৃতি মনে আসে,
অতীত জীবন কাব্য, কথা পুরাতন।
কথা হ'ল কবেকার, ভুলেছি সকলি তার,
তবু যেন বুকে ব্যথা, এখনো কেমন।
তটিনী তোমারি মত, প্রিয়ার কাহিনী যত,
মুখেতে চাঁদের হাসি, অন্তরে গরল।
তুমি ঠিক্ সেই ছবি, প্রিয়ার জীবন্ত ছবি,
বুকে পোষা, কাল নিশা, মরণ কেবল।

শ্রীচুনিলাল গুপ্ত।

১। মজফরপুরের লিচু।

সুরঞ্জিত কলেবর নিদাঘ-সোহাগে,
অধরে ফুকারে যেন "আয় আয়" বলি!
হে সুন্দর ফলশিশু, বল্ কোন্ বাগে
রাজোয়াড়া, অনুপম জনম লভিলি?
ছিঁড়িতে নখাগ্রে তোরে বড় ব্যথা লাগে,
কবিচিত্তে; তুই কিন্তু নিজে আঁখি মেলি,
(তোরো কি জড় পরাণে অধীরতা জাগে?)
(সজল শ্বেত চাহনি!) তাকাস্ কেবলি!
ঐন্দ্রিলা বৃত্র-মহিষী, বৃত্রের সংহারে,
আর্দ্রিলা ধরিত্রী-পৃষ্ঠ; নয়নের জলে
দানবীর, ক্ষুদ্র মুক্তা কভু কি রে ফলে?
জন্মিল হীরক কত সে শোক-আসারে!
কত বেশে, কত ভাবে, আছে এ মহীতে
লিচু হয়ে রাজে শুধু মিথিলা-ভূমিতে!

২। ডালিম।

বিকট মস্কট নয়—কাশ্মির বেদানা;
পদ্মরাগমণি-প্রভা দানাগুলি যার!
হে শুক, মনোবেদনা ঘুচাতে তোমার,
রেখেছি পিঞ্জরে তব; ডালিমের দানা
পাটনার;—কি সুন্দর! (অনঙ্গ-অঙ্গনা
হাসিলে কি ঝ'রে পড়ে সেইরূপ দানা?
ভুলাতে তোমার চিত্ত, জুড়াতে রসনা;
দিয়াছি তোমারে নিত্য হে সারী-বাসনা!
যাই!—বলিহারি যাই শুকের লালসা!
একদিন, শুয়ে আছি আমি আর * * *
ডোর কাটি, শুক পক্ষী, (মরি কি তামাসা!)
* * * * * উপরি বসিল আসিয়া!
কাঁদে * * *—শুক করে ঝটপট ডানা,
নখে হ'ল মুক্তাময় শুকের বেদানা!

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন।

ছায়া।

১

ছায়া আসে আর যায়!
স্মৃতির অঞ্চল টানি, হৃদয়ের কূলে নামি,
আঁধারে আঁধার ছায়া উঁকি মেরে ধায়!—
প্রাণ-কিনারায়!

২

আসে আর যায়!—
চম্পক-আঙুল দিয়া, নীল জল ঢেউয়াইয়া,
জাগায়ে প্রসুপ্ত হিয়া উরমি-লীলায়!—
নিথর-বেলায়!

৩

আসে আর যায়!
ঘুম-ঘোরে শুধু দেখি, কি যেন দিয়েছে লিখি,
পাদ-কোকনদ-রক্ত কঙ্কর-রেখায়!
সে'ত ছায়াপথে চড়ি, চপলার হাত ধরি',
অনন্ত এ' দেশকাল ছাড়িয়া পলায়!—
ধরা নাহি যায়!

৪

তবু নিতি আসে আর যায়!
কি যে পারিজাত-গন্ধে,শ্বাসিয়া সে' নাসারন্ধ্রে,
কি দেব-পরশে হিয়া আবেশে গলায়!
পাই না ত কোন দিঠি, স্বরগ-মণ্ডল লুঠি',
বৃথা মোর চূর্ণ প্রাণ দিগন্তে মিলায়!—
ভেঙ্গে ভেঙ্গে যায়।

৫

একবার শুধু তবে দাঁড়াও না, হায়!
পুণ্য দেব-ভূমি ফেলে, ভালবেসে যদি এলে
পূতিগন্ধময় এই শ্মশান-কোণায়,
খুলে দাও আঁধা-আঁখি, ত্রিদিব-অঞ্জন মাখি,
পুড়ে যাও তমোজাল চিন্ময়ী-বিভায়!—
প্রাণ ভরে রূপ হেরি—অমর তুলিকা ধরি,
ফলাই ও' দেব-জ্যোতিঃ মর-কবিতায়!
বিমল-আনন্দে লীন, হ'য়ে থাকি চিরদিন,
ভাসাই অখণ্ড-বিশ্ব সুর-জ্যোছনায়!
মহামায়ে! দাঁড়াও না হায়!
—আহা! আসে আর যায়!

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র গুহ।

অমৃতে মরণ?

কিসের মরণ ভাই!
অমৃতে মরণ সাধ, কেন বল এবিষাদ,
শৈশবে সাধের প্রাণে, কেন গো বাসনা নাই?
দারুণ হিমানীঠেলে, সংসার সরসী জলে,
ফুটেছে নলিনী বালা, কে চাহে মরণ তার?
নলিনীর দলে দলে, হৃদয়ের অন্তস্তলে,
পড়ুক এ জগতের ভানু-কর-চারু-হার।
হাসিবে অমরকান্তি, ফুটিবে অমর শান্তি,
অমর-অমৃতপুরে, বহিবে অমৃত নদী।
মরতেরা আঁখি মেলে, আঁধার তরঙ্গ ঠেলে,
করিবে আনন্দ ধ্বনি খুলিয়া অনন্ত হৃদি।
দেবতার মনোলোভা, জীবনের শত শোভা,
ফুটিবে, হাসিবে আহা! শোভিবে নিখিল ধরা;
দিবানিশি কুল্ কুল্, ভাসায়ে লইবে ফুল,
সুগন্ধির মন্দাকিনী বহিবে পাগল পারা।
জীবন অমৃতখনি, ঝলমল শতমণি,
কেন তবে মরণের চরণে শরণ?
নবীন প্রভাত-সুখে, ধরণীর চারুবুকে,
আধ ফোটা কলিকার, সাজে কি মরণ?
ফুটুক হৃদয় ফুল, কেন ভাই কর ভুল?
বহুক মধুর ধারা হেসে কেঁদে চলে যাই;
অমর অমৃতপুরে, কিসের মরণ ভাই?

শ্রীশরচ্চন্দ্র ধর।

সঙ্গীত। *

১। মুলতান—আড়া।

১

পোহাল যামিনী, তামসী বিঘোরা,
জাগিল ধরণী, ঘুমে কেন তোরা?

২

পূরব বারুণী ছাইয়া পরাণী;
বিজয় সঙ্গীতে পুরিয়াছে ধরা,
তোরা এ প্রভাতে, শ্মশান-শয্যাতে,
জগত মাঝারে অচেতন মড়া।

* ফরিদপুর সুহৃদ্ সভার দ্বাদশ সাম্বৎসরিক অধিবেশনে এই কয়েকটী সঙ্গীত গীত হইয়াছিল।

গায় যদি তবে কেন
শূন্যে মিশে যায়,
খেলে যদি তবে কেন
হৃদি নাহি চায়?
শান্ত যদি তবে কেন
দূরে পড়ে হায়,
শ্রান্ত যদি তবে কেন
হেসে ফিরে ধায়?
কবি যদি তবে কেন
বহে নাক বায়,
প্রেম যদি তবে কেন
কায়াহীন কায়?
ক্ষুধা যদি তবে কেন
নির্ম্মমতা তায়,
দেব যদি তবে কেন
আকাঙ্ক্ষার দায়?

শ্রীকালীচরণ মিত্র।

ভীমকান্ত।

ঘুড়ি-খেলা।

১

করিতেছ কি যে লীলা উদার গগনে,
এ' দুরন্ত হিয়া মোর উড়া'য়ে হেলায়,
শিথিল গোলাপী-বাস খেলিছে পবনে
শ্যাম-উপবন-প্রান্তে মাধবী-সন্ধ্যায়!—
যূথিকা-খচিত কেশে চল-সমীরণ,
কি হাসি সে' কণ্ঠ-লগ্ন বন-মালিকার,
কি বা সে বঙ্কিম ভঙ্গী, কর-সঞ্চালন,
মরকত-বলয়ের তরল ঝঙ্কার!
ও' তব সৌন্দর্য্য-বিম্ব—পূর্ণ, প্রাণারাম—
তরঙ্গে অনন্ত ছায় রূপ, গন্ধ, গানে,—
দ্রব-মাধুরীর স্রোতে ভাসি' অবিরাম,
ঘুড়ি উড়িতেছে ওই স্বর্গ বাতায়নে!
বনদেবি! সূতা যেন যায় না ছিঁড়িয়া,
বিকট অশনি-শ্বাসে অকালে জ্বলিয়া!

বহ্নি-যান।

২

জান না কি করিতেছি মোরা অভিযান
ব্রহ্মাণ্ড-পঞ্জর হ'তে মহাপ্রাণতায়?
তবে কেন চাই দিতে ঢালিয়া পরাণ
তুষার, নিষ্কর্ম্মি, রুদ্ধ, আবিল ধরায়?
দেবী তুমি,—এ'যে হাসি-অশ্রু-কলুষিত,
অন্ধ, জড় প্রেম, শুধু তুমি-আমিময়,
মধুকর-করম্বিত, কোকিল-কূজিত
লুব্ধ অভিসার-চিত্র কালিন্দী-বেলায়!—
নক্ষত্র সোপানে চড়ি' এস মহিমায়,
ধরা ছাড়ি,' বিশ্ব কেন্দ্রে এই আলিঙ্গনে,
যুগান্ত-বিস্ফোটে মোরা মিশি পুনরায়
স্বাতী-মার্ত্তণ্ডের ভীম প্রলয়-মিলনে!
সে আণব ক্ষেপ-মাঝে দেখি অনুখণ,
তুমি-আমি-বিরহিত অপূর্ব্ব জীবন!

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র গুহ।

নিম্নশ্রেণী হিন্দু।

নিম্নশ্রেণী হিন্দু! বল কতকাল আর
থাকিবে অস্পৃশ্য হেয় ভারতসমাজে?
সুবর্ণ ভারতবর্ষ নহে কি তোমার?
তোমার এ মোহ নিদ্রা এখন কি সাজে?

মনুষ্য মনুষ্য কাছে অস্পৃশ্য ঘৃণিত—
কে করিল শাস্ত্রে এই কৃত্রিম বিধান?
জ্ঞানের প্রদীপ তব করি নির্ব্বাপিত,
কে হানিল তব দেহে মরণের বাণ?

অনন্ত আলোক দেখ তরঙ্গে তরঙ্গে
কিবা বঙ্গে কিবা বঙ্গে করিছে বিহার,
সমুদ্রের দ্বীপ-অঙ্গে হিমালয় শৃঙ্গে,
কোথা বা এ আলোকের নাই অধিকার?

বিদ্বিক বা কোরাণিক যত হিন্দুগণ,—
তোমার অর্দ্ধাঙ্গ তারা—দিনে আজিকার,
নবালোকে নবীভূত করিয়া জীবন,
কেমনে লভিছে স্বীয় স্বত্ব আপনার!

আর তুমি নিদ্রাগত, চৈতন্যরহিত,
ভেদনীতি করিয়াছে তব মর্ম্মভেদ;
স্পর্শ-দোষ প্রথারূপী ছুরিকা শানিত,
অসংখ্য খণ্ডেতে তোমা করিয়াছে ছেদ।

কি বিরাট ভবদেহ জলদ বরণ
কিন্তু আজ ছিন্ন ভিন্ন যথায় তথায়;
কি নগর, কিবা গ্রাম, গিরি, গুহা, বন,
তোমার দুর্গতি দেখি বুক ফেটে যায়।

পুরাণ, কোরাণ হ'য়ে তোমার বিনাশ
সাধিতেছে, তবু তব হয় না চেতন;
একেতে মনের বল যত করে হ্রাস,
অপরেতে দেহ গ্রাস করিছে তেমন।

দাসানুদাসত্ব লিপি ললাট ফলকে
লিখিয়া দিয়াছে তোমা পুরাণ সকল;
গালির চূড়ান্ত গালি শাস্ত্রীয় পুস্তকে
তোমার জন্যেতে লেখা রয়েছে কেবল।

ব্রাহ্মণের হাতে দিয়ে ধরম জীবন
লভিয়াছ এই ফল—দোষ দিবে কার?
তাই বলি একবার কর বিলোকন,
কি বিরাট দেহ তব দেখ একবার!

অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গেতে ফিরাও নয়ন,
দেখ দেখি কেবা আছে তোমার সহায়?
তোমার জন্যেতে করে অশ্রু বরিষণ
ঢাকা কিম্বা নবদ্বীপ কিম্বা মিথিলায়।

ম্লেচ্ছ অন্ন পরিপুষ্ট হিন্দুকে লইতে,
কত দেখ টিকি টাক্ হয়েছে বাহির;
তবে করপৃষ্ঠ জল বলিলে পিয়িতে
তাঁরাই নাচিয়া এবে হইবে অস্থির!

এত কাঁদিলেন এই বিদ্যারসাগর,
বিধবা কুলীন কন্যা শোকেতে আকুল,
হেমপ্রসূ হেমচন্দ্র কবির ঈশ্বর
অবলার মর্ম্মতায় কাঁদিয়া ব্যাকুল!

এক বিন্দু অশ্রু হায় তোমার কারণ,
পড়েছে কি তাঁহাদের পঞ্চাশ বৎসরে,
রামমোহনের কিম্বা কেশব জীবন
তোমার জন্যেতে এবে কিবা কাজ করে?

বঙ্কিম লইয়া "লাঠি" তব পাছে ধান,
নিষ্কাম ধরমের নব প্রচারক,
পুরাণের পুনঃ নাকি হইবে উত্থান,
কামনা-রহিত ইনি ব্রাহ্মণ্য স্থাপক!

রবীন্দ্র অরুণ সাথে বেড়িয়া বেড়ান,
চাঁদের আলোকে কিম্বা দুগ্ধ ছায়া-পথে
অপ্সরার হাসি কিম্বা ফুল মধুপান
করিয়া ভ্রমণে রত স্বপনের রথে।

কর্কশ পার্থিব পথে কাঁটা ফোটে পায়,
তাঁর কেন দৃষ্টিপাত হইবে তোমাতে,
নবীন, স্বজন যেন ঠেকি কিবা দায়
নির্বাক তাঁদের রত্ন সাহিত্য-জগতে।

অদৃষ্টের দোষ ইহা, বলিবে কাহাকে?
দুর্বুদ্ধিরো দোষ ইহা বলিতে হইবে।
তর্কচূড়ামণি বলি পুজহ যাঁহাকে
অশনি প্রহার তাঁর অধুনা সহিবে।

"বঙ্গবাসী-নিবাসী"র ভরণ পোষণ,
যত কর তত পর নূতন শৃঙ্খল,
এত যে শিল্পের জন্য অশ্রু বরিষণ,
বক ধার্ম্মিকত্ব তার ভিতরে কেবল।

ব্যবসায় ভেদে যদি বর্ণভেদ প্রথা,
পুনর্ব্বার প্রখরতা লভে কদাচন;
প্রাণের ভিতরে এই ভরসার কথা—
এরি জন্য বংশীরব এত সম্মোহন!

যা হ'বার গেছে হ'য়ে
এস পুণ্য-হাসি ল'য়ে
কাঁদিতে হয় না যেন আর গো তেমন।

৫

তব আগমনে বালা
সংসার-কুসুম ডালা
সাজান' গোছান' যেন থাকে চিরকাল।
নিত্য লক্ষ্মীরূপা হ'য়ে
আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা ল'য়ে
দাঁড়াও সবার মাঝে ঘুচুক্ জঞ্জাল।

৬

ধন-ধান্যে পূর্ণ ধরা
হোক্ আরো মনোহরা
আঁধার দরিদ্র গৃহ হোক্ পূর্ণ আলো।
সুখ-আশা হ'য়ে হীন
কাঁদিয়া গিয়েছে দিন
বেঁচে থাকা যে ক'দিন যায় যেন ভালো।

শ্রীচুনীলাল গুপ্ত।

একাকী।

১

ভুল এবে ভেঙ্গে গেছে, হায়!
প্রণয় সুষুপ্তি-হত, আজি বর্ষ যুগ গত,
তোমায় আমায়,—
ধীরে ধীরে শেষ-অশ্রু, স্মৃতির ধ্বনিত তান,
শুকায় মিলায়!
এখন বিস্ময়ে ভাবি, কি ভুমা যে করেছিনু
ধূম-বিন্দু-নীত!—
আঁধার, নিভৃত কুঞ্জ, জ্যোছনা-তটিনী-তীর
ঝাউ-মুখরিত;
মোদের মিলন-চিত্র এরা বুঝি এঁকে দিত,
পীত নীলিমায়?—
জানিতাম—মোরা রাজা, এ'বিরাট্ বিশ্ব সব
পাদপীঠছা'য়!

২

ইন্দ্রজাল ছিঁড়িল ত্বরায়!!
খসিয়া এ'শ্লথ মুষ্টি, আবার উধাও সৃষ্টি,—
স্বপনে স্বপন!—
অশ্রান্ত-বিবর্ত্তচক্রে ক্ষুদ্র অম্বুস্ফুটি' যথা
অনন্ত জীবন!
আমার নীরন্ধ্র বাঁশী এ'ভীম-নিবাতে বুঝি
বাজিবে না আর!—
আমি কি সে' শেষ-নর?—হুঙ্কারিছে লয়ঘোরে
মুমূর্ষু সংসার?
তরলিত সন্ধ্যা-রাগ ঘুমন্ত ও বাপী-জল
চুমিছে কেমন!
এ'হেন প্রশান্তি-কোলে বিদগ্ধ বড়বা আমি,
ক্ষুব্ধ জাগরণ!

৩

মূরছিছে সায়াহ্ন-তপন!
উড়াইয়া দিগ্‌বাস, রাঙ্গাইয়া নীলাকাশ,
সুরাঙ্গনা-কুল,
স্বরগ-শিশির-ভরা হেম-কুম্ভ কাঁখে করি,'
আঁখি ~~ছল্ ছল্~~, ঢুল্ ঢুল্,
নামিতেছে অস্তাচলে, জুড়া'তে তুষার-সেকে
দীপ্ত অর্য্যমন্,
মাখি' দিব্য-অবলেপে অনাদি-কালের ওই
জীবন্ত-দহন!
তামসীর হিম-স্পর্শে দিবসের ক্ষীণতাপ
যাইছে নিবিয়া,
বিশাল-চৈতন্য-কেন্দ্রে আমারো এ'জড় হিয়া
উঠে নিশসিয়া!
ক্ষিপ্ত গ্রহটারে ছিঁড়ি,' রেখেছিনু হৃদে পূরে,।
গেছে পুনঃ ছুটে,
লৌহ-বন্ধনীও কালে উষার মলয় শ্বাসে,
রেণু রেণু টুটে!
গরবিনী পূরণিমা খরতর-আলো মুখে
লাজে মরে যায়,

ইন্দু-রোহিণীর প্রেম, উপরাগ-অবসানে,
নবীন খেলায়!
কন্দরে নিরুদ্ধ ছিনু, অকূল-সাগরে এবে,
মহাব্যোমছা'য়,
তুমি-আছ, বিশ্ব আছে, তোমারি বরণে আঁকা,
বিরহ কোথায়?
ভুল এবে ভেঙ্গে গেছে, হায়!

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র গুহ।

অনন্ত সম্বন্ধ।

তোমারি আলোক তলে,
মোর
জীবন পোহাই;
ভরসা উদ্যম তুলি,
ল'য়ে
তোমারি দোহাই।

এ বিশাল রঙ্গভূমে,
আমি
খেলিবারে চাই;
খেলা ধূলা ভেঙ্গে যায়,
যদি
তোমারে না পাই।

সম্পদ যা কিছু আছে,
তাহা
তোমার করুণা;
টানে না যে প্রাণ-তরু
তোমা,'
সে তরু তরু না।

যে গান গাহিয়া উঠি,
তাহা
প্রসাদ তোমার;
যখনি তোমায় চাই,
তুমি
তখনি আমার।

হৃদয় শ্যামল হয়,
শুধু
তোমার পরশে
অমৃত-সলিল ঝরে
প্রাণে,
তোমারি দরশে।

বল সখা কোন্ দিকে
পথ
নাহি পাই আমি?
সবচেঁয়ে জাগরণ
মম,
তুমি যবে স্বামী।

আমি ফুটে আছি ফুল
এই
জগতপাদপে,
বেঁচে রব পদতলে
নাহি
ঝরিব আদপে।

শ্রীহিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

স্মৃতি।

আবার এসেছ ফিরে?
সখা হে এসেছ ফিরে?
এই যে বুক পাতা আছে,এস গো জুড়াই হিয়া,
চেয়ে আছি অনুখণ বাহু দুটি পসারিয়া;
কভু যদি এসো ফিরে,
মনে পড়ে এ পুরাণে,
খাড়া আছি সদা তাই পথমাঝে আগুলিয়া,
মরমে উঠিছে ঢেউ ভাঙ্গা বুক বিদারিয়া।

২

তুমি ত স্বর্গের পাখী ধরা দিয়াছিলে বনে,
বনবাসে ছিনু যবে সাধের সেই কুঞ্জবনে;
দেবতার ছবি খানি
সেই দিন আঁকিয়াছি,

সময়ের আবর্ত্তনে
সর্ব্ব শুভ-সম্মিলনে,
পূর্ণতা উঠিবে জাগি, জীবন মাঝার।

১৫

তাই বলি, কবি, তোর নাই রে ভাবনা;
জানিস্ যতেক খেলা,
খেলে নে রে এই বেলা;
গান গা'রে যত প্রাণে জাগিছে বাসনা;
শান্ত করি চিন্তানল
উৎসাহে সমুখে চল্;
ভাবিলে কর্ত্তব্য কভু হ'বে না সাধনা।

শ্রীনিত্যকৃষ্ণ বসু।

পুষ্পাঞ্জলি।

গঙ্গাজলে—আম্রবনে—পলাশী-প্রাঙ্গনে
বেঁধেছিলে সুর, কবি! যে দেব-বীণায়,
তারি সে উদাত্ত-নাদে "বঙ্গ-দরশনে"
হয়েছিল যুগব্যাপী অশনি-সঞ্চার!
ভুলে' চেয়ে—ভালবেসে'—কাঁদিয়া—জ্বলিয়া
বিকট তাড়িত-দাহে রমণী-মায়ার,
সাধিলে দীপক-রাগ কলিজা ছিঁড়িয়া,—
বাণী-কুণ্ড আজো লাল রুধিরে তোমার!
তোমারি স্বদেশী এবে ধরেছে ও' তান,
চিলাইর চিতা-বহ্নি উগারি ধারায়,—
আট বর্ষ ধরে' আজ গলায়ে পাষাণ,
"নব্যভারতে"র ভালে বাড়ব খেলায়!
কবি-কুঞ্জে এই দাব র'বে চিরদিন,
পূর্ব্ব-বাঙ্গালার কবি গোবিন্দ নবীন!

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র গুহ।

জাতীয় একতা।

পরস্পর পবিত্র ঐক্যবন্ধনের অভাবে ভারত বিজাতীয় শাসনে নিষ্পেষিত, এ কথার প্রকৃত হেতু সম্যক্ না বুঝিলেও, দেশের শিক্ষিত ব্যক্তি হইতে আবাল বৃদ্ধ বনিতা ইহা স্বীকার করিয়া থাকেন। জগতের ইতিহাস উজ্জ্বলচিত্রে ইহাই সপ্রমাণ করে যে, যে মুহূর্ত্তে আত্মস্বার্থের ঘৃণিত বাসনায় দেশের মেরুদণ্ড সদৃশ প্রধানগণ আপনাকে ভাসাইয়া দেন, সেই মুহূর্ত্তে রাজ্যের ভবিষ্য ভাগ্যগগন ঘোর তমোময় আকার ধারণ করে। প্রতীচ্য ভূখণ্ডের দিকে দৃষ্টিপাত করিবার আবশ্যক নাই; স্বদেশেই, ভারতের পুণ্যক্ষেত্রই এবম্বিধ নৈতিক অধঃপতনের জন্মভূমি। যে স্বার্থপরতা ও গৃহ বিচ্ছেদের ঘোরতর পাপে ভারতের ভাগ্য-লিপি এত অসম্ভব পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, যাহার উন্নতির আশা আজ সুদূরপরাহত, যে আর্য্যবীরগণের মৃগেন্দ্র-শোভিত পতাকা একদিন ভারতভূমিতে দৃঢ়-প্রোথিত হইয়াছিল, তখন কে ভাবিয়াছিল, সুদূর ম্লেচ্ছ রাজ্য হইতে এক অভিনব জাতি আর্য্য পতাকার নির্ম্মূল সাধন করিয়া সেই স্থানে ইস্লামের বিজয়বৈজয়ন্তী উড়াইয়া দিবে? তখন কে মনে করিয়াছিল, পুণ্যতোয়া দৃষদ্বতীনীরে শেষ হিন্দু নৃপতি পৃথ্বিরাজের শোণিতপাতের সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু স্বাধীনতার

গৌরব-রবি চিরদিনের তরে বিদায় গ্রহণ করিবে? যে চিতোর নগরী একদিন মহারথী বীরপুঙ্গবগণের উল্লাস উল্লম্ফনে ধ্বনিত হইত, একাধারে যে স্থল বীরত্বের সম্মাননা, আত্মসংযম শিক্ষার অদ্ভুত সাধনা, ও রমণীলাবণ্যের মধ্যেও অত্যাশ্চর্য্য কঠোরতার লীলাভূমি ছিল, তখন কে মনে করিয়াছিল, দস্যুপ্রধান আলাউদ্দীনের পৈশাচিক সাধনা একদিন ইহার রূপলাবণ্য, শোভা সৌন্দর্য্য ও বীরত্ব গৌরবরাশিকে ভস্মস্তূপে পরিণত করিয়া ফেলিবে! তাই বলিতেছিলাম, যে মুহূর্ত্তে দেশের মেরুদণ্ডকে নীতিবিহীনতা ও স্বার্থপরতার ভীষণাগ্নি স্পর্শ করে,সেই মুহূর্ত্তে তাহার মঙ্গলের আশা আর কদাপি থাকিতে পারে না। উপরোক্ত ঘটনাগুলি যদি ধীরভাবে পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা যায়, তবে প্রতিপন্ন হইবে, ইহার কোনটিই বিনাশের এ অবিসম্বাদিত কারণ-বহির্ভূত নহে।

পঞ্জাবকেশরী রণজিৎ সিংহের ভবিষ্যদ্বাণী ভারতক্ষেত্রে বর্ণে বর্ণে সত্য হইয়াছে। হিন্দুস্থানের মানচিত্রে আজ সব লালে লাল। অসাধারণ প্রতিভাশালী, চতুর নৃপতি রণজিৎসিংহ বুঝিতে পারিয়াছিলেন, যে গৃহ বিবাদরূপ ঘোরতর অগ্নি একদিন যুধিষ্ঠিরাদির ইন্দ্রপ্রস্থকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করিয়া একমাত্র কালনেমির মহিমা ঘোষণা করিয়াছে, পঞ্জাব রাজ্যও একটিমাত্র জীবনের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে সেই নীতিরই অনুসরণ করিবে। তিনি বিলক্ষণ বুঝিয়াছিলেন, স্বার্থপরতা ও ভ্রাতৃ-বিচ্ছেদ ভারতবাসীর মজ্জাগত প্রকৃতি। ইহার পরিণামে যে পঞ্জাবের ঘোরতর অধঃপতন,মহাপুরুষ দিব্যচক্ষে তাহাও দেখিয়াছিলেন। তাঁহার অভাবে এমন চারিত্র্যবল কাহারও ছিল না, যাঁহার শক্তির উপর নির্ভর করিয়া কেহ পঞ্জাবকে বিজাতীয় শক্তি সমূহের লোলুপ দৃষ্টি হইতে নিরাপদে রক্ষা করে। তাই তিনি হিন্দুস্থানের মানচিত্রে ব্রিটিস্ভারতের রাঙ্গা চিহ্ন দেখিয়া বলিয়াছিলেন,—"সব্'লাল হো যায় গা।" বৃদ্ধের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে পঞ্জাবের সৌভাগ্য-সূর্য্য অস্ত গমন করিলেন। অনৈক্যতার যাদুমন্ত্রে ভারতের গৌরব-প্রধান প্রবল শিখজাতির যতদূর অধঃপতন হইতে পারে, তাহা হইল! অসীম ক্ষমতাশালী স্বাধীন রাজার রাজপুত্র চিরজীবনের মত মাতৃভূমির নিকট বিদায় লইয়া দ্বীপান্তরিত হইলেন। এ অসম্ভব অধঃপতনের কারণ কি? 'জাতীয় প্রেমের অভাব' ইহার একমাত্র উত্তর। সের সিংহ প্রভৃতির ন্যায় সুসন্তানগণ অমানুষিক বীরত্বানুষ্ঠানে যে পথ পরিষ্কৃত করিয়া তুলিতেছিলেন, গোলাপসিংহ-প্রমুখ কুলাঙ্গার নারকীকুল আত্মস্বার্থের অলীক আশার মৃগতৃষ্ণিকায় মুগ্ধ হইয়া প্রাণপণ চেষ্টায় তাহার প্রতিবন্ধকতাচরণ করিয়াছিল। যে আলীবর্দ্দীখাঁর সুশাসনে একদিন বাঙ্গালায় অপার শান্তি বিরাজ করিত, বিজাতীয় শাসনেও যাঁহার অধীনে থাকিয়া বঙ্গবাসী অনেক স্বচ্ছন্দতা অনুভব করিত, একমাত্র সেই ব্যক্তির অভাবে বঙ্গে যে ষড়যন্ত্রের চক্র পরিচালিত হইয়াছিল, তাহার নিষ্পেষণে পতিত হইয়া তরুণ যুবা সিরাজ-উদ্দৌলার রাজ্যধন ও সম্পত্তির সঙ্গে সঙ্গে প্রাণ পর্য্যন্ত বিনষ্ট হইল। যে চক্রের ভয়াবহ আবর্ত্তে পড়িয়া রাজ্যেশ্বরের মূল্যবান প্রাণ সংকটাপন্ন হইয়াছিল, তাহার মূল কারণ, এই হতভাগ্য বাঙ্গালীজাতির

বসন্ত পূর্ণিমায়।

আজি এ পূর্ণিমানিশি　　সমুজ্জল দশ দিশি
শশধর ঢালিতেছে বিমল কিরণ ;
চূত শাখে মুহু মুহু　　পিক বধূ ডাকে কুহু
সুখে যেন বিগলিত মুগ্ধ উপবন।
বিকশিত ফুলবালা　　চারিদিক করি আলা
হাসিতেছে মৃদু মৃদু ছড়ায়ে সুবাস,
নদী বহে কুল কুল—　　দেখি মনে হয় ভুল
এ যেন গো বিরহিনী-আকুল-নিশাস।
মৃদুল দখিনা বায়　　কাঁপায়ে লতিকা-কায়
বহিছে কুসুম-গন্ধ জ্যোছনা বিভল,
তাই সুধু জাগে মনে　　কোন্ দিন বৃন্দাবনে
ফুটেছিল হেন নিশি বিষদ, বিমল!
বাঁশরীর ধ্বনি কার　　গোপ বধূ রাধিকার
তুলিত প্রাণের মাঝে আনন্দ তুফান।
বিজন যমুনাকূলে　　বিকশিত নীপ মূলে
দেখিয়া কাহারে তার হাসিত নয়ান।
সে দিন নাহিক আর　　সুধু ক্ষীণ স্মৃতি তার
জাগাইছে মনে আজি পুরাণ সে গান—
সেই বাঁশি, সেই হাসি, সেই ভাল বাসাবাসি
উছসিত যমুনার উজান-প্রয়াণ।
নাহিক সে কুঞ্জবন　　নাহি অলি গুঞ্জরণ
চলেনাকো গোপবধূ নিশি-অভিসারে,
অলক্তের মৃদুরেখা　　আর নাহি যায় দেখা
তমাল কাননে ঘেরা পথের মাঝারে।
সুধু সে বিরহ ব্যথা　　কবিতায় হ'য়ে গাঁথা
ঘুমাইছে বিরহীর হৃদয়-ছায়ায়,
(আজি) বাসন্তী পূর্ণিমা রাতে মৃদুল মলয় বাতে
ধীরে ধীরে জেগে উঠে, হাসায়, কাঁদায়।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

জীবন-সংক্রান্তি।

কারণ-পয়োধি কাঁপে স্বয়ম্ভু-ফুৎকারে—
একটী বুদ্বুদ ওই ভাঙিল আবার!
সৌর-পাকে বমদগ্নি বিশ্ব এল ঘুরে'
অপাঙ্গ-হেলনে পুনঃ ধাইল তাঁহার!
ভূতধাত্রি! মহাকাল! তিষ্ঠ নিমেষের
সম্বর ও' শ্রান্তিহীন ভীম আবর্ত্তন!
বেপমান-সন্ধিতটে ভূত-ভবিষ্যের,
দাঁড়া'য়ে পরখি মোর মানব-জীবন।
ভুলিয়া অমৃত-ভোগ সৃষ্টি-নিমজ্জনে,
সংসারের রুক্ষ প্রেম যাচি এবে, হায়!
মঙ্গল-উদ্গীথ-ধ্বনি না পশে শ্রবণে,
প্রগল্ভার কণ্ঠে হেথা প্রাণ শিহরায়!
অষ্টাদশ বর্ষ যায় প্রবাসে আমার,
জীবন-সংক্রান্তি, বিধি! কত দূরে আর?

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র গুহ

আক্ষেপ।

ভাল বাস না বাস তুমি
ভালবাসিব প্রাণ ভরিয়ে,
দুদিনের তরে দেখা শুনা,
দুই দিনে যাবে ফুরায়ে।
এত যে আকুল, স্নেহের বাঁধন
কিছুই যে হায় রবে না,
এত মেশামিশি, এত হাসি খুসি,
ফুরাইতে দেরী হবে না।
কেন তবে এই, মুহূর্ত্তের তরে
এত দিবানিশি ভাব-না,
কার কাছে আছি, কার কাছে নাই
কিছুই ত লয়ে যাব না।

শ্রীমতী মোহিনী দেবী

শ্রীযুক্ত পরমহংস শিবনারায়ণ স্বামীর উপদেশ। (১) *

পূর্ব্বতন আর্য্য ঋষিগণ সৎসঙ্গ করিতে বারম্বার বলিয়া গিয়াছেন, এবং আমাদের প্রত্যেক শাস্ত্র গ্রন্থেই সৎসঙ্গের ভূয়সী প্রশংসা করা হইয়াছে। কিন্তু সৎসঙ্গ কাহাকে বলে, ইহা গম্ভীর ও শান্তচিত্তে বুঝা উচিত। সৎ শব্দে সত্য—নিত্য, আর সঙ্গ শব্দে মিলন, সংসর্গ—সহবাস। অর্থাৎ সত্যের সহিত মিলিত হওয়া, একত্রিত হওয়া। এক্ষণে দেখা উচিত যে, এই পরিদৃশ্যমান জগতে এমন কি বস্তু আছে, যাহা সত্য এবং যাহার সঙ্গ করিলে প্রকৃত সৎসঙ্গ করা হয়। স্থূল পদার্থ মাত্রেই মিথ্যা। কেননা, উহা অগ্নিতে দিলে মুহূর্ত্ত মধ্যে ভস্ম হইয়া আকাশে মিশিয়া যায়। যদি উহা সত্য হইত, তাহা হইলে কখনই অগ্নিতে দিলে ভস্ম হইত না। সুতরাং উহা অসৎ অর্থাৎ অনিত্য। এজন্য শাস্ত্র স্থূল মিথ্যা পদার্থের সঙ্গ করিতে বলেন নাই। তবে শাস্ত্রে সৎসঙ্গ কাহাকে বলিয়াছেন? শাস্ত্র সৎসঙ্গের সারভাব এইরূপ প্রকার বলিয়াছেন যে, যে শুদ্ধ চৈতন্যপূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ,—তিনিই সত্য; তিনি তোমাতে অর্থাৎ জগতে আছেন, আর জগত অর্থাৎ তুমি তাঁহাতে আছ। তোমাকে ছাড়িয়া তিনি থাকিতে পারেন না, আর তাঁহাকে ছাড়িয়া তুমি থাকিতে পার না। সেই শুদ্ধ চৈতন্য পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ পরমাত্মাকে অন্তরে প্রেম ভক্তির সহিত ধারণ করাকে প্রকৃত সৎসঙ্গ বলে।

যে পর্য্যন্ত সেই সত্য পরমাত্মাকে অন্তরে ধারণ করিতে না পারা যায়, সে পর্য্যন্ত সৎ-শাস্ত্রের সঙ্গ করিতে হয়, অর্থাৎ সৎশাস্ত্র পড়িতে হয়; যাঁহারা সৎশাস্ত্র পাঠ করিয়াও তাহার সারভাব গ্রহণ করিতে সমর্থ হন নাই এবং যাঁহারা আদৌ পড়েন নাই বা শুনেন নাই, তাঁহাদের কর্ত্তব্য, কোন সৎ-ব্যক্তির (সাধু মহাত্মার) সঙ্গ করা। আজ কাল গায়ে ভস্ম-লেপিত, গেরুয়া বসন পরিধায়ী, রুদ্রাক্ষমালাশোভিত, জটাধারী, অনেক সাধু দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে প্রকৃত সাধু অতি অল্পই আছেন। অতএব এস্থলে পরীক্ষা আবশ্যক। সত্যই একমাত্র সাধুর জীবন। যিনি সত্য কথা বলেন, সত্যপথে লইয়া যান, সত্যে যাঁহার নিষ্ঠা আছে—মিথ্যা প্রপঞ্চ (অর্থাৎ নানা প্রকার ভেক) যাঁহার নাই, যাঁহার স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি নাই, যাঁহার সমদৃষ্টি আছে, তিনিই প্রকৃত সাধু; আর সেইরূপ লোকের সঙ্গ করিতে শাস্ত্র বলিয়াছেন। তিনি গৃহস্থ হউন বা উদাসীন হউন, স্ত্রীলোক হউন বা পুরুষ হউন, তাহাতে কিছুমাত্র ক্ষতি নাই। এইরূপ সঙ্গ করিতে করিতে অন্তরে যখন সৎসঙ্গের সারভাব ধারণা হইবে, অন্তর্যামী দয়া করিয়া যখন হৃদয়ে উদয় হইবেন, তখন আর বহির্মুখী সৎসঙ্গ করিবার প্রয়োজন হইবে না।

সত্যধর্ম্মকেও এইরূপে বুঝিতে হইবে। সত্যধর্ম্ম অর্থ—শুদ্ধ চৈতন্য, পূর্ণপরব্রহ্ম, জ্যোতিঃস্বরূপ আত্মাগুরু, তিনিই সত্য; তাঁহাকে প্রেম ভক্তির সহিত হৃদয়ে ধারণ করাকে ধর্ম্ম কহে। জগতে সেই পরমাত্মাই একমাত্র সত্য, আর তাঁহাকে অন্তরে

* শ্রীযুক্ত বাবু রাজকৃষ্ণ বসু মহাশয়ের যত্নে এই মহাত্মার কতকগুলি অমূল্য উপদেশ আমাদের হস্তগত হইয়াছে। আমরা সাদরে তাহা সংখ্যাক্রমে প্রকাশ করিব। ন, স।

শ্রম স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু আর একটু পরিশ্রম স্বীকার করিয়া পদ সমুদ্র ও গীতচন্দ্রোদয় মিলাইয়া দেখিলে তিনি আরো প্রায় একশত পদ নূতন সংগ্রহ করিতে পারিতেন। আমরা গীতচন্দ্রোদয় হইতে পাঁচটী নূতন পদ সংগ্রহ করিয়া তাঁহাকে উপহার দিলাম। তাঁহার আবশ্যক হইলে অন্য অনেকগুলি ভবিষ্যতে দিতে পারিব।

১ তোড়ী।

অঙ্গ পুলকিত মরম সহিত অন্তরে নয়ন ঝরে।
বুঝি অনুমানি কালারূপ খানি তোমারে করিয়া ভোরে॥
দেখি নানা দশা অঙ্গ যে বিবশা নাহত এবড় ভারে।
সে বর নাগর গুণের সাগর কিবা না করিতে পারে॥
শুন শুন রাই কহি তুয়া ঠাই ভাল না দেখি যে তোরে।
সতী কুলবতী তুয়া যে খেয়াতি আছয় গোকুল পুরে॥
ইহাতে এখন দেখি যে কেমন নাহিলাজ গুরু তরে।
কহে চণ্ডীদাসে শ্যাম নব রসে বুঝিলে বুঝিতে নারে॥

২। শ্রীরাগ।

তরুণী হরিণী রাই দেখিনু আঙ্গিনা মাঝে।
কিবা বা দেখিয়া দিয়া ছানিয়া গড়িল কুল বা রূপে॥
সখি কিবা সে সুন্দর রূপ।
চাহিতে চাহিতে পশি গেল চিতে বড়ই রসের কূপ॥
সোণার কটোরি কুচ যুগ গিরি কনক মন্দির লাগে।
তাহার উপর চূড়াটি বানাইলে সে আর অধিক ভাগে॥
কেমন কারিকর বানাইলে ঘর দেখিতে না পালো তারে।
দেখিতে পাইতু সিরূপা করিতু এমন মন যে করে॥
এমন মন্দিরে শয়ন করয়ে সে যেন নাগর কে।
হৃদয়ে আছিল বেকত হইল দেখিতে না পালু সে॥
হিয়ার মালা যৌবন ডালা পশারি পশারে যেন।
চাঁদ যে কাটিয়া চাকা যে করিয়া তাহে বসাইল তেন॥
অধরসুধা পরিলে কুঁদা দশন মুকুতা শশী।
মোর মনে হয় এমতি করয় তাহাতে যাইয়া পশি॥
চণ্ডীদাসে কয় ও কথাটী হয় মরম কহিলে বটে।
আর কার কাছে কহ জানি পাছে তবে সে কুযাহ ঘটে॥

৩। কামোদ।

সখিগণ সঙ্গে যায় কত রঙ্গে যমুনা সিনান করি।
অঙ্গের সৌরভে ভ্রমরা ধাবয়ে ঝঙ্কার করয়ে ফিরি॥
নানা আভরণ মণির কিরণ সহজে মলিন লাগে।
নবীন কিশোরী বরণ বিজুরী সদাই মনেতে জাগে॥
সই সে নব রমণী কে।
চকিতে হেরিয়া স্থল ত এ হিয়া ধরিতে নারি এ দে॥
পুন না হেরিলে না রহে জীবন তোমারে কহিনু দড়।
কহে চণ্ডীদাস পুরাহ লালস নাগর আতুর বড়॥

৪। ধানসী।

নাগর গুণের ধাম। জপয়ে তোহারি নাম।
শুনিতে তোহারি বাত। পুলকে ভরয়ে গাত॥
অবনত করে শির। লোচনে ঝরয়ে নীর।
যদি বা পুছয়ে বাণী। উলট করয়ে পাণি॥
কহিয়ে তোহার রীতে। আন না বুঝবি চিতে॥
ধৈরজ নাহিক তায়। বড়ু চণ্ডীদাসে গায়॥

৫। ধানসী।

সখি হে বংশী দংশিল মোর কাণে।
ডাকিয়া চেতন হরে, পরাণ না রহে ধড়ে,
তন্ত্রমন্ত্র ছিুই না মানে॥
কালার লাগিয়ে হাম হব বনবাসী।
কালা নিল জাতিকুল, প্রাণ নিল বাঁশী॥
তরল বাঁশের বাঁশী নামে বেড়া জাল।
সবার সুলভ বাঁশী রাধার হৈল কাল॥
অন্তরে অসার বাঁশী বাহিরে সরল।
পিবয়ে অধর সুধা উগারে গরল॥
যে ঝাড়ের তরল বাঁশী ঝাড়ের লাগি পাও।
ডালে মূলে উপাড়িয়া সাগরে ভাসাও॥
দ্বিজ চণ্ডীদাসে কহে বংশী কি করিবে?
সকলের মূল কালা তারে না পারিবে॥

শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র রায়।

ঋষির ভ্রম।

(বিপাশাতীর—প্রাতঃকাল।)

১

"আছি ত একই আশে, উদিবে বিমল-ভাসে,
অমানিশীথিনী-পারে সহস্র কিরণ;
কি চীরে, কি চীনাম্বরে, অদ্বৈত মাধুরী ঝরে,
পলে পলে ছিঁড়ে' ছিঁড়ে' ব্রীড়া-আবরণ।
আছি তাই অনুদিন, চাহিয়া পলকহীন,
থমকি বিপাশা সেও ভুলে গেছে নাট;—
খুলিবে প্রভাত-রাণী, হীরক-অর্গল টানি;
দীপ্ত পদ্মরাগময় আকাশ-কপাট!
চড়িয়া হিরণ্য-সেতু, উড়ায়ে বিচিত্র কেতু,
আনন্দে পশিব ধেয়ে জ্যোতির্ম্ময় ধাম;

অগস্ত্য-গণ্ডূষে শুষি', চুমায় লবে সে চুষি—
রাঙা ঠোঁটে হব হাসি—অমৃত নির্ব্বাণ!"
প্রতীক্ষা-বিহ্বল ঋষি, গায় আঁখি জলে ভাসি,
প্রস্ফুরিত-কম্বুকণ্ঠে সরমা-আহ্বান;
তমোগ্রন্থি একে একে, টুটিছে সে মন্ত্র-ডাকে,
অগ্রসন্ধ্যা ফাঁকে ফাঁকে ঘুরায় নয়ান!
গড়ায়ে সুমেরু-বুকে, কেঁদে যেন শতমুখে,
ভাঙিছে উদয়-তটে গায়ত্রী-হিল্লোল;
নলিন-কোরক-করে চেপে' হাসি রাখে ধরে;—
চকিতে ফাটিয়া হাসি খসে দিঙ্‌নিচোল!
তবু হেসে' কুট্‌কাট্‌, তবু সে অনন্ত ঠাট—
খোলে-খোলে-খোলে দ্বার, খোলে না আবার;
অঙ্গুলি-সঙ্কেতে তা'র, তাপস-হৃদয়ে আর
ঘাটে ঘাটে বাজে বীণা আশা-নিরাশার!

২

সহসা,
ধ্বনিছে উদয়-পথ---- আসে ওই উষ্কাবং,
নাচায়ে বঙ্কিম গ্রীবা, সপ্ত তুরঙ্গম!
ক্ষিপ্ত দৃপ্ত খুরঘা'য়, ভেঙ্গে' চূরে' মেরুকায়,
ঝলকে কনকধূলি ছাইছে গগন!
ত্রস্ত উষা ছুটে,---করে, শ্লথ কটিবাস ধরে,
যেতে ত্রস্ত নভোময় চিকুর-প্রপাত!—
লাজে ভয়ে গুলজার, খোলে দ্রুত প্রাচীদ্বার,
ঊর্দ্ধবাহু ডাকে ঋষি, "দাঁড়াও, প্রভাত!"
নিমেষে সকলি ফাঁকি— অবরুদ্ধ দ্বারে ঠেকি'
বিলোড়িছে মহাশূন্য প্রতিধ্বনি তার!
হানে চণ্ড দিবাকর অজস্র আগ্নেয়-শর,
প্রহরে প্রহর ডোবে,—যোগী নির্ব্বিকার!—
"একি স্বপ্ন? একি মায়া?— এ শুধু উষার ছায়া?
জ্বলেছে কি মোরি হিয়া, নহে নীলাকাশ?
হাসেনি সে অপ্‌সরী, এ শুধু সোণার ছুরী,
সাঁতারে রুধিরে মোরি, ধাঁধিয়া নিশাস?"

৩

অস্তাচলে নামে রবি, রোষে রক্ত জবাছবি,
নিশ্বসি' পশ্চিম-সন্ধ্যা আসে ধীরে ধীরে;
দেবতার অশ্রুবারি, গলিয়া পড়িল ঝরি;
রোমাঞ্চিয়া বনস্পতি, তাপসের শিরে।—
সে ত্রিদিব-রসায়নে, আবার চেতিলা প্রাণে;
ভাসিলা ফিরিয়া—কণ্ঠ কোমল, তরল!—
"তুমি কি উষার দিদি?— আর আসিব না কাঁদি,
ক'ও তারে—খুলিয়াছে হীরক-অর্গল!
পশিয়াছি, বহু ঘুরে,' সেই হিরণ্ময়-পুরে,
কোটী সূর্য্য সে জ্যোতির কণা কণা ছার!
সে তীক্ষ্ণ-চুম্বনে, মোর ছিঁড়েছে বিষয়-ডোর—
সব ভুলে' তারে লয়ে আছি অনিবার।"

ঈষৎ মধুর হাসি' আশ্রমে চলিলা ঋষি;
মূঢ় কবি করে মুহুঃ মাথা-কণ্ডুয়ন,—
চপলা প্রভাত-রাণী দেছে ধরা হার মানি!!—
পাঠক! বকিল কিও, বিটলা বামণ?

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র গুহ।

বিলাত ফেরত ও জাতিচ্যুতিকর্ত্তা।

আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি, যাঁহারা হিন্দু ধর্ম্মে অকপট বিশ্বাসী, তাঁহারা বিলাত-ফেরত হিন্দুকে সমাজচ্যুত করিবার জন্য প্রয়াসী নহেন। তাহাতে এই প্রশ্ন স্বতঃই উত্থিত হয়, তবে বিলাত-ফেরত হিন্দুকে সমাজ-চ্যুত করা পক্ষে উদ্‌যোগী ও প্রয়াসী কে? সেই প্রশ্নের উত্তর এই প্রবন্ধে দিতেছি।

সকল সমাজেই হিংস্রক ও পরশ্রীকাতর লোক আছে। কাহারও কোন বিষয়ে উন্নতি বা শ্রীবৃদ্ধি হইলে, এই সকল লোক অন্তরে জ্বলিয়া পুড়িয়া মরে। কোন গতিকে অন্যের উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধির পথে বাধা দিতে পারিলে, অথবা সৌভাগ্যশালী ব্যক্তিকে বিপন্ন করিতে পারিলে, এই সকল দ্বেষ্টাগণের অন্তর্দাহ কতক পরিমাণে উপশমিত হয়। ইহারা, একজন উন্নত ব্যক্তিকে নত করিবার জন্য, দশজন লোককে লইয়া দল বাঁধে। ইহারাই

কোন্ প্রকার মৃত্যুতে যন্ত্রণা অধিক ? রোগে মৃত্যু অপেক্ষা হিংস্র জন্তুর মুখে মৃত্যুতে কি যন্ত্রণা অধিক ? হিংস্রজন্তুর মুখে বরং শীঘ্র শীঘ্র কার্য্য নিষ্পন্ন হইয়া যায়। ভগবান্ জগতের কল্যাণের জন্যই মৃত্যুর বিধান করিয়াছেন। মৃত্যু আছে বলিয়া জগৎ নূতন জীবন ও নূতন সৌন্দর্য্যে পূর্ণ হইতেছে, পুরাতন চলিয়া না গেলে নূতনের স্থান হইত না। পুরাতন পত্র খসিয়া পড়িতেছে, নূতন পত্র নিচয় উৎপন্ন হইতেছে। কৃপাময় পরমেশ্বর জগতের কল্যাণের জন্য মৃত্যুর সহস্র দ্বার উন্মুক্ত করিয়াছেন। হিংস্রজন্তুর আক্রমণ তন্মধ্যে একটী দ্বার মাত্র। ইহাতে এমন কি আছে যে রোগাদিতে মৃত্যু অপেক্ষা ইহার প্রতি বিশেষ আপত্তি উপস্থিত হইতে পারে। মৃত্যুত হইবেই। তবে ব্যাঘ্রের মুখে মৃত্যু বা রোগে মৃত্যু, এ উভয়ের মধ্যে বিশেষ প্রভেদ কি ? মানুষ হঠাৎ মৃত্যু ভালবাসে না। সেই জন্যই, বোধ হয়, বজ্রাঘাতে মৃত্যু সর্ব্বাপেক্ষা অল্প দুঃখকর হইলেও মানুষ উহাকে ঘৃণা করে। কিন্তু অনন্তপুরুষ মানুষের রুচি বা সাংসারিক সুবিধা দেখিয়া কার্য্য করেন না। সমগ্র জগতের সমগ্র কল্যাণের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া তিনি সর্ব্বপ্রকার ব্যবস্থা করিতেছেন। আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধির কি সাধ্য যে, তাঁহার গূঢ় অভিপ্রায়ের মধ্যে সকল সময়ে প্রবেশ করিতে পারে ? (ক্রমশঃ)

শ্রীনগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

অন্ত্যেষ্টি। *

১

জান না জান না, হা রে ভূ-পিশাচগণ !
মুখে শিষ্, হাতে তূরী, পথে সে মলয়া চুঁরী
কাণে কাণে কয়েছে কি কথা কন্-কন্ ?
গঙ্গার গৈরিক'পর সে দিব্য ত্রিবেণী-পর
ফুলিতেছে খুলি পাক ফণিনী মতন,
আঁধারে মা মাথা কুটে', ফোঁফায়ে ফোঁফায়ে লুটে—
আছাড়ে কাঁটালপাড়া কাঁপে ঘন ঘন !
যাঁর সে কটাক্ষ-মন্ত্রে ঘুরিতি কুলাল-যন্ত্রে,
চিবাতেছ আজি তাঁর চিতার চন্দন ?
* * * *
যজ্ঞ-সূত্রে গরথিতা, দগ্ধ-বক্ষে ঝোলে গীতা,
শ্মশ্রুহীন শুকনাস পলিত ব্রাহ্মণ
ভুলেছে কন্যার শোক, রোমাঞ্চিয়া পিতৃলোক
স্ফুরিছে বিরল-দন্তে "বন্দে মাতরম্ !"
ছিঁড়েছে তিক্কায় কার, কচ্ছপীর এক তার—
আলুথালু বীণাপাণি খুলেছে তোরণ !
সে স্বপ্ন আনন্দ-মঠে আজি কি ফলিবে বটে ?
বঙ্কিম পশিছে ওই বৈকুণ্ঠ-ভবন !
রাখ্ রে তাণ্ডব রাখ্ ভূ-পিশাচগণ !

২

তুমি ত চলিলে, দেব বঙ্গ-দরশন !
অন্ধ বাঙ্গালার, আহা, কি হবে এখন ?
বৈকুণ্ঠে দেখিলে বাণী, চপলা কমলা রাণী,
আলিঙ্গি' দক্ষিণে বামে মধ্যে নারায়ণ—
পুছিও মা ভারতীরে, আর কি হইবে ফিরে
সুপ্ত বঙ্গভূমে তাঁর মহা-উদ্বোধন ?
ভারতের ঘুম ভেঙ্গে' বাজিবে হেমের শিঙ্গে ?
নবীনের মহাশঙ্খে হবে ভূ-কম্পন ?

* স্থানাভাবে গতবারে এই পদ্যটী প্রকাশিত হয় নাই। ন, স।

রাজকৃষ্ণ রামদাস ফুঁ দিবে অমৃত-শ্বাস,
ভারত-কলঙ্ককুষ্ঠ করি প্রক্ষালন ?
আবার কি কদাচিৎ বিশ্ববেদাঃ পুরোহিত
করিবে অনন্ত-ছন্দে বাণী-আবাহন ?
এ তব বাঙ্গালী জাতি, পোহাবে কি কাল-রাতি,
বিশ্বের সাহিত্য-যাগে পাবে নিমন্ত্রণ ?
বঙ্গগুরু ! বাঙ্গালার কি হবে এখন ?

৩

হা বঙ্কিম, কে না জানে তব অবদান ?—
কি জ্ঞানী অজ্ঞান, আর হিন্দু মুসলমান !
নাই ডাকাতের ডর, নাই আর নীলকর,
নিশীথে নিঃশঙ্ক-চিতে উতারি' উজান,
রূপসার * রূপা-বুকে, বুড়া নেয়ে, ধুঁয়া-মুখে,
বঙ্কিম বাবুর নাম আজো করে গান !
আশে পাশে নাহি আর, নাবিকের হাহাকার—
নীরন্ধ্র সুন্দর-বনে দুকূলে শয়ান,
করে কেলি দমপতি বলেশ্বর মধুমতী,
অচকিত পুলকিত, বিকাল বিহান !
পুঁথীর পাতার' পরে শ্মশ্রুবাহি অশ্রু ঝরে,
আজিও আয়েষা লাগি কাঁদে ওস্‌মান !
কাফের লম্পট ঠক্, কত মূর্খ মবারক্
দলিত-দরিয়া-দক্ষে হাবুডুবু প্রাণ !
হা বঙ্কিম, কে না জানে তব অবদান ?

৪

বৈকুণ্ঠে বঙ্গেরে, দেব, করিও স্মরণ,
ধরিয়া মা ইন্দিরার রাতুল চরণ !—
কত আর সে প্রখর ছিয়াত্তরে-মন্বন্তর
দগধ খাণ্ডব-বঙ্গ করিবে দহন ?
কবে রামধন পোদ, শোক দুঃখ দিবে শোধ,
বাঙ্গালার কৃষী বল হবে উজ্জীবন ?

ত্রিসন্ধ্যা জপিও আর, সে সাবিত্রী অনিবার—
উদাত্ত আগ্নেয় শ্রুতি, "বন্দে মাতরম্" ;
ক'ও—মাগো, আজি তা'রা—আজি বঙ্গ লক্ষ্মীছাড়া !
কাঁদাইয়া কমলার অমল-আনন !
বৈকুণ্ঠে বঙ্গেরে, দেব, করিও স্মরণ !

৫

শুনেছে তোমার ডাক—ছুটিল ব্রাহ্মণ !
বৈকুণ্ঠে বঙ্কিমচন্দ্রে লহ নারায়ণ !
হা কৃষ্ণ ! ডাকিলে তাঁয় ? মোরা যে ভুলেছি, হায়,
কুরুক্ষেত্র-প্রকম্পী সে পাঞ্চজন্য-স্বন !
আজি হা তোমারি নামে, এ পুণ্য ভারত-ধামে
নরনারী পাপপঙ্কে করে বগাহন ! !
বঙ্গবধূ নিল কই সে দীক্ষা বজ্রময়ী—
নারী নহে উরবশী, এ নহে নন্দন ;
সতী স্বাহা—পলে পলে, পাতিব্রত্য-তুষানলে
কামিনী-নিকষে হয় কামুক শোধন !
আজো বঙ্গ চিনিল না বঙ্কিমের মনোরমা—
পশুপতি-ললাটে সে লয়-হুতাশন !
বিষবৃক্ষ-বনে ঢুকি' ফোটে নি সূরযমুখী,
প্রতাপ অমরনাথ লভে নি জনম !
বাঙ্গালী বিলের চিল্—বেদসিন্ধু ভাবে বিল,
ছোঁমেরে' নথরে করে মধুর কূজন !
নবীন ভারতে, হায়, চাঁড়ালে দ্বিজত্ব চায়,
মন্ত্রপূত হোম-হবিঃ চাটে শিবাগণ !
বঙ্কিম ভাবে না আর—সে ত ক্ষুদ্র বালু ছার্—
থাপিবে তোমার ধর্ম্ম তুমি, ভগবান্ !
সাশ্রু-নেত্রে, ফেলি' কাজ, চরণে চলিল আজ্
ভারতী মা ! বরপুত্রে করিস্ সান্ত্বন !
বৈকুণ্ঠে বঙ্কিমচন্দ্রে লহ, নারায়ণ !

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র গুহ।

* খুলনা-নগরীর অনতিদূরবর্ত্তিনী নদী।

বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ। *

১

তুমি কি শোন নি, ভাই, বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ ?
ম্লেচ্ছের সে সাধা ভূত, কাটা-মুণ্ড রাজপুত
আবার ব্রহ্মণ্য-দেবে করে আবাহন !
সোমযাগ! সোমযাগ! তাই সে ডাকিল ঢাক,
সপ্ত-দ্বীপ শুনেছে সে মহানিমন্ত্রণ !
ছুটিল হৃষিত-চিত, ব্রহ্মাণ্ডের বেদবিৎ—
কাশী কাঞ্চী কাশ্মীর দ্রাবিড় কঙ্কণ !
তুমি কি শোন নি, ভাই, বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ ?

২

তুমি কি শোন নি ভাই ? এ কেমন কাণ !
শোন নাই সোমযাগে,খণ্ডজীব জোড়া লাগে,
ভব-গর্ভে নব জন্ম লভে যজমান ?
ষোড়শ ঋত্বিক্ সবে, একই ওঙ্কার-রবে,
শুষেছে সমগ্র শ্রুতি—ঋক্ যজুঃ সাম !
নিত্য যারে সবে মিলি, উগার চিবাও গিলি',
সে মন্ত্র প্রণব-পায় পাইয়াছে প্রাণ !
আবার আগুনে আহা, সাঁতারি ছুটিল স্বাহা,
ঋত্বিকের রক্তে তুলি লোমাঞ্চ তুফান !
শোন নাই—অধ্বরযু, ওঙ্কারে ধরিলে যজুঃ,
কি বহ্নি করিল বমি অরণি পাষাণ !
নির্বাণ অগিনি-গিরি,সেও হা উঠেছে চিড়ি—
বিজয়দুন্দুভি নাদে দুর রাজস্থান !
তুমি কি শোন নি ভাই? এ কেমন কাণ!

৩

তুমি কি শোন নি, ভাই, বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ ?
বেদমাতা, তুইও কি লো হ'লি বিস্মরণ ?
তুই না সাধিলি বঙ্গে, সে পঞ্চ ব্রাহ্মণ সঙ্গে,
সুপ্তা সাবিত্রীর সেই অকাল বোধন ?
আজো ছিছি আছে ঘুম, দেখ না সে পুণ্য-ভূম
অকূলে দিয়াছে ম্লেচ্ছ প্লাবিয়া কেমন !
হের সে বারিধি ভেদ—হের,বাণি,তোলে বেদ
আবার বাড়ব-রূপে কলির ব্রাহ্মণ !

* * * *

সোমযাগ! সোমযাগ! সেই যে ডাকিল ঢাক,
হাসে ওই, হায় হায়, কনোজ কঙ্কণ,
তুমি কি শোন নি, ভাই, বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ ?

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র গুহ।
বি-এ।

পরমহংস শিবনারায়ণ স্বামীর উপদেশ। (১২)

পাঠকগণ! অধিকারী ও অনধিকারী সম্বন্ধে পূর্ব্বে অনেকবার লিখিয়াছি ; কিন্তু সমস্ত বিষয় পরিষ্কার ভাবে লেখা না হওয়াতে পুনরায় আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি। যাহা হউক, এই অধিকার ও অনধিকার বিষয়ে সকলে একমত না হওয়াতে কত যে অনিষ্ট ঘটিতেছে, তাহা বলা যায় না। কিন্তু সকলেরই এ বিষয়ে নিরপেক্ষ ভাবে বিচার করিয়া কার্য্য করা উচিত। আমি শ্রেষ্ঠ ও নিকৃষ্ট,এভাব মনে রাখা কখনই উচিত নহে। আর্য্য ধর্ম্মগ্রন্থে আর্য্য ঋষিরা একথা পরিষ্কার বলিয়া গিয়াছেন। অন্য সময়ের কথা দূরে থাকুক,যখন ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের প্রবলপ্রতাপ, (পূর্ব্বের ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের কথা বলিতেছি না—আধুনিক ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম—জাতীয় স্বার্থ-ধর্ম্ম) সেই সময়ে পণ্ডিত চাণক্য,যিনি একজন অতিশয়

---

* গত বৈশাখমাসে রাজপুতানা-কিষণ্গড়াধিপতি মহারাজের সহোদর প্রসিদ্ধ সোমযজ্ঞ সম্পাদন করিয়াছেন। তৎপূর্ব্ব চৈত্রে অমৃতবাজারপত্রিকায় সমস্ত হিন্দুর প্রতি এক নিমন্ত্রণ পত্র প্রচারিত হইয়াছিল। আধুনিক বঙ্গের অলঙ্কার পরমবৈদিক শ্রীযুক্ত বটব্যাল মহাশয়ের পাঠকগণ সোমযাগের গূঢ় অর্থ অবগত আছেন।

৺ উমেশ চন্দ্র বটব্যাল, বিদ্যালঙ্কার, এম্-এ, বি-এস্, সি-আর-এস্ বিরচিত — "বেদ-প্রবেশিকা" (বঙ্গাব্দ ১৩১১, কলিকাতা), পৃ: ৯৭-১০৫ দ্রষ্টব্য।

আত্মাভিমানী ছিলেন, তিনি বলিয়াছেন যে, "আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যতি স পণ্ডিতঃ।" অর্থাৎ ভূত শব্দে জীব, সকল জীবকেই যিনি আপনার ন্যায় জ্ঞান করেন, তিনিই পণ্ডিত।" অথবা এই পরিদৃশ্যমান জগৎকে অর্থাৎ যাবতীয় পদার্থকে আপনার আত্মার ন্যায়—পরমাত্মার ন্যায় অর্থাৎ সমস্ত জগৎকে যিনি ব্রহ্মময় দেখেন, তিনিই পণ্ডিত। চৈতন্যদেব এই "আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু" মন্ত্রে প্রণোদিত হইয়া আচণ্ডালকে হরিনাম মহামন্ত্র প্রদান করিয়াছেন। হিন্দুর ত কথাই নাই, মুসলমানকে পর্য্যন্ত বিতরণ করিয়া আর্য্যধর্ম্মের উদারতা দেখাইয়া গিয়াছেন। যাঁহারা অধিকারী অনধিকারী অর্থাৎ ব্রাহ্মণ শূদ্র বলিয়া বাক্‌বিতণ্ডা করেন, তাঁহাদের জানা উচিত যে, এই জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয় কোথা হইতে হইতেছে। যে বেদ বিভাগকর্ত্তা, পুরাণ-রচয়িতা মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসের দোহাই দিয়া, ব্রাহ্মণ বলিতেছেন, শূদ্র অনধিকারী, এবং মদগর্ব্বে স্ফীত হইয়া সমাজের শীর্ষ স্থান অধিকার করিতেছেন,—সেই বেদব্যাস কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কে ও তাঁহার উৎপত্তি কোথা হইতে, জানিলেই সমস্ত তর্কের মীমাংসা হইবে। ব্রাহ্মণ নামধারি! এ সকল কি তুমি জান না, সামান্য পুরাণের কথা তুমি যে জান না, ইহাত বিশ্বাস হয় না; কিন্তু তুমি জানিয়াও জানিবে না, ইহা জানি; কেন না তোমার স্বার্থে ব্যাঘাত হইবে। কিন্তু এ সকল কার্য্য তোমার করা উচিত নয়। তোমার পূর্ব্বপুরুষগণের কার্য্য স্মরণ করিয়া কার্য্য করা উচিত। যিনি প্রকৃত ব্রাহ্মণ, তিনি এরূপ কার্য্য কদাচ করেন না। যদি কেহ বলেন যে, ব্রাহ্মণের আবার প্রকৃত আর অপ্রকৃত কি? তাহাতে আমি এই মাত্র বলি যে, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি শব্দ জাতিবাচক নহে,—ইহা নিরবচ্ছিন্ন গুণবাচক শব্দ। যিনি ব্রহ্মকে জানেন, যাঁহার শূদ্রাবস্থা অর্থাৎ অজ্ঞানাবস্থা লয় হইয়া জ্ঞান অর্থাৎ মুক্তি হইয়াছে, তিনিই ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণ ও ব্রহ্ম, একই অবস্থার নাম। তাঁহার মনে কোন ভ্রম নাই। তিনি দেখেন যে, মনুষ্য মাত্রেই এক, সুতরাং জ্ঞানের অধিকারী। সকলের যাহাতে জ্ঞান অর্থাৎ মুক্তি হয়, তিনি সেই পথে লইয়া যান। অজ্ঞান অবস্থার নাম শূদ্রাবস্থা। জ্ঞান কর্ম্মের সাপেক্ষ। কর্ম্ম না করিলে পূর্ণ জ্ঞান হয় না। সেই কর্ম্মমার্গে প্রবেশ করিবার প্রথমকাল বৈশ্যাবস্থা। কর্ম্মের পূর্ণ অর্থাৎ মধ্যকাল ক্ষত্রিয়াবস্থা। কর্ম্মের শেষ কাল জ্ঞান অর্থাৎ ব্রাহ্মণাবস্থা। ব্রাহ্মণাবস্থায় কোন কর্ম্মও থাকে না এবং ভেদাভেদ, আমি তুমি, শ্রেষ্ঠ নিকৃষ্ট, ইত্যাকার বোধ থাকে না। সমস্তই ব্রহ্মময় জ্ঞান হয়। এজন্য ব্রহ্মে ও ব্রাহ্মণে অভেদ জানিবেন। ব্রহ্মেতে ভেদ-জ্ঞান নাই এবং ব্রাহ্মণেতেও ভেদজ্ঞান নাই। সুতরাং যাঁহাতে ভেদজ্ঞান দৃষ্ট হইবে না, তিনি ব্রাহ্মণ অন্যথা শূদ্র বা ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য।

এক্ষণে আপনারা মান, অপমান, জয়, পরাজয় ও স্বার্থ পরিত্যাগ করিয়া নিরপেক্ষ ভাবে বিচার করিয়া সার ভাব গ্রহণ করিবেন। বেদাদি শাস্ত্র ও যুক্তি অনুসারে বিচার করিয়া দেখুন যে, বেদ পাঠ, ব্রহ্ম গায়ত্রী ওঁকার মন্ত্র জপ করা এবং স্বাহা মন্ত্র উচ্চারণ করতঃ অগ্নিতে আহুতি দেওয়া ও পূর্ণ পরব্রহ্মের জ্যোতিঃস্বরূপের উপাসনা করা কাহাদের কর্ত্তব্য? যথার্থ পক্ষে বলিতে গেলে, শূদ্রগণের ঐ সকল কার্য্য অগ্রে করা কর্ত্তব্য, কেননা, বেদাদি শাস্ত্র পাঠ ও ওঁকার মন্ত্র জপ করিলে এবং স্বাহা মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া অগ্নিতে আহুতি দিলে ও পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপের উপা-

জ্ঞানহীন, শ্রদ্ধাহীন, সংশয় অন্তর—
হেন জন হয় নষ্ট; সংশয়ীজনের
নাহি ইহ-পরলোক, নাহি সুখ তার। ৪০
যোগেতে সংন্যস্ত যার কর্ম্ম সমুদয়,
হে অর্জ্জুন, জ্ঞানে যার বিচ্ছিন্ন সংশয়—
হেন আত্মবান্, কর্ম্মে বদ্ধ নাহি হয়। ৪১
তবে এই অজ্ঞানজ অন্তরনিহিত
এ সংশয় করি ছেদ জ্ঞান-অসি ধারে,
কর যোগে অবস্থান—উঠ হে ভারত। ৪২

শ্রীদেবেন্দ্রবিজয় বসু।

(৪০) জ্ঞানহীন—আত্মজ্ঞান হীন (স্বামী), শাস্ত্র জ্ঞানী হীন (বলদেব, মধু) গুরূপদেশলব্ধ জ্ঞান রহিত (স্বামী, রামানুজ)।

সংশয় অন্তর—ইহা সত্য কিনা, এইরূপ যুক্ত-সংশয়। আমাদের বুদ্ধি নিশ্চয়াত্মক। বুদ্ধিতে যদি নিশ্চয় রূপে তত্ত্ব ধারণা না হয়, তবেই চিত্ত সন্দেহ যুক্ত হয়। এস্থলে সংশয় অন্তর বলিতে কতকটা Sceptic বা নাস্তিক অর্থাৎ—এসকল বিষয়েই আস্তিক্য বুদ্ধি-শূন্য, ইহাও বুঝায়। ইহাই বেদান্ত প্রভৃতি শাস্ত্রার্থে অশ্রদ্ধার কারণ।

ইহ-পরলোক—ইহলোকে অর্থাৎ এই মনুষ্য-লোকেই এই সংশয় হেতু বা নিশ্চয়াত্মক বুদ্ধির অভাবে ইহাদের ধনার্জ্জনাদি হয় না (স্বামী, মধু), এই প্রাকৃত লোকে ইহাদের ধর্ম্মকর্ম্মাদি পুরুষার্থই সিদ্ধ হয় না মোক্ষের ত কথাই নাই (রামানুজ), সুখ—শাস্ত্রীয় কর্ম্ম জন্য (বলদেব)। মধু ও স্বামী বলেন, ইহলোক—অর্থাৎ ধনার্জ্জন বিবাহাদি; পরলোক—অর্থাৎ ধর্ম্মরূপ শক্তি হইতে প্রাপ্তফল স্বর্গ ও সুখ অর্থাৎ ভোগ।

(৪১) যোগেতে—পরমার্থ দর্শন লক্ষ যোগ (শঙ্কর, মধু) অর্থ ভগবদারাধ্য লক্ষণ সমস্ত বুদ্ধিমত যোগ (স্বামী, মধু)।

সংন্যস্ত—সমর্পিত (স্বামী), ত্যক্ত (মধু), জ্ঞানাকারত্ব প্রাপ্ত (রামানুজ)।

কর্ম্ম—ধর্ম্মাধর্ম্মার্থ কর্ম্ম (শঙ্কর), লোক সংগ্রহার্থ বা স্বাভাবিক কর্ম্ম (স্বামী, মধু) প্রাচীন বা পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত বন্ধন কারণ কর্ম্ম (রামানুজ)।

স্বামী ও মধুসূদন এই শ্লোক সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, পূর্ব্বে তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায় উল্লিখিত পূর্ব্বাপর ভূমিকা ভেদে যে কর্ম্মজ্ঞানময়ী দ্বিবিধ নিষ্ঠার কথা আলোচিত হইয়াছে—তাহাই এই শ্লোকে ও পরের শ্লোকে উল্লেখ করিয়া তাহার উপসংহার করা হইয়াছে।

(৪২) অন্তর নিহিত—বুদ্ধি নিহিত (স্বামী, (মধু)।

কর যোগে অবস্থান—সম্যক্ দর্শনোপায় কর্ম্ম-যোগ অনুষ্ঠান কর (শঙ্কর, স্বামী)। নিষ্কাম কর্ম্ম কর (মধু, বলদেব)।

উঠ—যুদ্ধ হেতু উঠ (শঙ্কর, স্বামী, মধু)। কর্ম্ম যোগ করিবার জন্য উঠ (রামানুজ, বলদেব)।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা।

কস্তুরী। *

১

কস্তুরী!! কও কি কবি, এও কি তোমারি?
মোরা যে শুনেছি ভাই, দুনিয়ায় আর নাই,
কেবল ধবলা সেই হিমালয়ে ছাড়ি!
সে হিমে নাভিতে নাকি, রাঙা রক্ত জমে থাকি,
মূঢ় মৃগ নাহি বোঝে সে যে গন্ধ তারি!
নাড়ে নাড় করে কালা, কি উন্মত্ত আনন্দ-জ্বালা,
পারে না পাগল আহা রাখিতে নিবারি,
সাঁতারিয়া সিন্ধু গঙ্গা, ডিঙ্গায়ে কাঞ্চন জঙ্ঘা,
কস্তুরী-কুরঙ্গ ধায় গিরি তোলপাড়ি!
শিখরে শিখরে যত, শমন-কিঙ্কর মত,
শত শিকারীর শিঙ্গা ওঠে হুহুঙ্কারি;
কুরঙ্গী কাঁদিছে হায়, আতঙ্কে চমরী চায়,
সে চারু চামর তার লয় পাছে কাড়ি!
কুরঙ্গী কাঁদিয়ে চায়, গিরিশৃঙ্গ-জানালায়,
"চেন কি, মেনকা রাণি, মোরা যে তোমারি!"
আহাহা সে চীৎকার—জীয়ন্তে চক্ষেতে তার,

* কবিবর শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র দাস মহাশয়ের নূতন কাব্য।

সে স্ফুটন্ত নাভি পদ্ম নেত্র আহা কাড়ি!
দেখেছি রাঙ্গায়ে রবি, তোমার নিঃশ্বাসে কবি,
'কুসুম' কুঙ্কুম তার দিয়েছিল ঝারি'!
কস্তুরী—কও কি কবি, সেও কি তোমারি?

২

কস্তুরী—কও কি কবি, এও কি তোমারি?
নারীর * * * *, ক্ষম কবি—এত উমে,
গেল ও গরম রক্ত জমি, বলিহারি!
বারো বর্ষ মাস মাস, সে উগ্র আগ্নেয় বাস,
নব্যভারতের ভালে ভেসেছিল তারি?
তোমার সে দেবদেশে, রাজা প্রজা নির্ব্বিশেষে,
সত্যই আবালবৃদ্ধ সবাই শিকারী?
চাহিয়া চিলাই-তীরে, 'মনে রেখো' কয়ে ফিরে,
মানুষ-মৃগয়া করে দেবপুরে নারী?
বলেছ বান্ধব যারে, দানব সে হাড়ে হাড়ে,
অমরায় তার শ্বাসে আসে মহামারী!

* * * *

এমন কি সবে হায়, ভেঙ্গেছে অঙ্কুশ ঘায়,
প্রাণের ও পুটপাক শতধা বিদারি'?
লয়ে সে কস্তুরী-ডালা, বাসে বঙ্গ করি আলা,
'প্রেমদার' পাদপদ্মে আনিয়াছ ডারি?
কস্তুরী—কও কি কবি, এও কি তোমারি?

৩

কস্তুরী—কও কি কবি, এও কি তোমারি?
দেখেছি কস্তুরিকায়, মহাশ্লেষ্ম শুষে যায়,
তপ্ত গন্ধে ব্রহ্মরন্ধ্রে, রক্ত হয়, বারি!
'রুচি রুচি' দিন রাত্, সে প্রলাপ-সন্নিপাত,
হে পাস্তুর! ও কস্তুরী দিবে নাকি সারি?
যে থালি, তোমারি প্রায়, কাঁদিতে এসেছে হায়,
সে কি কবি! এ পাথার পারিবে সাঁতারি?
এস তবে এস সবে, সরবস্ব কার ভবে
বিধাতা নিয়েছে ছিঁড়ে বুকে দিয়া চাড়ি,
এস, কে সাজাবে চিতা, হৃৎপিণ্ড ভাজ পিতা,
কে দিলা অতুল-ধন, অকিঞ্চন নারী!
তুমি মা, তুমিও হায়, কত বর্ষ বয়ে যায়,
একবার—একবার দেখে যাও 'বাড়ী';
অজলা শ্রাবক ঘোর, আজো সে শৃঙ্গার তোর,
হৃদয়-ভৃঙ্গার কার ভাঙ্গিছে আছাড়ি,
আজো সে রক্তের ঢেপা, দু'চোখে কচালে ক্ষেপা,
'সারদা সারদা' করি ছিঁড়ে কণ্ঠ-নাড়ী!
স্বপনে সে দগ্ধ গায়, দিও এ 'কস্তুরী' হায়—
ও আঁখি-গোলাবে গুলে' দিও পিচকারী!
লও হে ভাওয়াল-রাজ! লও ভালে, ফেলে আজ
গজারি গহনে শত গজমতিহারি!
ধন্য কবি—এ যে, রাজা, মহিমা তোমারি!

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র গুহ।
বি-এ।

বসন্তে।

ইহ মধু যামিনী, বিকসিত কামিনী,
বেল, টগর, কুঁদ, জাতি,
সুখময় পবনে, ফুলদল বয়নে,
খেলই অলিকুল মাতি!
শ্রান্ত মন কাতরে, মগ্ন দুখ সায়রে,
নেত্র বহি পড়ছ কত জল,
কলয়তি সরমে, জলয়তি মরমে,
বিরহ অনল অবিরল!
হা হা কান্ত হমারি, যাইল গোকুল ছাড়ি,
কান্দয়ে দুবল পরাণ,
মৃগমদ চন্দন, লেপন গরল,
মন্দ পবন জনু, পাবক ভেল,
ভীষণ আপদ শিখরী সমান!

শ্রীবেণোয়ারীলাল গোস্বামী।

হরিণ।

সামান্ত নয়ন লোভে যদি মৃগবর,
তোমারে লইয়ে কোলে কলঙ্কী অমর!
তবে বল ও কমল-আঁখি দেখি তারি,
সামান্ত মানুষ আমি কি না হ'তে পারি?

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দাস।

ণের টীকায় লিপিবদ্ধ করিয়া দিয়াছেন। এই অবস্থায় পাঠকগণ কি প্রকারে হাজারাত ওসমানের প্রতি এরূপ দোষারোপ করিতে পারেন যে, তিনি কোরাণ সংগ্রহ করিবার সময় কোন প্রকার সংযোগ বা পরিবর্ত্তন করিয়া থাকিবেন? পাঠকগণ ইহাও দেখিবেন যে, পূর্ব্বে যে সকল বিভিন্নতা ঘটিয়াছিল এবং যে সকলকে হাজারাত ওসমান কোরাণের টীকাতে লিপিবদ্ধ করিয়া দিয়াছেন, সে বিভিন্নতা সকল এরূপ নহে যে, যাহার দ্বারায় কোরাণের প্রকৃত অর্থের কোন ইতর বিশেষ হইতে পারে। ঐ বিভিন্নতাগুলি প্রত্যেক জ্ঞানবান লোকমাত্রই দেখিয়া মুক্ত-কণ্ঠে স্বীকার করিবেন যে, এই বিভিন্নতা কোন বিভিন্নতাই নহে। ক্রমশঃ

শ্রীসৈয়দ আবদুল গফার।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা।

ঝালোয়াড়।

১

আর না, ঝালিম সিংহ! ছাড় ঝালোয়াড়!
"চুপ্ রহো—কহো মৎ—ঔর্ নেহি মেহলৎ,"
পোহাও মোহের রাত, ঘুচাও সংসার!
আজো যা হ'ল না হোস্,এ যে কামলার দোষ—
ঝিনুকে দেখিছ, রাণা, চুনী ঝালোয়াড়!
দু'চক্ষে আঙুল দিয়া, ভুল দিছে দেখাইয়া,
হা অন্ধ বান্ধব তব—তারে ভাব আড়?
কর এ গার্হস্থ শেষ, পর বানপ্রস্থ-বেশ,
হিন্দু তুমি—ক্ষত্র তুমি—কি খেদ তোমার?
আর না, ঝালিম সিংহ! ছাড় ঝালোয়াড়!

২

আর না, ঝালিম সিংহ! ছাড় ঝালোয়াড়!
আর না,আর না,রাণা! দাঁড়াও—দেখনা,কাণা,
দাঁড়াইয়া রাজদূত আঘাতিছে দ্বার!
সোণার সিন্দুক খুলে 'ও কি ও দেখিছ তুলে'—
হোহোহো সে ইন্দ্রপ্রস্থী সনন্দ তোমার?
আজো হো হো কাণ যুড়ি,বাজে সে অভয়-তূরী,
সেই বিশ্বজিতে রাজরাজেশ্বরী মা'র!
চোখে ছাঁদা,কাণে ধাঁধা—এহেন না-ছোড়-বাঁধা
হে দূত, এদেশ ছাড়া দেখেছ কি আর?
বিনে অস্ত্র-চিকিৎসায়, কভু কি ঘুচিবে হায়
হিন্দুস্থানী হা-খাইর আঁখি-অতীসার!
কও না সঙ্গিনে খুঁড়ি, চক্ষু দুটো নিক্ খুঁড়ি'—
আর দেখিবে না, দূত, সনন্দ তোমার!
আর না, ঝালিম সিংহ! ছাড় ঝালোয়াড়!

৩

আর না, ঝালিম সিংহ! ছাড় ঝালোয়াড়!
আর কি ভাবিছ ছাড়, নামাও কিরীট ভার,
এ যে মুক্তি—মহামুক্তি সমুখে তোমার!
হোহোহো! দিওনা চিত, কাঁদে মূর্খ বেদবিৎ—
"দিবে ম্লেচ্ছে, মহারাণা! ব্রহ্মাবর্ত্ত তা'র?"
ভোল সে প্রতাপ, ভীম, রাজসিংহ অপ্রতিম,
ভোল ভূত-কথা, রাণা, রাজপুতানার!
ভোল সে ব্রহ্মণ্য বল, ভাঙ্গিয়াছে দলে দল
অযুত যবন-মুণ্ড পদাঘাতে যার!
স্মৃতি আলেয়ার আলো,কাল রাত্রি করে কালো!
মূঢ় তুমি মহারাণা! চাহ মুখ তার?
এই ত ডাকিনী স্মৃতি,কু-ডাক ডাকিছে নিতি,
বিদ্রোহী কি, ব্রিটানিয়া, ভারত তোমার?
এ গৌরব-গম্বুজ, কর বজ্রে দুরমুজ,
পাড়াইয়া পিশাচীরে ভাঙ্গ তার হাড়!
উপাড় ও শিরঃশূল অনন্ত অতীত মূল,
চতুর্যুগব্যাপী অই ইতিহাস তার!
দিয়ে যে বিচিত্র চুম, ব্রিটানি, লণ্ডয়ালে ঘুম
ম্লেচ্ছ-লেলিহান খড়্গ ক্ষিপ্ত খালসার,
দেও তা ঝালিম-মুখে—ঝিমাক্ নিঝুম্ সুখে,
বাড়ুক্ ভারত-ভূমে বাঙ্গালীর ঝাড়্!
পৃথ্বীরাজ পৃথ্বী রবি, একা তাঁর চাঁদ কবি,
শত শিবা হবে ভাট ভবিষ্যে তোমার!
মা ভৈঃ, ঝালিম সিংহ! ছাড় ঝালোয়াড়!

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র গুহ।
বি-এ।

ফুল-শয্যা।

(কোন আত্মীয়ের ফুল-শয্যা উপলক্ষে)

মধুর ফাল্গুন মাস,　　প্রকৃতির চারু হাস
উঠেছে ফুটিয়া ওই বসন্ত প্রসূনে।
নাহিক গ্রীষ্মের ক্লেশ,　　ক্ষীণবল শীতাবেশ,
বহিছে মলয়ানিল মৃদুসঞ্চরণে।

পুষ্পগুচ্ছ স্তরে স্তরে, ধরণীর কলেবরে,
পুষ্পময় প্রকৃতির শোভা অতুলন।
সৌন্দর্য্য-কুহক-জাল, প্রস্ফুট বসন্তকাল,
প্রতিবিম্ব দেখাইছে জল স্থল বন।
ক্ষুদ্র গৃহকোণে আজি, পুষ্প আভরণে সাজি,
স্বরগের প্রীতিময় মোহময় হাস,
স্মিতবিম্বাধরে তার, অতুল সৌন্দর্য্য ভার,
অঙ্গে অঙ্গে লাবণ্যের ললিত বিকাশ।
স্বরগের কি বারতা এনেছ, "চম্পকলতা,"
প্রেমের রহস্যকথা কল-কণ্ঠে তব,—
"শরতের" শূন্য মনে মধুহীন এ জীবনে
ঢাল সঞ্জীবনী সুধা নিত্য অভিনব।
প্রাণে প্রাণে মেশামিশি, সুখেতে কাটুক্ নিশি,
নূতন মিলন-তান বাজুক এবার।
যেন নব ঊষা-সনে প্রণয়-নন্দন-বনে
প্রেম-কল্প-তরুতলে শিখয়ে সংসার।
নীরস কঠিন ধরা, কঠোর কর্ত্তব্য ভরা,
কুসুমিত হোক্ তব প্রেমপরশনে।
হাত-ধরাধরি করি, সাধের সংসারতরী,
বহি যাবে ধীরি ধীরি প্রেম-ঐকতানে!

শ্রীমথুরানাথ সিংহ।

কুমুদ।

সারা রাত হেসে খেলে প্রভাতে অবশ হয়ে,
আমি আঁচল বিছায়ে ভূঁয়ে রহিয়াছি শুয়ে।
হায় চুলগুলি খসে গেছে এলো মেলো হয়ে,
হায় ভ্রমর পলায়ে গেছে গান গেয়ে গেয়ে।
বুঝি আঁখি-জলে ধুয়ে গেছে অলক্তের রাগ,
পরে আছি মরে আছি কাঁদিতেছি কেঁদে বাঁচি,
বলি শ্যামা পাখী ডেকে তোলে এ কোন্ সোহাগ
মারুত চুমিতে আসে, রেণু ঢেলে দেয় বাসে,
ওই দয়েল লুকিয়ে হাসে বেশ আছি শুয়ে,
আহা কে তোরা জাগাস মোরে গান গেয়ে গেয়ে।

এই বুকে ছিল কত, পদ্মরাগ মরকত,
হায় ঝড়িয়ে পড়িয়ে গেছে আঁচলের বা'র।
পুলিনে পুলিনে ভাসি, ভাসায়ে অমৃতরাশি,
আজ খেলিছে লহরী বুঝি সেই মুকুতার
সেই মণিমরকত, প্রভাতে প্রতিভা হত,
রবি উজ্জ্বল বালুকা খণ্ড প্রশান্ত বেলায়।
আমি নামে শুধু বেঁচে আছি আধ মড়া হয়ে,
এই অনিমিখ্ আঁখি লয়ে পথ পানে চেয়ে।
আজ্ যখন ডুবিবে রবি উদয় অচলে,
হেথা আসিবে গোধূলি বালা এলোমেলো চুলে,
বাল্য সখি সে আমার, মণি-কাননের হার,
আহা আসিবে আমারি তরে ছুটাছুটি করে,
এবে বুঝিবা ঘুমিয়ে আছে স্বরগের দ্বারে,
অথবা আমারি তরে নক্ষত্রের রাশ
সুখে গাঁথিছে, শিখিছে বসি জ্যোছনার হাস।
দিবসের আলো থাকি, দুহাতে সরায়ে রাণী,
আহা আমারি আমারি তরে আসিবেক ধেয়ে
হাতে ক'টি ফল ক'টি ফুল জল টুকু নিয়ে।
গোধূলির কোলে বসি, আসিবে শরতশশী,
সবে রাশি রাশি অংশু মালা উপহার দিয়ে,
তাই আছে অনিমিখ আঁখি পথ পানে চেয়ে।
এই বুকে ধ্রুবতারা, ঢালিবে অমৃতধারা,
সুখে আমিও ডাকিব তারে আঁখি চাপা দিয়ে।
কি কথা বলিতে মোরে, জ্যোছনা আসিবে ধীরে,
পথে হাসিবে মলয়ানিলে স্বরগের মেয়ে,
সুখে আমিও হাসিব তার মুখপানে চেয়ে॥

শ্রীঅম্বুজাসুন্দরী দাস।

জীবন।

(ক)

দুদিনের তরে কি জীবন
দুই দিনে ফুরাইয়া যায়?
প্রভাতের কুসুম যেমন
রবি করে মধ্যাহ্নে শুকায়?

(১)

কুসুমের মত প্রভাত বেলায়
কত আশা লয়ে ফুঠে উঠে হায়!
না পুরিতে সেই সব আশা
না মিটিতে প্রাণের পিপাসা,
না গাইতে প্রেম, সহিয়ে যাতনা
না জানাতে শত, বিরহ-বেদনা
বুকে রেখে বুকের বাসনা
হৃদে লয়ে অপূর্ণ কামনা
শুষ্ক বৃন্ত হ'তে খসিয়া যায়
মানবের এ জীবন হায়!

(২)

অথবা কালের অনন্ত সাগরে
রহিয়া রহিয়া মুহূর্ত্তের তরে
আবার তাহাতে মিশিয়া যায়
ক্ষণহারী জলবিম্ব প্রায়?

করিতেছি। যে দেশে জন্মিয়াছি, যে পরিবারে আছি, যে সমাজের দ্বারা উপকৃত এবং যে রাজার সুশাসনে উন্নীত, এ সকলের মঙ্গলের জন্য প্রতিনিয়ত প্রার্থনা করিতেছি, খাটিতেছি, দেহপাত করিতেছি। অন্য কামনা নাই, অন্য বাসনা নাই। শেষ বা সংস্করণ-মন্ত্রে আমাকে বিশ্বপতি দীক্ষিত করিয়াছেন, তাঁহারই উত্তেজনাতে, কৃপাতে, দয়াতে নিত্য অনুপ্রাণিত হইয়া, নৈরাশ্যে আশা, অন্ধকারে জ্যোতির স্বপ্ন দেখিতেছি। সেই অন্তর্যামিত মহানই জানেন, কিসে কি হইবে। আমি কেবল তাঁহার উপর নির্ভর করিয়া, তাঁহার প্রেরণায় খাটিয়া২ দেহপাত করিব। আমার অন্য বাসনা, অন্য কামনা, অন্য ইচ্ছা নির্ব্বাণ হউক, আমি ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা-সাগরে নিমগ্ন হইয়া আত্মবর্জ্জিত, অনাসক্ত, নির্লিপ্ত, নিশ্চিন্ত, নির্ভয় হই। মা এই অগ্নি-মন্ত্র সাধনার মহা শ্মশানে আমার সহায় হউন।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা।

মঙ্গলোপহার। *

১

বধূ-বরণ।

"ওঁ সম্রাজ্ঞী শ্বশুরে ভব সম্রাজ্ঞী শ্বশ্রাং ভব।
ননান্দরি সম্রাজ্ঞী ভব সম্রাজ্ঞী অধিদেবৃষু॥"
ঋ, ১০ম, [illegible], ৪৬ ঋক্।

সম্রাজ্ঞী শ্বশুরে হও, সমরাজ্ঞী শ্বাশুরীর।
দেবরে সম্রাজ্ঞী হও, সমরাজ্ঞী ননদীর॥
মনে তো থাকিবে, রাণী,
ঋষির ও মধু বাণী—
এ গার্হস্থ্য সাম্রাজ্য তোমার;
দেখো মা, না যেন শোষে
দুরভিক্ষ অসন্তোষে,
হোয়ো লক্ষ্মী, হোয়ো রাজ্ঞী তার!
দুনিয়ায় বাদশাহী
এমন তো আর নাহি,
হোক্ রুম্ হোক্ হিন্দুস্তান;
দেখেনি মৃদঙ্গ-ধার,
কল্যাণে কানাড়ায়,
এ মুলুক্ মিঞা তানসান!
দেখো মা হৃদয়ে লিখা
এ হিরণ্য হোম-শিখা,
এ অমর সনন্দ তোমার;
তোমাতে মূরতিমতী
হোক্ পুরাতন শ্রুতি,
এ জীবনে দেখি একবার!

২

গীত। *

বিবাহে

রাগ বসন্ত—তাল তেতালা।

কে তুমি এলে, বধূ, ল'য়ে বসন্তে,
এ বিজন যৌবন যমুনারি বক্ষে।
চল চুড়ী মঞ্জীর জলতরঙ্গের মীড়,
কাটে হিয়া সিন্দুরিয়া কাফি বসন্তে।
কনক কলসী তায় ছুঁও ছুঁও কলিজায়,
আর তো না সামালে সে অঙ্গে অঙ্গে॥

বাসি বিবাহে

রাগ সিন্ধুভৈরবী—তাল তেতালা।

বাসি বিয়ে কও, নারী, শুনে' হাসি পায়।
বিবাহ যে ভালবাসা সে কি বাসি হয়।
চাঁপা, চামেলী গুলে বসন্তেরে বেঁধে চুলে,
দলিয়া মলিয়া হেলে কর তারে ক্ষয়;
সে তো কালের শ্বাসে শুখিতে শুখিতে হাসে,
সে আত্তর-স্নেহ হারে সে কি কভু যায়॥

ফুলশয্যায়

রাগ ছায়ানট—ঠুংরী।

হের জাগে কার হরিণ নয়নী
ফুলশয়নে সুখ রয়নী রে।
ফুলে ফুলে ভুল, আঁখি না পাএ কূল,
কূল সায়রে ফুল নায়রী রে।
চকোর চাঁদিনায় করিছে হায় হায়,
হাসে বিধু বিধু-বয়নী রে॥

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র গুহ।
এম্-এ।

---

* পরম সুহৃৎ শ্রীযুক্ত গুণদাচরণ সেনগুপ্ত এম্-এ, মহাশয়ের শুভবিবাহে রচিত।

* স্বরলিপি ও টী প্রকাশন — "মন্দিরা", ভাদ্র—১৩৬২, পৃ: ৩১৩-৩১৪; "[illegible]", [illegible], পৃ: ৩০-৩২, ১৩৬২; ঐ, কার্ত্তিক-অগ্রহায়ণ, পৃ: ১০২-১০৪, ১৩৬২; ঐ, অগ্রহায়ণ, পৃ: ৪১-৪৪, ১৩৬২।

কি দিব মা ভারতী তোমায়!

(শ্রীপঞ্চমী উপলক্ষে)

১

আজি ব্রহ্ম-মুহূর্ত্তে উদয়-অচলে
কি মধুর প্রীতি-আবাহন,
কি মহিমা-বিমণ্ডিত চারুনীলাম্বর
জ্যোতির্ম্ময় প্রভাত পবন;
শিহরি উঠিছে প্রাণ আনন্দে অধীর
বসুন্ধরা আনন্দে সুধায়,
কি দিব মা ভারতী তোমায়!

২

ওই উর্ম্মিমালী উন্নামিত কিরণ-আয়ুধে
ফেনময় অনন্ত অঙ্গন,
অট্ট অট্ট মহাহাস্যে উদ্দাম তাণ্ডবে
উন্মাদিত করে প্রীতি রণ;
আজি দীন বঙ্গাসরে বসন্ত পঞ্চমী
সুরভিত লবঙ্গ লতায়;—
কি দিব মা ভারতি তোমায়!

৩

ওই ভাঙ্গা ভাঙ্গা মেঘমালা রবি ভাঙ্গা ভাঙ্গা
ঢল ঢল তরল শিশির,
নাচিছে কাঁপিছে ধীরে প্রসূনে প্রসূনে
শূন্য প্রাণে আনন্দ অধীর;
তরঙ্গিত চরাচর ভাবের তরঙ্গে
উন্মাদিত নব মলয়ায়,
কি দিব মা ভারতি তোমায়!

৪

আজি আয় সবে আয় কেতকী মালায়
রসাল-মঞ্জরী থরে থরে,
মাধবী লতায়, যুঁই, মল্লিকা, গোলাপে
তোরণ সাজাই ধীরে ধীরে,
আজি নব ফুল্ল আন চারু সরোজিনী
ভকতি-অঞ্জলি নিয়া আয়,
আজি প্রাণ ভরি আন মরম-কবিতা,
কি দিব মা ভারতি তোমায়!

৫

আজি কানন-কিন্নর— বিহগের বীণা,—
নিয়ে আয় ছত্রিশ রাগিণী,
আজি বিদ্যাধরী কণ্ঠ— নটিনী-কিন্নরী
নিয়ে আয় গীতি নির্ঝরিণী;
আজি অবসাদ, ব্যথা ভাবনা ভুলিয়া
একপ্রাণ সবে মিলি আয়!
গলায় গলায় আজি আনন্দে আনন্দে
কি দিতে মা ভারতি তোমায়!

৬

ওমা দিব কি তোমায় দীন দুঃখী মোরা,
কোথা পাব কাব্য-পদ্মাসন!
স্বর্গীয়া জননী বাণী দরিদ্রের গৃহে
উর মা এ দরিদ্র আসন;
হৃদয়-অঞ্জলি মাগো, নয়নের জল,
কবিতার উৎস রাঙ্গা পায়;
নিগম জননী মাগো স্নেহে নেও আজ
কি আছে মা কি দিব তোমায়!

৬

রবি-শশী কুলে দেখ জোনাকি সংহতি
একি ওমা সেই আর্য্যদেশ?
সেই অযোধ্যা উজ্জীন নর্ম্মদা, যমুনা
—একি মাগো সেই ভস্মশেষ?
সেই নিগম-তরঙ্গে উদ্বেল উচ্ছল
একি সেই সরস্বতী নীর?
সেই অমর বীণার মোহন ঝঙ্কার
কণ্ব মুনি আশ্রম গভীর!
একি ব্রজ কুঞ্জবন, মধুর মুরলী
গুঞ্জিত নিকুঞ্জ মলয়ায়!
কোথা জয়দেব,' হর্ষ মুকুন্দ, ভারত
কি দেখাব ভারতি তোমায়?

৮

নাই সে নৈমিষারণ্য বিন্ধ্য, নীলাচল,
গোদাবরী তরঙ্গ কল্লোল,
দ্বৈপায়ন, বাল্মীকি, মাঘ, ভবভূতি
সঞ্জীবনী মাধুরী তরল,
মৃত ভক্ত তরে তোর পুলিন-শালিনী
কাঁদিছে মা কাবেরী, যমুনা,
ধূ ধূ ধূ অনন্ত লক্ষ্যে ধূ ধূ ধূ অনন্ত কাল
কাঁদিছে মা বিষাদ মলিনা;
কাঁদিবে মা আজীবন গীতস্রোতে ডাকি
উত্তরোলে করুণা স্বামায়,
উত্তপ্ত সুদীর্ঘ শ্বাসে অতীত কাহিনী গাহি
ভারতি মা পূজিবে তোমায়!

হয় ও সৎপথে চলিতে পারে। এরূপ আচরণে প্রসন্ন হইয়া পরমাত্মা জ্যোতিঃস্বরূপ জগতের মঙ্গলবিধান করিবেন।

যদি মনুষ্যের মধ্যে একজনও অধিকারী হইয়া থাকিতেন, তাহা হইলে জীবের এরূপ কষ্ট হইত না, সমস্ত অমঙ্গল দূর হইত। এখন কেবল মুখেই অধিকারী অনধিকারী বলা সার হইয়াছে!

আর একটী কথা বুঝিতে হইবে। পরমাত্মা যে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যে কার্য্য হইবার নিয়ম স্থাপনা করিয়াছেন; কিছুতেই তাহার ব্যতিক্রম ঘটে না। কাহারও এমন ক্ষমতা নাই যে, তাহার পরিবর্ত্তন করে। সে নিয়ম কি, বলিলেও যে কার্য্য হইবে, না বলিলেও সেই কার্য্য হইবে। সে কথা মুখে বলা আর না বলা দুই সমান। বল আর না বল, চক্ষের দ্বারা দেখিতে হইবে, কর্ণের দ্বারা হইবে না ইত্যাদি। পরমাত্মার নিয়ম অনুসারে যাহার যেরূপ স্বভাব হইয়াছে, তাহার সেইরূপ গুণ বর্ত্তাইবে ও ক্রিয়া ঘটিবে। অধিকারীকে অনধিকারী বা অনধিকারীকে অধিকারী করিতে মনুষ্যের সামর্থ্য নাই। হস্তীকে মনুষ্য বা মনুষ্যকে হস্তী করা অসম্ভব। জীবের মধ্যে যাহাকে যেরূপ ক্রিয়া শক্তি বা গুণ, অধিকার অনধিকার পরমাত্মা দিয়াছেন, কোন মতে তাহার অন্যথা হইবে না। স্বভাবতঃ তদনুসারে কার্য্য হইবে। মুখে বলিয়া বা অন্যবিধ চেষ্টা করিয়া কাহাকেও অধিকারী অনধিকারী করিতে হয় না। করিবার চেষ্টায় সত্যভ্রষ্ট হইয়া আপনার পরের কষ্টভোগ মাত্র ঘটে ও শ্রেষ্ঠ কার্য্য হইতে বিমুখ হইতে হয়। অধিকার অনধিকার যাহা কিছু পরমাত্মা করিয়াছেন ও করিবেন, ও তিনিই জ্ঞান বা মুক্তি দিবেন। যেখানে তোমার অধিকার নাই, সেখানে তুমি আগে নিজে অধিকারী হও, তবে অপরকে অধিকারী বা অনধিকারী করিবে। ইহা নিশ্চিৎ জানিও যে, কেবল পরমাত্মাই অধিকারী বা অনধিকারী করিতে পারেন, ইহাতে মনুষ্যের কোন হাত নাই। তিনি যখন অন্ধকার করেন বা সুষুপ্তি ঘটান, তখন জ্ঞানী অজ্ঞান, পণ্ডিত মূর্খ প্রভৃতি সকলেরই সুষুপ্তি ঘটে বা অন্ধকার বোধ হয়। এমন নহে যে, জ্ঞানী পণ্ডিত আলোকের সাহায্য বিনা শাস্ত্রাদি পাঠ করেন এবং মূর্খই কেবল আলোকের সাহায্যে কার্য্য করে।

অতএব মনুষ্যমাত্রেই অধিকারী অনধিকারী এরূপ সংস্কার অভিমান ও মিথ্যা স্বার্থ পরিত্যাগ করিয়া জগতের হিতসাধনে যত্নশীল হও ও পরমাত্মাতে নিষ্ঠা স্থাপন কর। তিনি মঙ্গলময়, সমস্ত অমঙ্গল দূর করিয়া মঙ্গলবিধান করিবেন। ইহা ধ্রুব সত্য সত্য। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

পরমহংস শিবনারায়ণ স্বামী।

পূর্ণ বাবুর নূতন চিন্তা।*

কাব্যচিন্তা সাহিত্যচিন্তারই পরিশিষ্ট। প্রথমে দ্বিতীয়েরই অনুরণন শুনিতেছি। দুয়েরই উদ্দেশ্য এক। শেকস্পিয়ারের ট্রাজিডি এবং, বোধ হয়, বঙ্কিমের উপন্যাস

* কাব্য-চিন্তা। শ্রীপূর্ণচন্দ্র বসু প্রণীত। কলিকাতা; ভন্ প্রেস। মূল্য ১৲ টাকা। ১৩০৭।

পড়িয়া পড়িয়া আমাদের ঘরে আগুন লাগিয়াছে—"সমাজে অসুরের সৃষ্টি হইয়াছে"—"আত্মঘাতী ও পরঘাতী খুনীদলের সৃষ্টি হইতেছে।" ব্যাপার সাঙ্ঘাতিক। অবিলম্বে রামায়ণ, মহাভারত, এবং আঠার পুরাণ দিয়া সমাজদেহে এ বিষবীসর্পের রোধ করিতে হইবে। কাব্যসুন্দরীর পর তাই কাব্যচিকিৎসারও প্রয়োজন হইয়াছে।

প্রয়োজন তো হইয়াছে, কিন্তু পূর্ণবাবু আমাদিগকে ক্ষমা করিবেন—আমরা কথাটা বুঝিতে পারি নাই। "বিলাতী শেক্সপিয়ারের ভাল ভাল ট্রাজিডি-দ্বারা সমাজে অসুরের সৃষ্টি হইয়াছে বটে"—"বটে"দ্বারা বুঝিতেছি, পূর্ণবাবুর আর একছিটা সংশয়ও নাই। কিন্তু তিনি তো সংশয়ের পারে পৌঁছিলেন, আমাদিগকে বড় খট্‌কায় রাখিয়া গেলেন। প্রতিজ্ঞাটী কি স্বতঃসিদ্ধ? যদি নিতান্তই স্বতঃসিদ্ধ না হয়, তবে পূর্ণবাবুর কাছে তার একটু প্রমাণ চাহিতে ইচ্ছা হয়। সমাজশরীরে সাহিত্যের প্রভাব নাই, এমত বলিতেছি না। সমাজে সাহিত্যের প্রভাব অপরিসীম। বোঝাই কামানে চকমকি লাগাইয়া একটা ডিক্‌শনারি ফরাসি বিপ্লব ঘটাইয়াছিল। ধর্ম্ম অধর্ম্ম, সাহিত্য দুয়েরই রসায়ন হইতে পারে। কেন সমাজে পাপ বিদ্যমান, দেশভেদে কালভেদে কিসে তার পরিপুষ্টি হয়, সমাজতত্ত্বে এতদপেক্ষা গুরুতর সমস্যা আর নাই। পূর্ণবাবুর প্রতিজ্ঞা সেই কার্য্যকারণসম্বন্ধগর্ভা। সে সম্বন্ধ অনুমানগম্য। অনুমানে অব্যভিচারী হেতু আবশ্যক। ইংলণ্ডের সকল পুলিশ কোর্ট, সকল Assizeএর মোহাফেজখানা মন্থন করিয়া, পূর্ণবাবুই হউন আর যিনিই হউন, যদি কেহ সেইরূপ হেতু উদ্ধার করিতে পারিতেন, তবে এ প্রতিজ্ঞা বাহাল থাকিত। প্রতিজ্ঞাটা আগে ইংলণ্ডেই প্রতিষ্ঠিত হউক, তারপর এ দেশে হইতে পারিবে। এ দেশের সহিত শেকস্পিয়ারের আজও তেমন মাখামাখি প্রণয় হয় নাই। প্রতিজ্ঞা-প্রমাণের ভার পূর্ণবাবুর উপর। যতদিন না তাহা হইতেছে, ততদিন আমরা তাঁহার প্রভূত লোকহিতৈষণায় মোহিত আছি, কিন্তু প্রভূত তথ্যবাদিতার প্রশংসা করিতে পারিতেছি না।

পূর্ণবাবুর দেখাইতে হইবে যে, শেকস্পিয়ারের ট্রাজিডিরাজি প্রচারিত হইবার পূর্ব্বে সমাজে অসুর ছিল না বা কম ছিল এবং তাহার পর, তাহারই ফলে, সমাজে অসুরবংশের সৃষ্টি বা বৃদ্ধি হইয়াছে। তাহারই ফলে—বিশেষণটা যেন পূর্ণবাবুর স্মরণ থাকে। আর এক কথা। যতদূর বুঝিয়াছি, পূর্ণবাবুর প্রতিজ্ঞা সঙ্কুচিতা নহে—প্রসারিণী। তিনি এমত বিবেচনা করেন না যে, ট্রাজিডিগুলি রামে রহীম্ বুঝাইয়া বা এমনই একটা কিছু দিয়া দৈবাৎ এখানে সেখানে দুই চারিটা নরপশুর এক আধটুকু ঘাসজল যোগাইতে পারে মাত্র। তাঁহার ধারণা, সেকস্পিয়ারের ট্রাজিডিগুলির রজস্তমোবৃংহিনী একটা নিত্যশক্তিই আছে; তাহারা স্বভাবতঃই চিত্তের ক্রূর ভাবগুলিকে শাণাইয়া তুলে; তাহাদের হাওয়ায় চড়িয়া খালি ডাইন ফিরে, আর হাতের কাছে যাহাকে পায়, তাহারই গলা ভাঙ্গিয়া রক্ত খায়; এক কথায়, "তাহাদের অধ্যয়ন-ফল অতি অপকৃষ্ট"। অতএব যদি কদাচিৎ ঐ সকল ট্রাজিডিদ্বারা দুই চারিটা কাণা রাক্ষসের উদরপূর্ত্তি হইয়া থাকে, তাহাতেও পূর্ণবাবুর ইষ্টলাভ নাই; কেন না কাণা-

চিৎক সাধনে ঐরূপ ব্যাপক প্রতিজ্ঞার সিদ্ধি হয় না। অধিকন্তু, সেরূপে ইষ্টলাভ করিতে গেলে বেদব্যাসের বিপদ্ ঘটে। সুপ্তপাঞ্চাল-হত্যার মনন করিয়া অশ্বত্থামা মাতুল কৃপা-চার্য্যকে তাহা জানাইলেন। শুনিয়া কৃপাচার্য্য কত সান্ত্বনা, কত ভর্ৎসনা করিলেন। কিন্তু অশ্বত্থামা সঙ্কল্প পাকা করিয়াছিলেন, ফিরি-লেন না; আপনার অনুকূলে পাণ্ডবগণের বিবিধ কপটযুদ্ধের নজীর দেখাইলেন।* ধর্ম্ম-পক্ষও অধর্ম্মেরে উৎসাহ দিল; লোমহর্ষণ সৌপ্তিকপর্ব্ব কর্ম্মে অভিনীত হইল। খণ্ড প্রমাণে শেকস্পিয়ারকে গুনাহ্‌গার করিলে এখানে বলিতে হয়, পাণ্ডবচরিতের অধ্যয়ন-ফল আরও জঘন্য; কেন না সে চরিত ধর্ম্মচরিত বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াও অসুর সৃষ্টির মশলা যোগাইয়াছে বা যোগাইতে পারে। তাহাতে বেদব্যাসের বিপদ্ ঘটে।

যে যাহা ইচ্ছাপূর্ব্বক করে নাই, তাহাকে তার স্রষ্টা বলিতে পারি না। যে যাহা ইচ্ছাপূর্ব্বক পোষণ করে নাই, তাহাকেও তাহার পোষক বলিতে পারি না। এইজন্য আমি শেকস্পিয়ারকে অসু-রের স্রষ্টা বা পোষ্টা বলিতে রাজি হই নাই। তবে অসুরে শেকস্পিয়ারের ট্রাজিডির মধ্যেও আপনার খোরাক্ খুঁজিয়া লইতে পারে, আমি সে কথা অস্বীকার করি নাই। জিঘাংসাজ্বলিত দ্রৌণায়ন পাণ্ডবের যুদ্ধ-নীতিতে সেইরূপ খোরাকই পাইয়াছিল, দেখাইয়াছি। ফলে যার যেমন ভাবনা-তার তেমনই সিদ্ধি হইয়া থাকে। কাব্যা-র্থের পরিশীলনেও তাই। ডেল্‌ফির দৈব-বাণীর মত প্রৌঢ়কাব্যবাণীও দ্বিজিহ্বা। যে যেমন বাসনায় চিত্ত মাজিয়া আসি, সে তেমনই উত্তর চিত্তনিকষে কষিয়া লইয়া যাই। সেইটীই সোনালী রেখায় ফুটিয়া উঠে, আর কিছুর দাগ পড়িতে দেখি না। এক আওয়াজই তার শুনিতে পাই, আর একটা আওয়াজ আর বড় শুনি না—শুনি-লেও বুঝি না—বুঝিলেও বা বুঝিতে চাই না। "জ্ঞাতির বিষয়—তা, সংসারে থাকিতে হইলে সে-টু-কু করিতে হয়। তাতে দোষ কি?" "দোষ বেশী কিছু না—দুর্য্যোধনের যাহা হইয়াছিল।" "কি, মরণ? মানুষ আবার অমর হয় নাই কি? দুর্য্যোধন রাজ্য-লাভ করিল, ঐশ্বর্য্যভোগ করিল—আর চাই কি? সব করিল, তার পর তবে মরিল—ক্ষত্রিয় যেমন মরে, তেমনই মরিল। সে মরণেও মুমূর্ষু বীরের শিরে অমরপুষ্প-বৃষ্টিপাত হইয়াছিল। আর যুদ্ধের নামে জুয়াচুরি ধরিলে সেও মারিত বই মরিত না।" "মরণের কথা নাই বা বলিলাম, কিন্তু অধর্ম্ম?" "অধর্ম্ম কি? নাবালগ্ পাণ্ডুপুত্রগণকে তো কৌরবেরা রাজ্য প্রত্য-র্পণই করিয়াছিল। তার পর পাণ্ডব আপন খোশীতে রাজ্য পণ করিয়াছে। সে তো Contract*—চুক্তি। চুক্তির শর্ত্তে পাণ্ডব রাজ্য হারিয়াছে, দুর্য্যোধনের অপ-রাধ কি? জিত রাজ্য ছাড়িয়া দিলে দুর্য্যোধনের ঔদার্য্য প্রকাশ পাইত, কিন্তু না ছাড়িবায় অধর্ম্ম হয় নাই।" "তাই কি?" "তাই না তো কি? এত যে ধর্ম্ম ধর্ম্ম করিয়া মর, কই, তোমার ধর্ম্মরাজেরও তো বনরাজ্যটী ছাড়া আর কোনও রাজ্য বড় একটা জুটিতে দেখিলাম না—জুটিল তো বেশী দিন কপালে লাগিল না! জয়-স্নানের পরেই যে দেখি মহাপ্রস্থানেরও

* মহাভারত, সৌপ্তিকপর্ব্ব, ৫ অঃ।

* ব্যবহারবিদেরা বলিবেন, wagering contract।

ডাক পড়িয়াছে!" সবালজবাবে বেদব্যাস বোকা বনিয়া যান; আমরা ঠিক্ হইয়া জাতির সঙ্গে পাশা খেলিতে বসি যে যেমন ভাবিয়া আসি, সে তেমনই বুঝিয়া যাই। কাব্যবাণী হাসিয়া বলে—

> ন কর্ত্তৃত্বং ন কর্ম্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ।
> ন কর্ম্মফলসংযোগং স্বভাবস্তু প্রবর্ত্ততে॥

একবার যদি সাফাই হইয়া গেল, তার পর আর তখ্‌তে বসাইতে দেরি লাগে না দুর্য্যোধন যদি মঞ্জুর হইল, তবে সুতরাং পাশাখেলা, বস্ত্রহরণ, বনবাস, অভিমন্যুবধ —কিছু আর নামঞ্জুর থাকে না। মহাভারত কণ্ঠস্থ করিয়াও জাতির সর্ব্বনাশ করিবার বাধা হয় না। বঙ্গসমাজে বাল্মীকি-ব্যাসের প্রভাব বর্ণন করিতে করিতে পূর্ণ বাবু যে মনোমোহন চিত্র আঁকিয়াছেন, সে চিত্রে নিসর্গের আলোটুকু ফুটিয়াছে, অন্ধকারটুকু ফুটে নাই। বুঝি বা পূর্ণ বাবু ইচ্ছা করিয়াই অন্ধকারটুকুকে আর ফুটিতে দেন নাই। লোকশিক্ষাকল্পে এইরূপ কেবলজ্যোতির্ম্ময় চিত্রই উপযোগী বটে, কিন্তু তত্ত্ববিচারস্থলে ইহাকে সত্যের অপলাপী না বলিলেও সত্যের দেশমাত্রদর্শী বলিতে হয়। চিত্রে অন্ধকার উঠে নাই, কিন্তু আদর্শে তো অন্ধকারও আছে। এক দিকে যেমন রামায়ণ, মহাভারত কত পুণ্যবান্‌কে আশীর্ব্বাদ করিয়া কত পাপীকে পুণ্যপথে লইয়া আসিয়াছে, আর এক দিকে তেমনই কত যে পাপিষ্ঠ তাহা হইতেই পাপের বীজ খালি খুঁটিয়া খাইয়াছে— তার কি সংখ্যা আছে? কিরূপে খুঁটিয়া খায়, উপরে আমি তাহারই একটা নক্‌শা দিয়াছি। ফলে যে দুর্ব্বাসনার শিকড় আত্মার স্তরে স্তরে বিঁধিয়া গিয়া কামড়াইয়া ধরিয়াছে, শাস্ত্র বল, ইতিহাস বল, কাব্য বল, তার উচ্ছেদ কেহ করিতে পারে না। সর্ব্বত্রই সে আপনার অনুলোম ধাতুটী শুষিয়া আত্মসাৎ করে, প্রতিলোমটী যেমন ছিল তেমনই রাখিয়া যায়। যেখানে আইন নাই বা থাকিয়াও অস্পষ্ট, সেইখানেই নজীরের প্রয়োজন হয়। দুষ্কর্ম্মের আইন নাই। তাই বুঝি তারও নজীর খুঁজিতে হয়। নজীরের যেটুকু লোক্‌শানী থাকে, সেটুকু রিফু করিয়া লই; আমাদের যেটুকু খুঁত ছিল, নজীর পাইবার পর সেটুকুও পরিষ্কার হইয়া যায়। নজীর না পাইলে লোকে পাপ করিত না, এরূপ বলি না। কিন্তু নজীরে পাপের বড় উপকার করে। অনেক সময়েই তো দেখিতে পাই, যে পাপ বাসনা ক্ষণস্থা হইত, নজীর পাইলে সে চিরজীবিনী হয়; যে লোলা ছিল, সে বিলোলা হয়; যে বিলোলা ছিল, সে কর্ম্মোন্মুখী হয়। পক্ষান্তরে, পাপের অনুষ্ঠান করিয়া যে একটু কেমন কেমন ভাবিতেছে, নজীর পাইলে সে খাতিরজমা হয়। রামায়ণ মহাভারতে এরূপ নজীরের অভাব নাই। যে চায়, সেই পায়। কত পাষণ্ড পাইয়াছে, তার ঠিকানা কি? পাপের তেমন বাছা বাছা বিচিত্র নজীর শেকস্পিয়ারেও নাই। এক মহাভারতে পাপের যত ইতিহাস, যত উপাখ্যানে, যত সংবাদ, যত গাথা আছে, শেকস্পিয়ারের সপ্তত্রিংশন্নাটকীয় সঙ্কলিত পাপরাশি তার কলার কলামাত্র। শেকস্পিয়ারের ট্রাজিডিদ্বারা যদি অসুরের সৃষ্টি হইয়া থাকে, তবে রামায়ণমহাভারতদ্বারাও যে অসুরের সৃষ্টি হয় নাই, কে বলিবে? অথচ বাল্মীকি ব্যাস ধর্ম্ম ছাড়া অধর্ম্মের উপদেশ দেন নাই। তবে আর শেকস্পি-

য়ারেরই বা অপরাধ কি? তিনিও তো মানুষকে অসুর হইতে বলেন নাই।

সকল প্রশ্নেরই উত্তর থাকে, এ প্রশ্নেরও একটা উত্তর আছে। উত্তর কাব্যচিন্তায় নাই, সাহিত্যচিন্তায় আছে। উত্তরটার দুই বুনিয়াদ্। একটা অলঙ্কারশাস্ত্রের কাছাকাছি, আর একটা ধর্ম্মশাস্ত্রে। প্রথমতঃ, মাকবেথপ্রভৃতি ট্র্যাজিডিগুলিতে খালি ছুরী, খালি খুন! যেন এক একটা "কশাইখানা!" কেবল ভয়ানকরস, কেবল বীভৎসরস; শান্তরসের একটু গন্ধও নাই। এরূপ খাঁটি রস পান করিতে করিতে চিত্ত তার রজোগুণে তমোগুণে নিষিক্ত হয়; তার পর তাহাতে দুষ্প্রবৃত্তির অঙ্কুরোদ্গম হইতে থাকে। অতএব সেগুলির অধ্যয়নফল অতিগর্হিত। দ্বিতীয়তঃ, ধর্ম্মের জয়, অধর্ম্মের ক্ষয় সকল কাব্যেই থাকা উচিত। রামায়ণ মহাভারতে তাহাই আছে। শেকস্পিয়ারের ট্র্যাজিডিতেও তাহা নাই, এমন নহে। কিন্তু রামায়ণমহাভারতে ধর্ম্মই জাজ্বল্যমান, অধর্ম্ম নিষ্প্রভ; শেকস্পিয়ারে যেন অধর্ম্মই ভাস্বর, ধর্ম্ম নিষ্প্রভ। এজন্যও ট্র্যাজিডিগুলি অপকৃষ্ট। এই উত্তরই পূর্ণ বাবুর রক্ষাকবচ। কবচটা একটু হাতে লইয়া দেখি।

পূর্ণ বাবুর প্রথম আক্ষেপটা মিথ্যা নহে। শেকস্পিয়ারের ট্র্যাজিডিতে এত রস আছে, কিন্তু শান্তরস নাই। শান্তরসের লক্ষণটা পূর্ণ বাবুর একবার স্মরণ করিতে হইবে। শান্তরস রসই কি না, সে বিচার এখানে তুলিব না। কিন্তু এইটুকু বলিয়া রাখিতে ইচ্ছা হয় যে, অলঙ্কার যাহাকে শান্তরস বলিতেছে, তাহা সেই "রসো বৈ সঃ" মাত্র। সে সামগ্রীটী কিছু দুষ্প্র; তার পিপাসা কাব্যে পরিতৃপ্ত হইবার আমি কোনও সম্ভাবনা দেখি না। আর শান্তরস না থাকিলেই কাব্য অস্পৃশ্য হয় না। ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ নাই বলিয়াই যেমন কর্ম্মকাণ্ড নিষ্ফল হয়না, শান্তরস নাই বলিয়াই তেমনই তদ্বিহিত কাব্যও নিষ্ফল হয় না। রামায়ণ শান্তরসাত্মক নহে। এমন যে মহাভারত, শান্তরসের দুই চারিটা মীড় গিটকারী তাহাতে থাকিতে পারে, কিন্তু শান্তরস তারও জান্ নহে। কুরুক্ষেত্র যার উপায়, হৃত রাজ্যের পুনরুদ্ধার যার ঔপয়িক, তার জান্ শান্তরস হইতে পারে না। যাহাকে পূর্ণ বাবু মহাভারতের "প্রধান আখ্যায়িকা" বা "প্রধান কাব্য-কল্পনা" * বলিয়াছেন, তাহাতে শান্তরস নাই, অথচ তাহাতেই নিখিল মহাভারত চরিতার্থ হইতেছে। বস্তুতঃ যে উপদেশ-যোগকে মম্মটভট্ট কাব্যের অন্যতম ফল বলিয়া ইঙ্গিত করিয়াছেন, তাহা অন্যান্য রসেরই অবতারণায় সিদ্ধ হয়। তবে তারা শান্তেরই দিকে ফিরিয়া চায়, তার আর সংশয় কি? সৎকাব্যের পরিশীলনে তাই আমরা অধর্ম্মের আস্ফালনে ভীত, ক্রুদ্ধ হইতে শিখি; অধর্ম্মের উচ্ছেদে উৎসাহিত হই। যাহা সুন্দর তাহাকে ভালবাসিয়া, যাহা কুৎসিত তাহাতে ঘৃণা করিতে শিখি। মাকবেথপ্রভৃতি ট্র্যাজিডির অধ্যয়নফলও তাই। মাকবেথের আসুর সংরম্ভে আমাদের ভয় হয়, ক্রোধ হয়; অজস্র নর-শোণিতপাতে আমাদের ঘৃণা হয়। মাকবেথের সর্ব্বনাশে আমরা উৎসাহিত হই। ভয় বা ঘৃণা রাজস বা তামস হইতে পারে, কিন্তু এ রজস্তমঃ সত্ত্বেরই অনুগামী। তবে

* কাব্যচিন্তা; ৫৪, ৫৫ পৃঃ।

এ ভয়ানকে, এ বীভৎসে পূর্ণবাবু এত বিভীষিকা দেখিলেন কেন? রামায়ণ মহাভারতেও ভয়ানকবীভৎসের অভাব নাই। মহাভারতের সভাপর্ব্বে যে বীভৎসের সৃষ্টি আছে, রমণীর শিরশ্ছেদ তার চেয়ে বেশী নয়। তেমন জঘন্য বীভৎসে ফরাসি নবেলও কলুষিত হইয়াছে কি না, আমার সংশয় হয়। তার পর, যাহা বলিতেছিলাম। মাকবেথপ্রভৃতি ট্রাজিডির ভয়ানক বা বীভৎসে কেন যে চিত্ত দূষিত হইবে, বুঝিতে পারি না। যে Addison এর উক্তি পূর্ণবাবু এত আহ্লাদে উদ্ধৃত করিয়াছেন, তিনিও তো শেকস্পিয়ারের নিন্দা করেন নাই। তবে ভয় খাইতে খাইতে ভয় যায়, ঘৃণা করিতে করিতে ঘৃণা দূর হয় বটে। কিন্তু পাপে ভয় বা পাপে ঘৃণার পুনঃপুনরনুশীলনেও সে ভয়, সে ঘৃণা ঘুচিয়া যায়—এমন খবর পূর্ণবাবু রাখেন কি না বলিতে পারি না, কিন্তু আমি রাখি না। তা যার ঘুচিয়াছে, তার ঔষধ শেকস্পিয়ারে নাই বটে। সেজন্য শেকস্পিয়ারকে ফাঁসি দিলে আমিও দুঃখিত হইব না।

তার পর, সেই কথা—বাল্মীকিব্যাসে ধর্ম্ম প্রোজ্জ্বল, শেকস্পিয়ারে অধর্ম্ম প্রোজ্জ্বল। কিন্তু আপত্তিটার জোর সাহিত্যচিন্তায় যেমন ছিল, কাব্যচিন্তায় আর তেমন দেখিতে পাই না। কাব্যচিন্তায় পূর্ণবাবু স্বীকার করিয়াছেন, রাবণ বা দুর্য্যোধনও নিষ্প্রভ নহে। না হইবারই তো কথা। পূর্ণিমা না হইলে গ্রহণ লাগিবে কেন? তাই "দশানন মহাকালের সহায়তা লাভ করিয়া একেবারে বিশ্ববিজয়ী রূপে সদর্পে সংসারধামে বিচরণ করিতেছে"। "দুর্য্যোধনও শত ভ্রাতৃগণে পরিবৃত হইয়া মহাবলদর্পে কুরুক্ষেত্রের রণে আসিয়াছে।" * তাই সে রাজঘাতী বন্ধুঘাতী শিশুঘাতী মাকবেথকে স্কটলণ্ডের সিংহাসনে অধিরূঢ় দেখিয়াছি। দেবপীড়নে ব্রহ্মপীড়নে যার আরম্ভ, সীতাহরণে তার পূর্ণিমা; নহিলে পাষাণ জলে ভাসিবে কেন? ইন্দুক বারণাবত, লাগায়েৎ উত্তরগোগৃহ—সব চাই; সব সাঙ্গ না হইলে কি লক্ষ্মীপতি রথের সারথি হয়? অতিথিরক্ত, বন্ধুরক্ত, শিশুরক্ত—এত রক্ত না মিশিলে অরণ্যানী সঞ্চারিণী হয়? চারি অঙ্কে মাকবেথের পূর্ণিমা; তবে পঞ্চমে গ্রহণ লাগিয়াছে। ঐ আসে! ঐ আসে!—পঞ্চমে আর অন্য শব্দ নাই। পঞ্চমে গ্রহণ লাগিয়াছে। ডন্‌কানের অযুত রক্তবীজ ইংরেজবাহিনী সাজিয়া ছিন্ধি ছিন্ধি রবে মাকবেথকে ঘিরিতেছে। ডাক্তার! এ জঞ্জাল দূর হয়, এমন জোলাব্ তোমার শাস্ত্রে নাই? মাকবেথের শক্তিব্যূহ ছিন্ন ভিন্ন হইতেছে। যে দৃপ্ত সামন্তমণ্ডল মাকবেথের করচুম্বন করিয়া অনন্ত সাহায্য শপথ করিয়াছিল, আজ তারা মাকবেথকে ছাড়িয়া যাইতেছে। "ডাক্তার, সামন্তেরা আমাকে ছাড়িয়া যাইতেছে!" শুধু কি তাই? রক্তপানে যে তোমার সহধর্ম্মিণী হইয়াছিল, কই—মাকবেথ। রক্তদানে আজ সে তোমার সহধর্ম্মিণী হইল কই? গলফাঁস কষিয়া আসিতেছে। সহস্রাব্দীর পার হইতে নরঘাতীর শুষ্ক নিঃশ্বাস শুনিতেছি—

They have tied me to a stake;
I cannot fly.

শুনিতেছি, আজও তাই শেকস্পিয়ারকে বিদায় দিই নাই। মাকবেথে ধর্ম্মপক্ষ নাম দিয়া একটা পক্ষ খাড়া

* কাব্যচিন্তা; ১৩—১৫, ১৬ পৃঃ।

করা হয় নাই বটে; নারায়ণও অবতীর্ণ হইয়া তার সাহায্য করেন নাই। তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না। রামায়ণেও "ধর্ম্মের দৈবসহায় নারায়ণ বিলুপ্ত ভাবে আছেন," পূর্ণবাবুই দেখাইয়া দিয়াছেন। তবে মাকবেথে ধর্ম্ম নিষ্প্রভ বল কেন? যে দেবতা পার্থসারথি হইয়া কুরুক্ষেত্রে কুরুবংশধ্বংস করিয়াছিলেন, তিনিই আজ মাকডফের খড়্গে থাকিয়া ডন্‌সিনেনে মাকবেথের মুণ্ডচ্ছেদ করিতেছেন। যে ডাকিনীরা মাকবেথকে ভুলাইল, তারাই আর এক দিন দুর্য্যোধনকেও ভুলাইয়াছিল। মাকবেথে আর মহাভারতে, আমি তো কোনও প্রভেদ দেখি না।

আমার যাহা বলিবার ছিল, তাহা বলা হইল। আমি কাব্যচিন্তার প্রয়োজনেরই সমালোচনা করিয়াছি, তদ্‌গ্রথিত বস্তুর সমালোচনা করি নাই। প্রয়োজন সমালোচনা করিয়া আমি ইহাই পাইয়াছি যে, নিতান্ত বিষে বিষক্ষয় না মানিলে পূর্ণবাবুর দ্রব্যগুণে একটু সংশয় থাকিয়া যায়। কেন না, শেকস্পিয়রের দল উৎখাত করিয়া বাল্মীকিব্যাসকে তার স্থানে বসাইলেই যে বঙ্গসমাজে কাব্যদ্বারা অসুরসৃষ্টির সম্ভাবনা তিরোহিত হইবে, এমত কোনও গারাণ্টী পূর্ণবাবুর কাছে পাই নাই। কাব্যচিন্তার বস্তুপরীক্ষা আমার উদ্দেশ্য নহে।

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র গুহ।
এম্‌-এ।

ধর্ম্ম ও বিজ্ঞান। *

বিধাতার মঙ্গল ইচ্ছায় আবার এক বৎসর অতীত করিয়া ব্রাহ্মসমাজ নব বর্ষের প্রারম্ভে আসিয়া উপস্থিত হইল। মাঘোৎসব ব্রাহ্মের অতি শুভদিন; পরাধীন ভারতবর্ষেরও সৌভাগ্যের দিন। যে দিন ভারতবর্ষে মহাত্মা রামমোহন রায় ব্রাহ্মকে নববেশে পুনরায় সংস্থাপিত করিয়াছিলেন, সেই দিন নরনারী সকলের প্রিয় দিন হওয়া উচিত। এই শুভদিন উপলক্ষে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে ধর্ম্ম বিষয়ে মৌখিক বক্তৃতা করিবার পদ্ধতি চলিয়া আসিতেছে। এবার কার্য্য-নির্ব্বাহক সভা কয়েকটী লিখিত রচনা পাঠের ব্যবস্থা করিয়াছেন। তাহার মধ্যে একটী বিষয়ের ভার আমার ন্যায় অনুপযুক্ত ব্যক্তির হস্তে অর্পিত হইয়াছে।

কোন জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ পাঠে আপনাদের জ্ঞান-পিপাসা ও ধর্ম্ম-পিপাসা কিয়ৎ পরিমাণে চরিতার্থ করিতে পারিলে আমার পরিশ্রমকে সার্থক মনে করিতাম। কিন্তু অন্ধের চিত্রপট দর্শন বাসনা মনে উদয় হইয়া মনেই বিলীন হইয়া যায়, আমারও এই প্রথম উদ্যমে সিদ্ধিলাভের কোন সম্ভাবনা দেখিতেছি না। তবে কেবল কঠোর কর্ত্তব্যের অনুরোধে এইরূপ গুরুতর বিষয়ে হস্তার্পণ করিতে কুণ্ঠিত হই নাই।

আমার নিজের এমন কোন বিদ্যা বুদ্ধি নাই যে, আপনাদিগকে সন্তুষ্ট করিতে পারি; অন্য জ্ঞানী ও চিন্তাশীল ব্যক্তিদের পুস্তক হইতে যৎকিঞ্চিৎ সারসংগ্রহ করিয়া আপনাদের চিন্তার উদ্রেক করিয়া দিবার জন্য উপস্থিত হইলাম। অপরের কথা লইয়া যদি আপনাদের মূল্যবান সময় বৃথা নষ্ট করি, তাহা হইলে আশা করি, বিষয়ের গুরুত্ব ভাবিয়া আপনাদের ঔদার্য্য গুণে আমাকে ক্ষমা করিবেন।

ধর্ম্ম ও বিজ্ঞান অদ্যকার আলোচ্য

* এই প্রবন্ধটী ২ মাঘ, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ-মন্দিরে পঠিত হইয়াছিল।

বিষয়। বিষয়টী যে অতিশয় গুরুতর, সে বষয়ে বোধ হয় কাহারও সন্দেহ নাই। ইহা অতি প্রাচীন কাল হইতে সভ্য, অসভ্য সকল সমাজেরই চিন্তার বিষয় হইয়া আসিতেছে। বিষয়টী পুরাতন হইলেও ইহা এখনও শৈশব অবস্থায় আছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, ইহার গতি অনন্ত উন্নতির দিকে। ইহা আমাদের জীবনের ও মরণের সহিত এইরূপ জড়িত যে, বার বার ইহার আলোচনা করিলেও ইহার আদর আমাদের নিকট হইতে কখন হ্রাস হইবে না। আর অধিক বাক্য ব্যয় না করিয়া অদ্যকার বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাউক।

ধর্ম্ম কি, বিজ্ঞান কাহাকে বলে, ইহাদের মধ্যে কোন সম্বন্ধ আছে কিনা, তাহারই অনুসন্ধানে এখন প্রবৃত্ত হই।

ধর্ম্ম কাহাকে বলে, ইহার উত্তর দেওয়া বিশেষ কষ্টসাধ্য। "নানা মুনির নানা মত"। এই বাক্যটী যদি কোন বিষয়ে ব্যবহার হইয়া থাকে, তাহার এই ধর্ম্ম অর্থ লইয়াই এবং যুগে যুগে ধর্ম্মের মত, বিশ্বাস, যাগ যজ্ঞ ক্রিয়াকলাপ লইয়া মনুষ্য মধ্যে পার্থক্য চলিয়া আসিতেছে বলিয়াই নানা মুনির নানা মত, এই প্রবাদ বাক্যের উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়।

ধর্ম্ম শব্দ ও ইংরাজি Religion শব্দের যৌগিক অর্থ প্রায় একই রূপ। Re and ligare অর্থাৎ বন্ধন। সিসিরো বলেন, উহা Re and legere হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। উহার অর্থ পুনরাহরণ বা সংগ্রহ। ধর্ম্মশব্দ ধৃ+মন হইতে উৎপন্ন হইয়াছে (ধ্রিয়তে লোকো অনেন ধরতি লোকং বা) Martineau তাঁহার Study of Religion এ ধর্ম্মের এইরূপ ব্যাখ্যা দিয়াছেন—"ধর্ম্ম বলিতে আমরা এই বুঝি যে, এক জীবন্ত জাগ্রত ঈশ্বরে বিশ্বাস করা ও তাঁহার পূজা করা। তিনি পরমাত্মা ও ইচ্ছাময়, তিনি জগত শাসন করিতেছেন, এবং তিনি মনুষ্যের সহিত নৈতিক সম্বন্ধে সম্বদ্ধ রহিয়াছেন"—

Understanding by religion. Belief and worship in an Everliving God that is a divine mind and will, ruling the universe and holding moral relation with mankind.

উপনিষদ বলিতেছেন—

যশ্চায়মস্মিন্নাকাশে তেজোময়োঽমৃতময় পুরুষ সর্ব্বানুভূঃ।

যশ্চায়মস্মিন আত্মনি তেজোময়োঽমৃতময় পুরুষ সর্ব্বানুভূঃ।

তমেব বিদিত্বাতি মৃত্যুমেতিনান্য পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।

অর্থ—এই যে তেজময় অমৃতময় সর্ব্বান্তর্যামী পুরুষ আকাশে বিদ্যমান রহিয়াছেন, এই যে তেজময় অমৃতময় পুরুষ আত্মার মধ্যে বিদ্যমান রহিয়াছেন, ইঁহাকে জানিয়া এবং ইঁহাকে প্রাপ্ত হইয়াই জীব মৃত্যুকে অতিক্রম করিতে পারে। যাইবার অন্য পথ নাই।

Martineau বলিতেছেন, জীবন্ত ঈশ্বর, উপনিষদ বলিতেছেন অমৃতময় পুরুষ। Martineau বলিতেছেন, তিনি আমাদের সহিত নৈতিক সম্বন্ধে সম্বদ্ধ; উপনিষদ বলিতেছেন—তিনি আত্মার মধ্যে বিদ্যমান রহিয়াছেন। Martineau বলিতেছেন, ইঁহার প্রতি বিশ্বাস ও ইঁহার উপাসনাই ধর্ম্ম। উপনিষদ বলিতেছেন, যে ইঁহাকে জানিয়া ও ইঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া জীব মৃত্যুকে অতিক্রম করিতে পারে। যাইবার অন্য পথ নাই, ইহা ভিন্ন ধর্ম্মেরও অন্য পথ নাই।

যদিও আমরা ধর্ম্ম সম্বন্ধে ইউরোপীয়

আরম্ভ হইল. অধিকাংশ স্থলেই তাহার অপর নাম "কাণা ফকির ভিক মাঙ্গেরে বাবা"। যে উপায়েই হউক, কিছু উপার্জ্জন করিতে হইবে বলিয়া, সাধারণ লোকের রুচির অনুসরণ করিয়া সম্পাদকগণ যাহা খুসী লিখিতে লাগিলেন। সুশিক্ষিত বা সুবিবেচক লোকের অসন্তুষ্টিতে ক্ষতি বৃদ্ধি কি? তাঁহারা সংখ্যায় ক জন? যাহাদিগের নিকট হইতে তিল সংগ্রহ করিয়া সম্পদের তাল গড়া যায়, তাহারা সন্তুষ্ট হইলেই হইল। ইহাতে সরলতা ও স্বাধীনতা চলিয়া যায়, এবং সাহিত্যের নামে অপাঠ্য পদার্থেরই সৃষ্টি হয়। পেটের দায়ে রচিত সাহিত্য, পাঠকের কৃপার ভিখারী বলিয়া, পেটেণ্ট ঔষধ বিক্রয়ের বিজ্ঞাপনের ভাষায় সনাতন ধর্ম্মমাহাত্ম্য ব্যাখ্যাত হইতেছে; এবং যাত্রাওয়ালার বিরহ যাতনার ভাষায় "হায়রে সেকাল" বিষয়ে রচনা-বাহুল্য দৃষ্ট হইতেছে। দেবী সরস্বতীকে সপত্নীর দাসী করিবার প্রয়াস করাতে, কোথাও কোথাও লক্ষ্মী ঠাকুরাণী প্রসন্না হইতেছেন দেখিতেছি; কিন্তু অভিমানিনী ভারতী দূরে পলায়ন করিতেছেন।

অর্থের প্রত্যাশায় সাহিত্য রচিত হইলে তাহা প্রায়শঃ অপাঠ্য হয়; কিন্তু তাই বলিয়া যাঁহারা সাহিত্যের সেবা করিবেন, তাঁহারা বিনামূল্যে সাহিত্য বিতরণ করিতে বসিবেন, এ কথা বলি না। বরং সাহিত্যের কিছু অধিক মূল্য নির্দ্দিষ্ট হওয়াই উচিত বলিয়া মনে হয়। সস্তা সাহিত্যের গৌরবে আমার আস্থা নাই। শূকরে মুক্তা চিনিবে, এ কথায় বিশ্বাস হয় না। সাহিত্য সস্তা করিয়া কুশিক্ষিতের হস্তে দিলে কোন পক্ষই লাভবান হইবেন না। যাঁহারা গরিব শিক্ষার জন্য উদ্যোগী, তাঁহারা লাইব্রেরী করিয়া, সে উদ্দেশ্য সাধন করিতে পারেন। যাঁহারা অর্থব্যয় করিয়া, পুরস্কার গ্রন্থের দ্বারা দাম তুলিয়া না লইয়া, কোন গ্রন্থ বা পত্রিকা ক্রয় করেন, তাঁহারা ক্রীত সাহিত্যে অনুরাগী বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। ইহাতে গ্রন্থাদিরও গৌরব পরীক্ষিত হয়, ক্রীত সাহিত্যও পঠিত হয় বলিয়া আশা করা যায়।

আমি জানি যে, অনেক কৃতী লেখক অর্দ্ধমূল্যে বা সিকি মূল্যে পূজার হাটে গ্রন্থ বিক্রয় করিয়া যশ হারাইতেছেন। যদি প্রকৃত পক্ষে সাহিত্য সুরচিত হইয়া থাকে, তবে এক দিন না এক দিন তাহার আদর হইবেই। যদি তাহা না হয়, তবে সে সাহিত্য বিলুপ্ত হইলেই বা ক্ষতি কি? সাধারণ শ্রেণীর লোকের নিকট ক্ষণস্থায়ী যশের জন্য লোলুপ না হইয়া বরং শ্রীকণ্ঠ ভবভূতির পাদানুধ্যান করিয়া এক একবার তাঁহার কথা আবৃত্তি করা ভাল—

যে নাম কেচিদিহনঃ প্রথয়ন্ত্যবজ্ঞাং
জানন্তি তে কিমপি তান্ প্রতিনৈষ যত্নঃ।
উৎপৎস্যতেঽস্তি মম কোঽপি সমান ধর্ম্মা
কালোহ্যয়ং নিরবধি র্বিপুলা চ পৃথ্বী॥
— মালতী মাধব ১ম অঙ্ক, ৮

সঙ্গীতে কুশিক্ষিতা হইয়াও যে উপায়ে "জোলার" 'নানা,' দর্শকগণের চিত্তরঞ্জনে সক্ষমা হইয়াছিলেন, বিদ্যাশূন্য হইয়াও যে কৌশলে শঙ্করকবি বা বল্লনকবি রাজসভায় প্রতিপত্তি লাভ করিতেন; সেই উপায় এবং কৌশল প্রভাবে যদি এ কালের রঙ্গমঞ্চ এবং সাহিত্য খ্যাতিলাভ করে, তবে তাহা দেখিয়া কৃতী লেখকগণ বিচলিত হইবেন কেন?

কেবল মাত্র কুপরিচালিত বলিয়াই সাপ্তাহিকের বাহুল্য, সাহিত্যের পক্ষে অনিষ্টকর তাহা নহে; অন্যান্য কারণে উপযোগী হইলেও, সাপ্তাহিক জিনিসটা

প্রায়ই অনেক পরিমাণে সাহিত্যের শত্রু হইয়া দাঁড়ায়। বিলাতের রাজ্যশাসন পদ্ধতি যে প্রকারে প্রতিষ্ঠিত, তাহাতে সর্ব্বসাধারণের মধ্যে পলিটিক্স্ নামক একটা জিনিস আছে। প্রধানতঃ সেই পদার্থ লইয়াই দেশের সংবাদ পত্র। আমরা পরাধীন জাতি, কাজেই আমাদের পলিটিক্স্ নাই বলিলেই চলে। অথচ ইহারই আধিক্য লইয়া আমরা সংবাদ পত্র পড়ি। পলিটিক্সের অতিরিক্ত কোলাহলে বিলাতের সাহিত্যও ম্লান হইতেছে। ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যের স্বার্থময় কর্ম্ম প্রভাবে ইউরোপের ব্রাহ্মণ্যও হীনপ্রভ হইতেছে। একালে রবার্টস্ প্রমুখ ক্ষত্রিয়দল, স্পেন্সারাদি ব্রাহ্মণগণ অপেক্ষা সমাজে অধিক পূজ্য। দেখিতে দেখিতে গত ৩০।৪০ বৎসরের মধ্যে ইংলণ্ডের অবস্থা এমন দাঁড়াইয়াছে যে, শিক্ষাপ্রদ স্থায়ী সাহিত্য আর বিকশিত হইতেছে না। কাব্যকুঞ্জে পিকধ্বনি নীরব হইয়াছে, এখন কিপ্‌লিং এর দর্দ্দুর রবে বিশ্ব মুগ্ধ। আমাদের দেশের দুর্গতির ত সীমা পরিসীমা নাই। ভূদেববাবুর চিন্তাপূর্ণ প্রবন্ধে অলঙ্কৃত হইয়াও এডুকেশন গেজেট লোকের চিত্তাকর্ষণ করিতে পারে নাই; অথচ সেই সময়ে, কত অসার পত্রিকার সম্পাদক কুবেরের ভাণ্ডার হস্তগত করিয়াছেন। কেবল অনুকরণ গৌরবে, যাহা নাই, সেই পলিটিক্স্ লইয়া আন্দোলন করিয়া, শূন্যধ্যানরত সাহিত্য, নির্ব্বাণ মুক্তি লাভ করিতেছে।

বিলাতের সর্ব্বশ্রেণীর লোকের পক্ষে যেমন পলিটিক্স্, আমাদের দেশের পক্ষে সেই প্রকার সামাজিক অবস্থার আন্দোলন। যদি মিথ্যা পলিটিক্স্ পরিহার করিয়া সামাজিক কথার বিচারে সাপ্তাহিকগুলি মনযোগী হয়েন, তাহা হইলে এতটা দুর্গতি না হইতে পারে। কিন্তু দেশের মধ্যে সুপরিচালিত মাসিক পত্রাদি না থাকিলে, কেবল দৈনিক এবং সাপ্তাহিক সাহিত্যে একটা বিষম অনিষ্ট সাধিত হয়। এমন পাণ্ডিত্য বা চিন্তাশীলতা কোন মনুষ্যেই সম্ভবপর নহে, যে প্রতিদিন বা প্রতি সপ্তাহে তাঁহার অবিরত উদ্গীরিত বিজ্ঞতা, সারবত্তা প্রকাশ করিতে পারে। এই সপ্তাহ-সুলভ বিজ্ঞতার বাণী, অবিশ্রান্ত পাঠ করিলে, চিন্তাহীনতা এবং অগভীরতা ব্যাপ্তিলাভ করিবেই করিবে। সাপ্তাহিকের প্রচার বাহুল্যের সঙ্গে সঙ্গে মাসিক পত্রও, অনেক প্রচলিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু অল্পসংখ্যক সুলেখক দ্বারা এত বিস্তৃত সাহিত্য শাসিত হইতে পারে না। এই জন্যই কবির আক্ষেপ পড়িয়া মর্ম্মবেদনা হয় যে, এ দেশে আর বঙ্কিমের মত নেতা আসিল না এবং উপরন্তু "হায় কি হল দেশটা গেল সাপ্তাহিকে জুড়ে।"

এখনও এই কোলাহলের মধ্যে যে সকল কৃতী লেখক তপস্যানিরত, আশা করি, সম্পদলিপ্সারূপিণী উর্ব্বসী তাঁহাদের তপস্যা ভঙ্গ করিতে পারিবে না।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

সমস্যাকল্পলতা।*

৫৫ বৎসর হইল, কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের প্রেমচন্দ্রতর্কবাগীশ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ছাত্রেরা সমস্যাপূরণচ্ছলে কতকগুলি সংস্কৃত-শ্লোক রচনা করিয়াছিলেন। সমস্যাকল্পলতা

* সমস্যাকল্পলতা। ৺ প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ প্রভৃতি কর্ত্তৃক বিরচিত। শ্রীজ্ঞানচন্দ্র চৌধুরী এম-এ কর্ত্তৃক প্রকাশিত। কলিকাতা, জয়ন্তী প্রেস, সন ১৩০৭ সাল।

০উক্তঞ্চ সাহিত্যদর্পণে, ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদে:
"কোষঃ শ্লোকসমূহস্তু স্যাদন্যোন্যানপেক্ষকঃ।
ব্রজ্যাক্রমেণ রচিতঃ স এবাতিমনোরমঃ॥"

ব্রজ্যাক্রমেণ একঃ প্রকরণস্থয়োর্দ্বয়োর্দ্বিতীয় ইতি দ্বিবিধঃ কোষঃ। তত্রাদ্যস্য আর্য্যাসপ্তশত্যাদয় উদাহরণম্। দ্বিতীয়স্য সুভাষিতাবলী প্রভৃতয়ঃ।

সেই শ্লোকগুলির সংগ্রহ। এরূপ গ্রন্থকেও কাব্য বলিতে বাধা নাই। আলঙ্কারিকেরা বলিবেন, কোষকাব্য।°

যে কাব্যই বলুন, সমস্যাকল্পলতার অনেক কুসুমই মনোহর নহে। অনেকগুলিই কৃত্রিম। অনেকগুলিই মান্ধাতার আমলে সুগন্ধি লাগিয়া থাকিবে, কিন্তু এখন বড় পর্য্যুষিত—অতএব একটু পূতিগন্ধি। যেমন প্রেমচন্দ্রের—

শশাঙ্কঃ সাশঙ্কং নিশি চরতি বক্ত্রেন্দুবিজিতঃ
সরোজানাং রাজির্ভজতি জলদুর্গাশ্রয়মিদম্। পৃঃ ৫২, শ্লোক ৮২।

অথবা যদুনাথের—

নাসৌ চন্দ্রঃ কীর্ত্তিরাভাতি শুভ্রা
কোষাগারো নৈব তে কল্পশাখী। পৃঃ ৩৬, শ্লোক ১৮।

কয়েকটা খাস্ গৌড়ীরীতির শিমুলফুল—খুব মোটা মোটা, খুব নির্গন্ধ, খুব সখ্‌ত। যথা প্রেমচন্দ্রের—

সুত্রামোদ্দামধামোর্জ্জিতজয়জযশশ্চন্দ্রসান্দ্রাবদাতপ্রদ্যোতদ্যোতমানত্রিভুবনজনিতোদগীর্ণগাম্ভীর্য্যবীর্য্যঃ। পৃঃ ৭২, শ্লোক ৫৪।

দুই একটার দুই গুণই আছে—যেমন পচা, তেমনই কাঁটা। যেমন শ্রীশচন্দ্রের—

সম্রাড্যদ্ভূরিভূমিধরবরবিজয়োপার্জ্জিতৌজোবিড়ৌজানিস্তেজোবৈরিনারীবদনবিধুকলাম্লানিমধ্যাহ্নসূর্য্যঃ। পৃঃ ৭৩, শ্লোক ৫৪।

সংস্কৃত কাব্যের চিত্রশালায় বিজিতবৈরিনারীর রঙ্গ বরঙ্গ চিত্র আছে। কিন্তু সকল চিত্রে হূণনারীর সে কপোলপাটলিমা বা যবনীমুখপদ্মের সে মধুমদ কই?

গৌড়ীরীতিমাত্রেরই নিন্দা করিতেছি না। কথাগুলা পুরাণ হইলেও, নিবিড় রচনার গুণে নিম্নোদ্ধৃত অর্দ্ধশ্লোকে একটা উদাত্ত ভাবের অপূর্ব্ব আরোহ ও অবরোহ হইতেছে—

রাজন্ রাজন্য রাজাবলিবলিতশিরঃশেখরন্যস্তপাদো
যাবদ্যাত্রাপ্রয়াণপ্রবিদলিতমহাদীনদারিদ্র্যদৈত্যঃ। পৃঃ ৭২, শ্লোক ৫২।

বাঁচিয়া থাকিলে প্রেমচন্দ্র এ শ্লোকে আজ জয়পুরপতিকে আশীর্ব্বাদ করিতে পারিতেন।

সজাতীয়ানামেকত্র সন্নিবেশো ব্রজ্যা।

সমস্যাকল্পলতায় সুরভি কুসুমেরও অভাব নাই। গৌড়ীরীতি দেখিয়াছি। লাটীরীতির একটা নমুনা দিই। রচনা গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্নের—

ন তত্র দিবসদ্বয়াধিকমেব নেয়ং প্রিয়ে
ময়েতি শপথেন মাং প্রতি নিবেদ্য যাতো হরিঃ।
প্রবৃত্তিরপি লভ্যতে সখি ন তস্য মাসেন কিং। পৃঃ ১৮, শ্লোক ১০৪।

*   *   *

উক্তি বিরহোৎকণ্ঠিতার। মধুরে এমন প্রসন্ন রচনা সংস্কৃতকাব্যে কিছু বিরল।

দুই একটী শ্লোক পুরাণ হইলেও পুরাণেও একটু নূতন। যেমন প্রেমচন্দ্রের—

ধ্রুবমেষ্যতি সৌরভোৎসবে
কথমাবিষ্কুরুষে মনোব্যথাম্। পৃঃ ১০১, শ্লোক ২০১

নারীকে যে "সৌরভোৎসবা" বলিয়া ভাবিয়াছিল, সে কবি বটে।

যেমন শ্রীশচন্দ্রের—

কোকিলালিকুলকাকলীরুতৈরাকুলীকৃতহৃদঙ্গবন্ধনা।
মঞ্জুবঞ্জুলনিকুঞ্জমঞ্জসা
কামিনী ব্রজতি যামিনীমুখে। পৃঃ ২৭, শ্লোক ১৪৬।

কামিনী—অভিসারিকা। "আকুলীকৃতহৃদঙ্গবন্ধনা"—কথাটীর অর্থধ্বনি বড় মোহকর।

দুই একটা শ্লোকে ভারবির আওয়াজ শুনিতেছি বলিয়া ভ্রম হয়—রঘুনাথ কালী প্রসন্নের—

জলধির্ন চ বাড়বানলং
নহি সত্যাদ্বিচলন্তি সাধবঃ। পৃঃ ১৫, শ্লোক ৮০।

প্রেমচন্দ্রের একটা উচ্ছ্বাস একটু Byronic—

কলরসি কঠিনে তথাপ্যভীরুং
হরি হরি মে হরিণাক্ষি দূষণানি। পৃঃ ৬৮, শ্লোক ৩০।

একটা অপদার্থ শ্লোকে একটী চরণ একটা কুৎসিত স্তূপে কুশলকারুৎকীর্ণ একখণ্ড bass relief এর মত ফুটিয়াছে। রচনা রামকৃষ্ণের—

যৎ পদ্মা .....

শ্যামাঙ্গং বনমালিনং বৃতবতী তীরে সুধাবারিধেঃ।
পৃঃ ১১, শ্লোক ৫২।

রিলীফে রঙ্গ হয় না, কাব্যে একটু রঙ্গও ফলিয়াছে। দূরদূরগামিনী স্মৃতি বাকীটুকু পূরাইতেছে।

প্রেমচন্দ্রের একটা শ্লোকে রঙ্গের বড় চটক—

পিশঙ্গবসনোজ্জ্বলঃ সজলনীরদশ্যামলঃ।
পৃঃ ৮৮, শ্লোক ১১।

তার পরে আর রঙ্গ নাই, কিন্তু যাহা আছে তাহা অত রঙ্গেও ফলে নাই—

স্ফুরৎকুটিলকুন্তলাকুলিতমুগ্ধভালস্থলঃ।
ঐ ঐ ঐ।

শ্রীশচন্দ্রের একটা শ্লোকে চক্ষের জলের রঙ্গ আছে। রঙ্গ মৃদু, কিন্তু খাঁটি—

তবাদ্য কুচমণ্ডলে মরকতাচ্ছহারশ্রিয়ং
দধাতি সখি! পঙ্ক্তিগলিতকজ্জলাশ্রুজ্জলা!
পৃঃ ৮৮, শ্লোক ২০।

ফোঁটা ফোঁটা ফটিক জলে কজ্জলের নীলিমা লাগিয়াছে!

বিনা রঙ্গেও চিত্র হয়, একবার দেখিয়াছি। আর একবার দেখাই— রচনা ছিলাম্বং—

আকর্ণ্য গৌতমবধূমনুজত্বলাভং
ভীতেন নাবিকজনেন নিবারিতোঽসৌ।
সৌমিত্রিমাহ মুদিতো রঘুবংশচন্দ্রো
ভ্রাতঃ পদং কুথয় কুত্র নিবেশয়ামি॥ পৃঃ ৩২, শ্লোক ৪।

রাম, লক্ষ্মণ, ঐ নাবিক—সব যেন প্রত্যক্ষ দেখিতেছি। নাবিকটার চিত্রে একটু প্রহসনও আছে।

প্রেমচন্দ্রের তুলি আরও সরু—

মুখিতললিতহাসং রোষমেতং জহীহি। পৃঃ ৮৫, শ্লোক ৫।

কয়েকটী শ্লোকখণ্ড যোড়াইলে পশ্চিম সন্ধ্যার এক মোহনী ছবি জাগিয়া উঠে—

মন্দং মন্দং বহতি পবনো হন্ত সায়ন্তনোঽহং
কোকাঃ শোকাকুলিতহৃদয়াঃ কিঞ্চ মুঞ্চন্তি জায়াঃ।
পৃঃ ২৪, শ্লোক ১৩৪।

রচনা [redacted] দুর্বাসা প্রভৃতি—
মন্দং মন্দং গলিতকিরণো ভানুমানস্তমেতি।
পৃঃ ২৫, শ্লোক ১০৮

রচনা [redacted] প্রেমচন্দ্রের *—
বালা জালবিলাবলম্বিতমুখী মার্ত্তণ্ডমালোকতে।
পৃঃ ৩৭, শ্লোক ২৪

পশ্চিমাকাশ রাঙ্গা করিয়া সূর্য্য অস্ত গিয়াছে। পূর্ব্বাকাশে চন্দ্রোদয় হইতেছে। প্রেমচন্দ্র দুই দিগ্বধূর খেলা দেখিতেছেন—

সায়ন্তনোদ্ধকরপাটলিতাং প্রজ্বাল-
পিষ্টাতমুষ্টিমনকুৎ কুতুকাৎ কিরন্তীম্।
রত্নাম্বরোজ্জ্বলরুচীমভিতঃ প্রতীচীং
প্রাচীবধূঃ ক্ষিপতি কন্দুকমিন্দুবিম্বম্॥
পৃঃ ৮২, শ্লোক ৮৭)

উষায় চন্দ্র অস্ত যাইতেছে! প্রেমচন্দ্র সাগরে সূর্য্যোদয় দেখিতেছেন—

অকোৎসঙ্গিতরক্তশঙ্কিতমনসাস্তাচলপ্রান্তরা-
রণ্যানীং নিবিড়াং ভয়াদিব রয়াদিন্দৌ সমুৎসর্পতি।
সাটোপং হরিণা সমুত্থিতবতা বারাংনিধেঃ কন্দরাৎ
সংক্ষোভাদিব পূর্ব্বপর্ব্বততটীমাক্রম্য বিক্রম্যতে॥
পৃঃ ২১, শ্লোক ১৫৭।

শ্লোকটী পড়িতে পড়িতে যেন একটা গ্রীক মূর্ত্তি চক্ষের উপর ভাসিয়া উঠে। দিক্‌কালশৃঙ্খলাচ্ছেদী এ বলিষ্ঠ কল্পনা যবনশিল্পীরই যোগ্য বটে।

একটী মালিনীশ্লোকে ফুলগন্ধের গোলমাল হইতেছে। রচনা প্রেমচন্দ্রের—

দরবিদলিতযূথীবীথিসঙ্কারলব্ধৈ-
র্দিশি দিশি মধুগন্ধৈরন্ধয়ন্ পার্থসার্থান্।
পৃঃ ৮৪, শ্লোক ৯৪।

খোশবুটুকু ধরিতে পারি না, কিন্তু গুলজারটার টের পাইতেছি। পার্থশব্দে ময়ূর।

গোধূলিতে বালক কৃষ্ণ গোষ্ঠ হইতে ফিরিতেছে। প্রেমচন্দ্র যশোদাকে ডাকিতেছেন—

ক্ষণং গৃহবিধানতো বিরম নন্দসীমন্তিনি।

বনং বনমনুভ্রমন্নমুপদং গবাং তে শিশুঃ
সমেতি যদতিস্ফুটং রণতি নূপুরং গোপুরে॥
পৃ: ৮৮, শ্লোক ১৭।

শ্লোকে কৃষ্ণের নূপুরধ্বনি শুনিতেছি।

শুনিতেছি বলিয়াই উহা উৎকৃষ্ট কাব্য। বহিঃপ্রকৃতির প্রতিবিম্ব এ কাব্যে কিরূপ জাগিয়াছে, দেখাইলাম। অন্তঃপ্রকৃতির একটা দৃষ্টান্ত দিই। কুরুসভায় কৃষ্ণার অবমাননা দেখিয়া ভীমসেন ভাবিতেছেন—

বেণী [redacted] রী সমবারাখ্যনে —

অক্ষুন্দং ভোঃ কিমিতোঽস্তি লোকে
যদ্ ভীমসেনস্য মনোগ্রশক্তেঃ।
পুরোঽন্ধপুত্রেণ বিমানিতেয়ং
মধ্যেসভং রোদিতি যাজ্ঞসেনী। পৃ: ৫৯, শ্লোক ১০৮।

বজ্রলেপে রুদ্ধমুখ বহ্নিগিরি আপনারে আপনি খাইতেছে! কাব্যে তার ঝাঁজ লাগিয়াছে।

এক স্থানে বড়মানুষ বাঁদর দেখিয়া ব্রাহ্মণ হাসিতেছেন— বেণী [redacted] রী সমূকাক্ত—

নিঃস্বঃ শাস্ত্রবিশারদোঽপি ধনিভির্মূর্খোঽয়মিত্যুচ্যতে
কিং কার্য্যং পরিশিষ্টমস্তি ভবতো জানামি
নাহং কলে।
পৃ: ৫৬, শ্লোক ৯৮।

হাসি না হায়হায়, বলিতে পারি না।

পাঠকের ধৈর্য্যচ্যুতি হইয়া থাকিবে। একটী মঙ্গলশ্লোক উদ্ধৃত করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি। শ্লোকটী রামায়ণের বিখ্যাত অনুবাদক এবং আদিব্রাহ্মসমাজের অন্যতম আচার্য্য শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বিদ্যারত্নের। ভাবের ইঙ্গিতটা তিনি গুরু নানকের প্রসিদ্ধ ধ্রুপদ হইতে পাইয়া থাকিবেন। কিন্তু তারও বীজ বেদে—

তৈত্তিরীয়োপনিষৎ ২।৮

ভীষাঽস্মাদ্বাতঃ পবতে। সর্ব্বেঽস্মৈ দেবাবলিমাহরন্তি। মধ্যে বামনমাসীনং বিশ্বে দেবাউপাসতে।

কঠোপনিষৎ ২।৫।৩

কালিদাসও মেঘকে উজ্জয়িনীর সন্ধ্যায় অপেক্ষা করিতে বলিয়াছিলেন,

কুর্ব্বন্ সন্ধ্যাবলিপটহতাং শূলিনঃ শ্লাঘনীয়াম্।
মেঘদূত, পূর্ব্বমেঘ, ৩৫।

হেমচন্দ্রের শ্লোক এই—

স্বৈরং শৈলবনাবলীং বিঘটয়ন্ সংক্ষোভয়ন্
সাগরং
প্রধ্মাতৈর্গিরিকন্দরান্মুখরয়ন্ ব্রহ্মাণ্ডমুদ্বোধয়ন্।
বায়ো ত্বং শুভশঙ্খচামরভবাং প্রীতিং বিধেহি
প্রভোঃ
সন্ধ্যামঙ্গলদীপকোঽয়মুদগাদ্ব্যোম্নি স্ফুরত্তারকে॥
শ্লোকপত্র।

বিশ্বে বিশ্বেশ্বরের সন্ধ্যারতি হইতেছে।

ঠেকিয়া আমাকে এ গ্রন্থের এইরূপ অসম্বদ্ধ সমালোচনা করিতে হইয়াছে। একত্রিশ জনের রচিত পাঁচশতের অধিক বিশিষ্ট শ্লোকরাশির অন্য সমালোচনা সম্ভবে না। তবে সংস্কৃতকাব্যের সমালোচনা অলঙ্কারশাস্ত্রোক্ত রীতিতে করিলাম না কেন, তার কৈফিয়ৎ এ কালে লাগিবে না। নকলে আসল নষ্ট হইবে ভাবিয়া আমি উদ্ধৃত শ্লোক ও শ্লোকাংশগুলির অনুবাদ দিই নাই।

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র গুহ। এম্‌-এ।

মলিনা?

বিমনা বিবসা এক বিধুরা ললনা,
বসে আছে বাতায়নে হ'য়ে আনমনা,
কভু আকাশের পানে,
চাহিতেছে দুনয়ানে,
আবার সমত আঁখি
মাটীর পানেতে রাখি
নখরে কি লিখি যেন করিছে গণনা,
আত্ম কির্ণ-অদৃষ্টের রহস্য মন্ত্রণা।
আলু থালু কেশ পাশ নীবির বাঁধন,
দলিত নলিনী সম মলিন বদন;
সজল নয়ন দুটী,
ম্লান ভাবে আছে ফুটি,

নাহিক জ্যোতির কণ,
মধুভরা দিঠি ঘন,
ক্লান্তি ভরে সদানত যুগল রতন,
আলু থালু কেশ পাশ নাহির বাঁধন।

প্রীতি ভরা কলেবর—আশা নিকেতন,
এবে রুদ্র নিরাশার হয়েছে ভবন;
চিবুক-কুহরে আর,
বহে না লাবণ্য ধার,
বাঁধুলি জড়িত ওঠে
হাসি ফুল নাহি ফোটে,
কপোলের পদ্মরাগ হ'য়েছে বিলীন,
অশ্রুসিক্ত মুখ খানি নিষ্প্রভ মলিন।

প্রদোষের স্বর্ণাঞ্চল দোলাইয়া ধীরে,
বাসন্তী সমীর এলো কোথা হ'তে ফিরে;
আইল কুসুম গন্ধ,
পিকের পঞ্চম ছন্দ,
ঝঙ্কারী সঞ্চারী বধূ,
ধাইল খুঁজিতে মধু,
কিশোরী চাহিয়া দেখে সম্মুখে তাহার,
প্রীতি, প্রেম, আনন্দের পূর্ণ অবতার।

দৃপ্ত যৌবনের কোন অজানিত স্রোত,
করিল মলিনা চিত্ত তূর্ণ ওতঃপ্রোত—
নয়ন দীপতি মালা,
করিল বদন আলা,
ললিত লাবণ্য কলা,
অখণ্ড অমৃত গলা
সুপ্তাধরে শুভ্র হাসি, দিল দরশন,
দেহ মাঝে রূপোচ্ছ্বাস জাগা'ল মদন।

সম্মুখে দাঁড়াল পান্থ নির্ব্বাক নীরব,
দিঠি হ'তে বাহিরিল মন্দার সৌরভ
বাসনার গ্রন্থি গুলি,
ছায়া স্পর্শে গেল খুলি,
আঁখির আদর জলে,
প্রখালিয়া কুতুহলে,
সোণার লতায় ধীরে করিল বেষ্টন,
সুখ, যেন স্পর্শ মূর্ত্তি করিল ধারণ।

ভাষায় নাহিক স্বর নাহিক নিক্কণ,
প্রেমের অমৃত সরে ভাষা নিমগন,
প্রীতির পরশে চিত,
তরলিত, তরঙ্গিত,
স্বপ্ন যেন জেগে উঠে,
দাঁড়াইয়া করপুটে,
মণি মন্ত্রে মায়া পুরী করিল সৃজন,
বিরহ শ্মশানে, আজ মধুর মিলন।

স্বপনে বাজিল বাঁশী; স্তব্ধ রজনীর,
শেষ পান্থ হ'তে মৃদু মলয় সমীর,
মধুর কুসুম স্নেহ—
পরাগে, রঞ্জিয়া দেহ,
স্পর্শাতুরা বল্লরীরে,
দোলাইয়া অতি ধীরে,
করিছে সরসস্পর্শে, অশ্রান্ত নবীন,
মলিনা, সুরভি ভরা প্রভাত নলিন।

শ্রীবেণোয়ারীলাল গোস্বামী।

প্রতিবাদ।

গত পৌষ মাসের "নব্যভারতে", শ্রীযুক্ত মধুসূদন সরকার মহাশয় "বর্ণ সাম্য ও ধর্ম্ম সাম্য" শীর্ষক যে একটী প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, উহার মধ্যে "বর্ণ সাম্য" আংশিক প্রবন্ধ পাঠ করিয়া, বিস্মিত ও ব্যথিত হইয়াছি। হিন্দুর দেশে জন্মগ্রহণ করিয়া, হিন্দু সমাজের ভিতর অবস্থান করিয়া, এক জন হিন্দু নামধারী শিক্ষিত ব্যক্তি যে এমন অভূতপূর্ব্ব,

ক্ষিতীন্দ্রনাথের নূতন গ্রন্থ।

এখন একবার ফিরিয়া চাহিতে হয়। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে যাহা ছিল, এখন আর তাহা নাই। এখন আর বঙ্গদেশে স্ত্রীশিক্ষার অভাব নাই। অপ্রাচুর্য্য থাকিতে পারে, কিন্তু অভাব নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্গনারী ডবল অনার, ডবল এম্ এ পাইয়াছেন। ইংরেজী সাহিত্যের আর কথা কি? বঙ্গনারী গণিতে অনার, দর্শনে এম্-এ পাইয়াছেন। উদ্ভিদ্বিদ্যায় এম্-এ, চিকিৎসা বিদ্যায় এম্-বি পাইয়াছেন। যে বিদ্যা এক ইংরেজীতে সঙ্কীর্ণা ছিল, সে এখন বিচিত্রবাগ্বিনারিণী হইয়াছে। বঙ্গনারী লাটিনে, ফরাসিতে অনার পাইয়াছেন। আজ এ দেশে হাজারে একজনেও যার খবর রাখে না, বঙ্গনারী সেই ইরাণের কাব্যকানন লুণ্ঠন করিয়া "পারস্থ-পুলক" পাইয়াছেন। আনন্দের উপর আনন্দ এই, বঙ্গনারী সংস্কৃতে বিদুষী হইয়াছেন। শুধু কি বিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্য? দারুণ চীৎকারে যিনি কলাবতী ছিলেন, আজ তিনি মৃদঙ্গযোগে বিশুদ্ধ ধ্রুপদ গাইতে শিখিয়াছেন। বিলাতী সঙ্গীতে বাঙ্গালী নারী বিলাতে বাহবা পাইয়াছেন। সে কাল আর নাই। যে বীটন কলেজ একদিন কলিকাতার দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া একটী ছাত্রী জুটাইতে পারে নাই, অকর্ম্মণ্য বলিয়া আজ তারে বঙ্গনারী জবাব দিতেছেন। পঞ্চাশ বৎসর পরে এখন একবার ফিরিয়া চাহিতে হয়।

স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজন কি? এ কালে এ প্রশ্ন শুনিলে শিক্ষিতেরা অনেকেই হাসিবেন। যাঁহারা হাসিবেন না, তাঁহারা সংক্ষেপে বলিবেন—শিক্ষার প্রয়োজন পুরুষেও যা, স্ত্রীতেও তাই। পরম প্রয়োজন একই বটে, কিন্তু অবান্তর প্রয়োজনে কি কোনও প্রভেদ নাই?

সাম্যবাদী বলেন, না—প্রভেদ নাই। তিন পুরুষের উদারনীতি মাথায় করিয়াও ক্ষিতীন্দ্রনাথ বলেন, প্রভেদ আছে। স্ত্রী পুরুষে নিয়তির প্রভেদ আছে বলিয়াই, প্রভেদ আছে। "প্রজনার্থং স্ত্রিয়ঃ সৃষ্টাঃ সন্তানার্থং চ মানবাঃ"—মনুর স্মৃতি ক্ষিতীন্দ্রনাথও ভুলেন নাই। এ একটা মোটা কথা সত্য, কিন্তু কথাটায় আর একটা কথার ইঙ্গিত আছে।

প্রজনার্থং স্ত্রিয়ঃ-সৃষ্টাঃ—তাহাতে এমত বুঝায় না যে, নারী একপ্রকার breeding animal মাত্র। এমনও বুঝায় না যে, প্রজা প্রসব করিলেই নারীজন্মের পরমার্থ সিদ্ধ হয়। তা হইলে আর মনু এত করিয়া স্ত্রীধর্ম্ম না বুঝাইলেও পারিতেন। যার কথা—"যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ" সে চোঁয়াড় ছিল না। মনু নারীকে তির্য্যক্‌স্ত্রীর সমান করেন নাই। তির্য্যক স্ত্রী কেবল প্রসূতিই হয়, নারী প্রসূতি হইয়া মাতা হয়েন। তির্য্যক্‌স্ত্রীর অপত্য স্নেহ নাই, এরূপ বলিতেছি না; কিন্তু এ মাতৃত্ব নাই। যে জাতীয় অপত্য স্নেহ পশুপক্ষীতে দেখিতে পাই, মাতৃত্বের তাহা এক কলা

* আর্য্যরমণীর শিক্ষা ও স্বাধীনতা। শ্রীক্ষিতীন্দ্র নাথ ঠাকুর বি, এ, তত্ত্বনিধি প্রণীত। কলিকাতা, এলগিন্ প্রেস। মূল্য ১৲ টাকা। সন ১৩০৭।

মাত্র। পশুপক্ষীতে তা আবার মাসে বৎসরেই মুছিয়া যায়, মায়ের সে এক কলাও অবিনাশিনী। শুধু তাই নয়। মাতৃশক্তি ভাবঘনা হইয়াও বুদ্ধ্যুজ্জ্বলা. ত্রিকালনয়না, শিবাশিববিবেকিনী, শিবৈক-প্রবণা, ছিন্নমস্তা, অক্ষয়া-হৃদয়ধারা, অপত্যে আরম্ভ হইলেও অখিলালিঙ্গিনী। পরিবার বন্ধনে মধ্যগ্রন্থি হইয়া মাতৃশক্তি সমাজ ধারণ করিতেছে। সকল স্বরূপ বুঝাইয়া বলিতে পারিনা, কিন্তু পশু পক্ষীতে এ সকল নাই। পুরুষেও নাই। মাতৃত্ব নারীরই নিজস্ব। নারীপ্রকৃতি তারই উদ্দেশে প্রস্ফুটিত হয়। পদ্ম যেমন শতদলে আপনার বীজকেশ ঢাকিয়া রাখে, নারী হৃদয়ের শত সুগন্ধি ভাবেও তেমনই ঐ মাতৃভাবই আচ্ছন্ন থাকে। ফল পাকিলে ফুলের, মাতৃত্বের বিকাশে নারীর নিয়তি পূর্ণ হয়। প্রজাপ্রসূতি হইবে বলিয়াই নারীর হৃদয়ে মাতৃত্বের বীজ উপ্ত হইয়াছিল, এ অনুমান অসঙ্গত নয় বটে। কিন্তু অঙ্কুরণে সে বীজে সর্ব্বথা প্রজাপ্রসবের অপেক্ষা করে না। হয়ত ইহা অভিব্যক্তিধারার ফল। সন্তান হইলে মাতৃভাব গাঢ়ত্ব লাভ করিতে পারে, কিন্তু সন্তানহীনায়ও তার অভাব নাই। কত যে নিঃসন্তান নারী মায়েরই মত পরের সন্তানকে মানুষ করিয়া থাকেন, তার কি সংখ্যা আছে? নারীর নিয়তিই সেই। সপ্রজা হউক, অপ্রজা হউক, নারীকে মাতা হইতে হইবে।

স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজন কি, এখন বুঝিতে পারি। নারীকে এই মাতৃধর্ম্মের অধিকারিণী হইতে হইবে। শিক্ষা ছাড়া সম্যগধিকার হয় না, অতএব নারীকে শিক্ষিতা করিতে হইবে। শিক্ষার অর্থই তো উচ্চশিক্ষা। জ্ঞান, ভাব, কর্ম্ম—দেখিয়াছি, মাতৃত্বে তিনই বিদ্যমান। উচ্চশিক্ষায় সে তিনকে উজ্জ্বল কর। বিশেষতঃ নারীর কর্ম্মবুদ্ধি বলিষ্ঠা কর, যেন জ্ঞান ভাবের উৎকট মোহে তার স্বধর্ম্ম পীড়িত না হয়। গার্হস্থ্যই মানুষের প্রথম কর্ম্মভূমি। গার্হপত্যায় জাগৃহি—নারীকে সে বৈবাহিকী শ্রুতি স্মরণ করাইয়া দেও। মৃত মহাত্মা হেমেন্দ্র নাথ ঠাকুর দেখাইয়া গিয়াছেন, রমণীর এ উচ্চশিক্ষা স্কুল কলেজ ছাড়াও হইতে পারে—পতিগৃহে বিবাহের পরেও হইতে পারে। হিন্দুসমাজ সে দিকে একটু নজর দিলে পারিতেন, কেননা, তাহাতে সনাতন ধর্ম্মও খাড়া থাকে। সর্ব্বোপরি যে বিদ্যা সর্ব্ববিদ্যাপ্রতিষ্ঠা, মানুষ বলিয়াই যাহাতে তার প্রয়োজন আছে, নারীকে সেই অধ্যাত্ম বিদ্যায় অভিষিক্তা কর। ইহাকেই শিক্ষার পরম প্রয়োজন বলিয়াছিলাম। কিন্তু অবান্তর প্রয়োজনটা ভুলিও না। নারী যে নারী, তাহা ভুলিও না। অনন্ত বিদ্যায় নারী বিভূষা হউক, কিন্তু বিদ্যা যেন মাতৃত্বকে ছাড়িয়া যায় না। লক্ষণালক্ষণ দেখিয়া ক্ষিতীন্দ্রনাথ বুঝিয়াছেন, "নব্য-সম্প্রদায়ের পরিচালিত শিক্ষা ব্যবস্থা মাতৃত্ব অতিক্রম করিয়া গুরুতর অমঙ্গল আনয়ন করিতে পারে।" অভিযোগটার তদারক হওয়া ভাল।

আর একটা কথা বলিতে বাকী আছে। অনপত্যা নারীও মাতৃধর্ম্মে ভূষিতা হইতে পারে, অনূঢ়া কি পারে না? না বলিতে পারি না। কুমারী ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলের নাম আজিও সমস্ত মাতৃমণ্ডল উদ্ভাসিত করিয়া আছে। মাতৃত্ব যদি নারীর স্বভাবসিদ্ধই হয়, তবে অনূঢ়ায়ই বা তার বিকাশ

হইতে বাধা কি? এক বাধা আছে। পরিণীতার সে বাধা নাই, অথবা সে বাধা যে সর্ব্বত্রই অবশ্যম্ভাবিনী, ঘুণাক্ষরেও এমত বলিতেছি না। কিন্তু তবু সে বাধাটা আছে। ব্রহ্মচর্য্য, তার উপর আবার চিরব্রহ্মচর্য্য—সে এক অসিধারাব্রত। পদে পদে তাহাতে মানুষ স্খলিতপদ হয়। সেরূপ বাধা পাইলে মাতৃত্বের ভ্রংশ ঘটে। মাতৃমূর্ত্তি ধর্ম্মের মূর্ত্তি। ব্যভিচারিণীর মাতৃত্ব নাই।

এই বাধা লক্ষ্য করিয়াও নরনারীর বিবাহবিধি প্রণীত হইয়াছিল। যে স্বাভাবিক প্রবৃত্তিবশে নরনারী পরস্পর আকৃষ্ট হয়, বিবাহ সে প্রবৃত্তিকে একানিষ্ঠা করিয়া ধর্ম্মোন্মুখী করে। অথচ সে প্রবৃত্তির যাহা জাগতিক প্রয়োজন বলিয়া অনুমান হয়, সেই সৃষ্টি-প্রবাহ-রক্ষাও ইহাতে চরিতার্থ হইতে পারে। তাই বিবাহ ধর্ম্মের সহায়। যে বাধার ইঙ্গিত করিয়াছি,তা দূরে রাখিতে হইলে এ সাহায্যের আবশ্যকতা আছে। তাই নারীর বিবাহই প্রশস্ত। ইহাতে প্রত্যবায়ের ভয় নাই, প্রত্যুত ধর্ম্মের উপকার আছে। প্রাকারতুল্য হইয়া বিবাহবন্ধন নারীর চরিত্র রক্ষা করিয়া থাকে।

রক্ষা করে বটে, কিন্তু তাহা সর্ব্বত্র অজেয় নহে। যে বাধা অনূঢ়ার পথে, পরিণীতার পথেও সে বাধা আছে। কিন্তু সকলে তাহা দেখে না, অথবা দেখিতে চাহে না। মনুস্মৃতিতে একটা অর্থবাদ আছে, মাতা পুত্রেরও নির্জ্জনে একত্র থাকিতে নাই। মনে আছে, এই নব্যভারতেরই এক প্রসিদ্ধ লেখক তাহাতে বড় ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন। ফলে, এ সম্বন্ধে দুই প্রকৃতির লোক দেখিতে পাই। অনেকে বেশ সাহসী,তাঁহারা "বিকার হেতৌ সতি" বলিয়া কুমারসম্ভব কোট্ করেন। অথবা তাঁহারা স্বতঃশুদ্ধচিত্ত—কিরূপে যে মানুষে পাপস্পর্শ হইতে পারে, বুঝেন না, বুঝাইতে চাহিলে কাণে আঙ্গুল দেন। অথবা তাঁহারা বিবেচনা করেন যে, পাপ-সম্ভাবনা অত খুঁচিয়া খুঁচিয়া দেখাইতে নাই, পাছে তাহাতে অচিন্তিত-পূর্ব্ব পাপেরও চিন্তা আসে। যেন, কথায় কথায় হোশ্‌ইয়ার করিতে করিতে সাধুরও বা একটু চুরি করিতে ইচ্ছা হয়। অথবা তাঁহারা ভণ্ড—ইহাতে উহাতে পাপ সম্ভাবনা আছে বুঝিয়াও, ইহাতে উহাতে পাপ সম্ভাবনা নাই বলা আবশ্যক বোধ করেন। কেন না, সেরূপ পাপ সম্ভাবনা স্বীকার করিলে পাছে লোকে ভাবে, এ কেল্লাও বুঝি ফতে হয়। তাহাতে prestige থাকে না।

আর এক দল আছেন—তাঁহারা বড় ভীরু, বড় সজাগ, বড় সাবধান। দোষজ্ঞ, তাই বড় সাবধান। যত সাবধান হয়েন, কিছুতেই বেশী সাবধান হইলাম ভাবেন না। হিন্দুশাস্ত্রকারগুলি এই দলের। সকল শাস্ত্র ভরিয়াই উঠ, জাগো, এই যায়, ঐ যায়—এমনই একটা কোজাগর ধ্বনি শুনিতে পাই। ঐ অর্থবাদটায়ও সেই ধ্বনি। যে জাগ্রত, তারে স্পর্শ করে না; যে তন্দ্রিত, তার তন্দ্রা ভাঙ্গিয়া দেয়। ক্ষিতীন্দ্রনাথও এই ভীরুর দলে—মনুরই শিষ্য। মনু জানিতেন, বলবান্ ইন্দ্রিয়গ্রাম বিদ্বানকেও বিচলিত করে। স্বাতন্ত্র্যে এই অধঃপাতের কিছু সুবিধা হয়। কেন না, ভয়টুকু উড়িয়া যায়, আর যে লজ্জা মানুষের চিন্ময়ী তিরস্কারিণী, সে লজ্জাও পাতলা হয়। কিন্তু এখনও যেমন, তখনও তেমনই পুরুষই সমা-

জের নিয়ন্তা ছিল। নিয়ন্তার স্বাতন্ত্র্য রোধ চলে না। তাই মনু পুরুষের স্বাতন্ত্র্য রোধ করিতে পারেন নাই বটে, কিন্তু বিধি নিয়মের শত নিগড়ে বদ্ধ করিয়া তবে পুরুষকে সে স্বাতন্ত্র্য দিয়াছিলেন। নারী সম্বন্ধে সে কথা খাটে নাই, তাই নারীর স্বাতন্ত্র্য * নিষেধ করিয়াছিলেন। মাতৃত্বের পথে বহু বিঘ্ন দেখিয়া ক্ষিতীন্দ্রনাথও বুঝিয়াছেন, নারীর অবরোধ চাই।

এই কথাটা বুঝানই এ গ্রন্থের মুখ্য উদ্দেশ্য বলিয়া বোধ হয়। এখন কথাটা বুঝিতে পারি। পাপ সম্ভাবনা দূরে রাখাই ভাল। সব দূর করিতে পারি না বলিয়া যতটা পারি, ততটাও করিব না, এ বড় পণ্ডিতের কথা নহে। অবরোধেরও অর্থ, যতদূর পারি এই পাপ-সম্ভাবনার পরিহার। যথেচ্ছ বিচরণ বা যথেচ্ছ পুরুষ-সংসর্গ নারীর ধর্ম্ম-ভ্রংশসম্ভাবী। অবরোধে সে সম্ভাবনার লাঘব হয়, তাই নারীর অবরোধই প্রশস্ত। এ ব্যবস্থায় সাম্যবাদীরও ক্ষোভের কারণ নাই। কেন না, নারীর অবরোধে পুরুষেরও অবরোধ ঘটে। বিবাহ-বন্ধনকে নারী চরিত্রের প্রাকার বলিয়াছিলাম। অবরোধকে তার পরিখা বলিতে পারি।

অবরোধ প্রথার বিরুদ্ধে প্রধান আপত্তি এই যে, ইহা স্ত্রীপুরুষের বৈষম্যগ্রাহিণী হইয়া স্ত্রী জাতিকে তাহাদিগের ন্যায্য অধিকারে বঞ্চিত করে। বৈষম্য তো আছেই বটে। কিন্তু সে বৈষম্য পুরুষের মনগড়া নহে। সে বৈষম্য লোপ করা অধর্ম্ম। তবে তার ইয়ত্তা কি, দেখাইয়াছি। স্ত্রী পুরুষে তার অধিক বৈষম্য নাই। সেরূপ বৈষম্য স্থাপন করা অধর্ম্ম। জ্ঞান বিজ্ঞানে নর নারীর তুল্য অধিকার—কোনও তারতম্য নাই, তাও দেখাইয়াছি। তবে যে বিষয় যার স্বধর্ম্ম পালনে পরিপন্থী হয়, তাহাতে তার অধিকার আছে বলিতে পারি না। সাম্যবাদীর কথিত ন্যায্য অধিকার পার্লেমেণ্টে বা কৌন্সিলে বসিবার অধিকার, বা এমনই কোনও অধিকার হইবে। সে অধিকার নারীর আপন অধিকার হইতে মহীয়ান্ নয়। মাতৃত্ব প্রজার যত কাছে পৌঁছে, অতি মহতী রাজনীতিও তত কাছে যায় না। নাইটিঙ্গেলের মাতৃত্বে যাহা করিয়াছিল, দশটা আদর্শ war officeও তাহা পারিত না। অথচ এ রাজনৈতিক অধিকার বহুধা চিত্তবিক্ষেপ জন্মাইয়া, জন্মাইয়া, অন্তর্ম্মুখীকে বহির্ম্মুখী করিয়া, নারীকে নারীর নিয়তি হইতে ভ্রষ্ট করিতে পারে। নারীর কর্ম্মক্ষেত্রে একটা আগন্তুক বিশালতা দিয়া, তার স্বধর্ম্ম শোষণ করিতে পারে। একটা চির জলদ্ধিকটাহে পরিখণ্ডিত করিয়া মাতৃত্বের আত্ম রসটুকু বিশীর্ণ করিতে পারে। অধিকন্তু, যে কারণে অবরোধ আবশ্যক বলিয়াছি, সে কারণ এখানেও বিদ্যমান আছে। রাজনৈতিক অধিকার নারীর প্রেয় হইতে পারে, কিন্তু শ্রেয়ঃ নহে। তাহাতে এমন বলিতে পার না যে, সমাজ চিন্তামাত্রই নারীর পক্ষে নিষিদ্ধ হইতেছে; বা একেবারে হাতে-কলমে পলিটিক্স্ না হইলে আর সেরূপ চিন্তার ফলোপধায়িতা নাই। অবরোধে তার ব্যাঘাত হয় না। ক্ষিতীন্দ্রনাথ বুঝাইয়াছেন, পতি-পুত্রকে প্রবুদ্ধ করিয়া অবরোধেও নারী মহাসভার মন্ত্রণা শাসন করিতে পারেন।

তবে যে অবরোধ নারীকে রাক্ষসীর

* বোধ করি বলা বাহুল্য, স্বাতন্ত্র্যের অর্থ Free will নহে।

মত দেখে, আজিও যাহা হিন্দুসমাজের অর্দ্ধেক জুড়িয়া আছে, সে এক অনার্য্য অধর্ম্ম্য অবরোধ—হয়ত মুসলমানের কাছে ধার করিয়া লইয়াছিলাম। পার তো কেহ হিন্দুসমাজের এ কলঙ্কটা মুছিয়া ফেল। "স্ত্রিয়ঃ শ্রিয়শ্চ গেহেষু ন বিশেষোঽস্তি কশ্চন।"—স্ত্রী আর শ্রীতে প্রভেদ নাই—আবার সে দিব্যভাবের প্রতিষ্ঠা কর। অবরোধ পুরুষের জয়ধ্বজা নহে, সে কথটা ভুলিও না। অবরোধ নারীর একটা বহিঃসহায়মাত্র, তাও ভুলিও না। শুধু প্রাকারে, শুধু পরিখায়, দুর্গ দুর্গ হয় না। মনুও তা জানিতেন। জানিয়াই বলিয়াছিলেন, "ঘরে দরজা বন্ধ করিয়া রাখিলেই নারী রক্ষিতা হয় না; যে আপনারে আপনি রক্ষা করিতে পারে; সেই নারীই সুরক্ষিতা।" নারীকে সেই আত্মরক্ষার যোগ্যা কর।

আবার মনু, আমার অবরোধ! পুরা না হউক, কোমল হউক—অবরোধ তো বটে! গ্রন্থটা তাই বড় (Revolutionary)। গ্রন্থকারও কিছু সৃষ্টিছাড়া—কমলাকান্ত বলিত, "যুগভ্রষ্ট"। সকল সমাজে, বিশেষতঃ রাডিকাল্ সমাজে, এ গ্রন্থের ভূয়ঃ প্রচার হউক। অতীতে এমন ভক্তিমান্, অথচ বর্ত্তমানে এত চক্ষুষ্মান্—এমন অপূর্ব্ব গ্রন্থ বহুদিন পাঠ করি নাই।

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র গুহ।

কাশ্মীর-কেশরী কেশব।

যে সময়ে ইউরোপে মহাবলী পোপের অন্যায় আস্পর্দ্ধার প্রতিরোধী হইয়া মহামতি মার্টিন লুথার খ্রীষ্টীয় সমাজকে উত্তেজিত করিতেছিলেন, যে সময়ে স্পেন রাজ্যে তদ্দেশীয় অধার্ম্মিক রাজা এবং অত্যাচারী রাজকর্ম্মচারীদিগের প্রজা পীড়ন নিবারণ জন্য বীরবর ডিগুজা গেব্রিল প্রাচীন রাজনৈতিক বিধিমালার সংস্কার প্রার্থী হইয়া রাজবিদ্রোহের হোমাগ্নিতে অতি সাবধানে এবং ধীরে ধীরে উৎসাহ-বায়ু প্রয়োগ করিতেছিলেন, ঠিক সেই সময়ে বঙ্গ দেশে পূতসলিলা ভাগীরথীর তটে, নবদ্বীপ নগরে, কিশোর বয়স্ক শ্রীগৌরাঙ্গ দেব তাঁহার তরুণ শিষ্য সমূহের হৃদয়-ক্ষেত্রে ভবিষ্য ভক্তি-তরুর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীজ সমূহ অল্পে অল্পে রোপণ করিতে প্রবৃত্ত ছিলেন। ভাগীরথীর তটে বসিয়া যে মনোমোহিনী আশায় শ্রীগৌরাঙ্গ দেব শাস্ত্রজ্ঞান, হরিভক্তি, সদাচার প্রভৃতির আলোচনা করিতেছিলেন, ঠিক সেই আশায় এবং ঠিক সেই সময়ে ভারতের আর এক প্রান্তে—সুদূর কাশ্মীর রাজ্যে, ঝেলম নদ তটে—আর একজন মহাপুরুষ অতি গম্ভীর ভাবে ভারতের ভাবী অবস্থা চিন্তা করিতেছিলেন, সেই মহাপুরুষের নাম কেশব মিশ্র। এই কেশব মিশ্র কেবল শাস্ত্রজ্ঞানে মহাপুরুষ ছিলেন, কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গ হরিভক্তিতে মহাপুরুষ বলিয়া পূজ্য হইয়াছিলেন; কেবল ত্রৈগুণ্যিক জ্ঞানে কেশব মিশ্র পণ্ডিত ছিলেন, কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গ দেব কেবল ত্রৈগুণ্যিক জ্ঞানে নহে, ক্রিয়াজ সাধন জ্ঞানে এবং কৈবল্য ভক্তি তত্ত্বেও অপৌরুষেয় পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছিলেন। সে সময়ে পশ্চিম প্রদেশে কেশবের এবং পূর্ব্ব প্রদেশে শ্রীগৌরাঙ্গের নাম লক্ষ লক্ষ কণ্ঠে উচ্চারিত ও কীর্ত্তিত হইতেছিল। পরিণামে কেশব মিশ্র শাস্ত্রের

আচার্য্য এবং শ্রীচৈতন্য দেব ভক্তির আচার্য্য বলিয়া বিখ্যাত * হইয়া উঠিয়াছিলেন। কাশ্মীরে শ্রীনগর এবং বঙ্গে নবদ্বীপ, সে সময়ে শিক্ষার লীলা ভূমি বলিয়া সম্মানিত ছিল। জয়পুর, মিথিলা, পুনা, কাশী, মাদুরা, কম্বাকনম, কাঞ্চী, উজ্জয়িনী প্রভৃতি স্থানে তৎকালে পণ্ডিত এবং বিদ্যার্থীর সংখ্যা প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান থাকিলেও শ্রীনগর এবং নবদ্বীপ জ্ঞানোপার্জ্জনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আশ্রম বলিয়া সর্ব্বসাধারণ সমীপে সুপ্রসিদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময়ে কাশ্মীরের এবং নবদ্বীপের কিরূপ অবস্থা ছিল, তাহা একবার অনুসন্ধান করিয়া দেখা উচিত। এই প্রয়োজনীয় অনুসন্ধানে বাঙ্গালা দেশের অনেক প্রাচীন কথা আমরা জানিতে সমর্থ হইব, এরূপ ভরসা করা যায়। প্রথমে কাশ্মীরের কথা বলিবার ইচ্ছা করি।

কাশ্মীর শব্দ সংস্কৃত নহে, যাঁহারা সংস্কৃত বলিয়া বিশ্বাস করেন, তাঁহাদের বিশ্বাস অভ্রান্ত নহে। পারস্য "কশিদন্" ধাতু হইতে কশ্ শব্দের উৎপত্তি, কশিদন অর্থে আকর্ষণ, to draw, to attract বুঝায়; মীর অর্থে মহৎ the great; এই যৌগিক শব্দটীর প্রকৃত উচ্চারণ কশ্মীর—কাশ্মীর নহে। সমগ্র শব্দটীর অর্থ মহৎ আকর্ষণ the great attraction; এইরূপ নামকরণ হইবার কারণানুসন্ধান করিলে দেখা যায়, কাশ্মীরের নির্ম্মল জল, প্রাণশীতলকর বায়ু, বিহঙ্গ, বিমান-বিহারী বিবিধ বিহঙ্গ, নানা জাতীয় সুন্দর বন্য জন্তু, সুগন্ধিপূর্ণ তৃণ, মনোমোহন দুর্ব্বাদল, অরণ্য ও পর্ব্বতের অতুলনীয় শোভা, সহস্র সহস্র প্রকারের প্রসূন পুঞ্জ, নির্ঝরিণীর জল হিল্লোল, নরনারীর অপূর্ব্ব আকৃতি—বিশেষতঃ নারী জাতির দেবোপম রূপ, আহার্য্য দ্রব্যের প্রচুরতা ও সুলভতা, স্বাস্থ্যকর জলবায়ু এবং শিল্প ও সংগীত বিদ্যার ভূয়ো প্রচার দর্শন করতঃ মুসলমানেরা বিমুগ্ধ হইয়া এই স্থানের কশ্মীর (The great attraction) অর্থাৎ "মহা চিত্তাকর্ষণ" নাম দিয়াছিল। এই কাশ্মীর মুসলমান রাজ্যের এবং মুসলমান জাতিদিগের প্রধান প্রধান স্থান সমূহের সমীপবর্ত্তী বলিয়া আসিরিয়া, মেসোপটেমিয়া, জুডিয়া, আরব্য, পারস্য, তুরস্ক, কুর্দ্দিস্থান, আফ্গানিস্থান, বেলুচিস্থান প্রভৃতিস্থানের সওদাগরেরা এই স্থানে বাণিজ্য করিতে আসিত। নানা দেশ হইতে পণ্ডিত, বিদ্যার্থী, বণিক, ভ্রমণকারী, পীড়িত নরনারী প্রভৃতি এখানে যাতায়াত করায় কাশ্মীরের প্রধান নগর তখন অপূর্ব্ব সম্ভ্রম ও অপূর্ব্ব গৌরবে পরিপূর্ণ ছিল। হিন্দু ও মুসলমানে যতদূর সদ্ভাব হইতে পারে, কাশ্মীরে সেরূপ সদ্ভাব ছিল, এই জন্য মুসলমানের হাতে কাশ্মীর কখনই অপমানিত বা অত্যাচারিত হয় নাই; কাশ্মীরে মুসলমান কখনও বৈরীভাব দেখায় নাই; এইরূপ শান্তি ছিল বলিয়া হিন্দুরা কাশ্মীরের শ্রীনগরে বহু সংখ্যক বিদ্যামন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্যের প্রভূত পরিমাণে শিক্ষা দিতেন এবং আলোচনা করিতেন। বহু সংখ্যক পণ্ডিত, বহু সংখ্যক বিদ্যার্থী এবং বহু সংখ্যক টোল বর্ত্তমান ছিল বলিয়া সেকালে কাশ্মীর 'বিদ্যাময় দেশ' নামে খ্যাতি লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

এক্ষণে নবদ্বীপের অবস্থা সম্বন্ধে কিছু বলিতে ইচ্ছা করি। শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক নবদ্বীপ সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহি

থিয়সফিষ্টগণ যেরূপ সতেজে অদৃশ্য পরলোকের বৃত্তান্ত সমূহ প্রচার করিতেছেন; এবং মানবদেহের পঞ্চকোষ সম্বন্ধে সুন্দর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দ্বারা পৃথিবীকে মুগ্ধ করিয়াছেন, তাহাতে সহসা তাঁহাদের কথা উড়াইয়া দেওয়া যায় না। মৃত্যুর পরপারের অনেক প্রকার সংবাদ উপস্থিত করা হইল; এখন বিচারের ভার বিজ্ঞ পাঠকদিগের হস্তে।

শ্রীচন্দ্রশেখর সেন।

(১) ভাষাতত্ত্ব। *

বাঙ্গালাসরস্বতীর দশা ফিরিয়াছে। এবার বাঙ্গালায় ভাষাতত্ত্বের গ্রন্থও প্রকাশিত হইল। বাঙ্গালাভাষার ব্যুৎপত্তি ইহার পূর্ব্বেও দুই একখানা বাঙ্গালাগ্রন্থে প্রসঙ্গক্রমে এক আধটুকু আলোচিত হইয়াছে। কিন্তু সে প্রসঙ্গক্রমে মাত্র। রীতিমত গ্রন্থ এই প্রথম। এ গৌরব শ্রীনাথ বাবুরই বটে।

এক বস্তু ছাড়া আর সবই পরিণামশীল। ভাষাও তাই। ইউরোপে এক লাটিনভাষাই কালে চারি পাঁচটা বিভিন্ন ভাষায় পরিণত হইয়াছিল। ভারতবর্ষেও আদিম আর্য্যভাষা বিকৃত হইয়াই পালি মাহারাষ্ট্রী † শৌরসেনী প্রভৃতি কত প্রাকৃতভাষা জন্মিয়াছিল। বস্তুতঃ রোমান্স্‌ভাষা ও প্রাকৃতের আবির্ভাবে সাদৃশ্য আছে। দুয়েতেই মূলভাষার বর্ণধ্বনি বিকৃত হইয়াছে, অনেক বিভক্তির রূপান্তর বা লোপ ঘটিয়াছে, লিঙ্গ এবং বচনের কড়াকড় নিয়ম শিথিল হইয়াছে। দুয়েতেই মূলভাষার বহির্ভূত অনেক শব্দ প্রবেশ লাভ করিয়াছে। প্রাকৃতে যে সকল শব্দ এইরূপ অসংস্কৃতমূলক, তাহাদের নাম দেশী। প্রাকৃতের এই দেশী শব্দগুলি তখনকার প্রচলিত কোন না কোনও অনার্য্যভাষা হইতে গৃহীত হইয়া থাকিবে। অনার্য্য শব্দ ছাড়া কচিৎ অনার্য্য প্রত্যয়ও প্রাকৃতভাষায় ঢুকিয়াছে কি না, আমি নিশ্চিত বলিতে পারি না। অন্ততঃ অতিপ্রাচীন প্রাকৃতে ঢুকে নাই বলিয়াই বোধ হয়। সে যাহা হউক, সংস্কৃত আর প্রাকৃতে প্রভেদ এইরূপ। কিন্তু এ প্রভেদসত্ত্বেও ভাষার যাহা কঙ্কাল, তাহা দুয়েতেই এক আছে। তবে প্রাকৃতে সে কঙ্কালটা কোথাও কিঞ্চিৎ খণ্ডিত, কোথাও কিঞ্চিৎ গলিত, সর্ব্বত্র একটু

and the nights of death no more break the chain of memory than the nights break it which separate the days of our ordinary life. Occurrences of their past lives are as real experiences of their living selves as though they had happened a few years agone, and to tell them that they did not have these experiences is a view to them as foolish as if you persisted that the events they passed through ten years ago happened to somebody else, add not to their same selves. They would not debate the question with you, but would just shrug their shoulders and drop the subject, for you cannot argue a man's own experience out of his consciousness. Re-incarnation—Annie Besant.

আর এক স্থানে বেশাস্ত বলিয়াছেন, তাঁহার নিজের পূর্ব্ব কথা কতক কতক স্মরণ আছে।

I have met various persons of honour and probity, who remember some of their past lives, and I myself remember fragments of my own past.—Theosophy in Questions and answers.

এস্থলে স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, বেশান্তের ন্যায় সত্যনিষ্ঠ, তীক্ষ্ণবুদ্ধি সরল তথ্যানুসন্ধায়ী জীব সংসারে অতি বিরল; অতীব পাণ্ডিত্যের কথা থাকুক।

* ভাষাতত্ত্ব। প্রথম খণ্ড। শ্রীশ্রীনাথ সেন প্রণীত। ভারতমিহিরযন্ত্র, কলিকাতা। মূল্য ১ টাকা। ১৩০৮ সাল।

† সংস্কৃতনাটকের অধমোক্তিগুলি এই মাহারাষ্ট্রী প্রভৃতি প্রাকৃতে রচিত।

বিবর্ণ হইয়াছে মাত্র। চেহারা ফিরিয়াছে বটে, কিন্তু জিনিসটা তবু চেনা যায়। এই অর্থে এবং কেবল এই অর্থেই শ্রীনাথ বাবুর উক্তি সত্য যে, "প্রাকৃত ভিন্ন ভাষা নহে"।* নহিলে সংস্কৃত ও প্রাকৃত যে অত্যন্ত অভিন্ন নহে, তাহা বলাই বাহুল্য।

কিন্তু এ পরিণামের ইতিহাস এইখানেই সমাপ্ত হয় নাই। অথবা এ ইতিহাসের সমাপ্তি নাই। সকল ভাষাই লোকমুখে বিকৃত হইতে থাকে। পালি প্রভৃতি প্রাচীন প্রাকৃতও যুগে যুগে অধিকতর বিকৃত হইতেছিল। অশোকের শিলাশাসনাবলীর ভাষা এই ভ্রষ্ট প্রাকৃত। উত্তরকালে প্রাচীন প্রাকৃতভাষার বৈয়াকরণেরা এই সকল অর্ব্বাচীন অতিবিকৃত প্রাকৃতকে অপভ্রংশনামেই লাঞ্ছিত করিয়াছিলেন। প্রাকৃত-ব্যাকরণসঙ্কলনের পর হইতে সাহিত্যগত প্রাকৃতভাষার পরিণাম স্থগিত হইল বটে, কিন্তু অপভ্রংশগুলি ব্যাকরণের শাসন মানিল না—কোথাও মানেনা। সেগুলি কালস্রোতে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া চলিল। শব্দবিদ্যাবিশারদ মোক্ষমূলরের মত এই, ইহাদেরই অন্তিম বিকারে হিন্দী মরাঠী বাঙ্গালা প্রভৃতি আধুনিক ভাষাসমূহের আবির্ভাব হইয়াছিল। বঙ্কিম বাবু বাঙ্গালাকে সংস্কৃতের দুহিতা বলিতে ভাল বাসিতেন। কিন্তু দুহিতা কেন, বাঙ্গালা তার দৌহিত্রীও না। অসংখ্য অবিকৃত সংস্কৃতশব্দ আছে বলিয়াই বাঙ্গালাকে সরাসর সংস্কৃতের দুহিতা বলা যায় না। কিরূপে এই সকল খাঁটি সংস্কৃতশব্দ বঙ্গদেশের ভাষায় পুনঃপ্রবেশ লাভ করিয়াছিল, শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেনের প্রসিদ্ধ গ্রন্থে তার একটা অনুমান আছে।

বাঙ্গালাপ্রভৃতি আধুনিক ভাষার এই অপভ্রংশমূলকতাবাদ শ্রীনাথ বাবুকেও মানিতে হইবে। শ্রীনাথ বাবু বুঝাইয়াছেন যে, করিতেছে করিয়াছে প্রভৃতি বাঙ্গালা পদ কর্ত্তুমস্তি কৃত্বাহস্তি প্রভৃতি সংস্কৃতবাক্যেরই ধ্বনিবিকার মাত্র।* কিন্তু তিনিই স্বীকার করিয়াছেন, ঐ ঐ অর্থে সংস্কৃতে কর্ত্তুমস্তি কৃত্বাহস্তি এইরূপ প্রয়োগ হয় না। স্বীকার করিয়া বলিয়াছেন, করিতেছে করিয়াছে—এ সকল "রীতিব্যতিক্রম"। এমন রীতিব্যতিক্রম বাঙ্গালায় আরও অনেক আছে। কিন্তু এ ব্যতিক্রমই বা কোথা হইতে আসিল? এ বাঙ্গালা রীতি সংস্কৃতের প্রকৃতিবিরুদ্ধ। সংস্কৃতের যদি কেহ দুহিতা থাকে তো সে পালি, সে মাহারাষ্ট্রী, সে শৌরসেনী, সে মাগধী। এ রীতি সে সকলেরও প্রকৃতিবিরুদ্ধ। তবে ইহা কোথা হইতে আসিল? এইরূপে অগত্যা বাঙ্গালাভাষার অপভ্রংশমূলকতা স্বীকার করিতে হয়। সংস্কৃত হইতে সরাসর বাঙ্গালার আবির্ভাব হয় নাই। পালি মাহারাষ্ট্রী প্রভৃতি প্রাকৃত—মোক্ষমূলরের grammatical প্রাকৃত—তাহা হইতেও না। প্রাকৃত হইতে বাঙ্গালার সর্ব্বাঙ্গীণ ব্যুৎপত্তি বুঝান যায় না। বাঙ্গালাভাষার ব্যুৎপত্তি বুঝাইতে হইলে আর এক সিঁড়ী নীচে হইতে আরম্ভ করিতে হয়। সে সিঁড়ী ঐ অপভ্রংশ—মোক্ষমূলরের ungrammatical প্রাকৃত। †

* আমি প্রাকৃতশব্দে এ প্রবন্ধের সর্ব্বত্রই মাহারাষ্ট্রীপ্রভৃতি বুঝিয়াছি। শ্রীনাথ বাবু প্রাকৃত বলিলে বাঙ্গালাও বুঝেন। কিন্তু বাঙ্গালা বয়সে এ সকলেরই কনিষ্ঠা। সংস্কৃত হইতে বাঙ্গালার প্রভেদও গুরুতর।

* এ ব্যুৎপত্তি ঠিক কি না, পরে বিচার করিব।

† Max Muller's Science of Language Ed. 1891, Vol. I, p. 181.

অপভ্রংশেরও পরম্পরা চলিয়াছিল, বুঝা যায়। কিন্তু কোন্ অপভ্রংশ হইতে কখন বাঙ্গালার উৎপত্তি হইয়াছিল, সে সন্ধিক্ষণ ধরিবার উপায় নাই। অশোকের শিলাশাসন এবং অপর কয়েকটা শিলালিপি ছাড়া অপভ্রংশে আর কোনও রচনা বর্ত্তমান আছে বলিয়া আমি জানি না। কিন্তু সে অতিপ্রাচীন রচনা। তাহা হইতে বাঙ্গালার প্রভেদ অনেক। এইখানেই ইতিহাসের শৃঙ্খলা ছিন্ন হইতেছে। অবরোহিপ্রণালীতে বাঙ্গালার সকল খুঁটিনাটির ব্যুৎপত্তি বুঝান অসম্ভব। কিন্তু তাই বলিয়া বাঙ্গালাপ্রভৃতি আধুনিক ভাষার অপভ্রংশমূলকতাবাদ অশ্রদ্ধেয় নহে। প্রত্যক্ষে যাহা দেখি না, অনুমানে তাহা বুঝিতে পারি। অনুমানেই করিতেছে করিয়াছে প্রভৃতি বাঙ্গালা পদকে অপভ্রংশমূলক বলিয়া বুঝিতেছি। তবে এ অনুমান সম্ভবানুমান * বটে। কিন্তু সম্ভবানুমানও উৎকৃষ্ট প্রমাণ। ভাষাতত্ত্বে সে প্রমাণ অপরিহার্য্য।

এ সকল বিচারের আর একটা প্রণালী আছে। সে আরোহিপ্রণালী। ভাষাতত্ত্ববিজ্ঞানের ইহাই প্রকৃষ্ট প্রণালী। ভাষার প্রাচীন হইতে প্রাচীনতর অবস্থা ধরিতে ধরিতে মূলের অনেকটা কাছে যাওয়া যায়। কিন্তু বাঙ্গালায় সে পথও বেশী খোলা নয়। কেন না, বড় জোর হাজার বৎসরের অধিক বয়সের কোনও বাঙ্গালাগ্রন্থ আজপর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। তবু এ আরোহিপথে যতটুকু উঠিতে পারি, ততটুকুতেই লাভ আছে। একটা দৃষ্টান্ত দিই। বাঙ্গালার পঞ্চমীর বিভক্তি 'হইতে' কোথা হইতে আসিল? সংস্কৃতে পঞ্চমীবহুবচনের বিভক্তি —ভ্যস্। প্রাকৃতে ইহার স্থানে 'হিংতো' এবং 'সুংতো' হয়। আর্যপ্রাকৃত ও অর্দ্ধমাগধীতে পঞ্চমীর একবচনেও 'হিংতো' হয়। যেমন দেবাহিংতো (দেবাৎ), তুমাহিংতো (ত্বৎ)। প্রাকৃত ব্যাকরণকার হেমচন্দ্রের বর্ণিত অপভ্রংশে পঞ্চমীর বিভক্তি— 'হোংতও' এবং 'হোংতউ'। খ্রীঃ দ্বাদশ শতাব্দীতে রচিত চাঁদ বর্দ্দাইএর প্রসিদ্ধ মহাকাব্যে আছে—

> কেতীক দূর অজমের হুংত।

অপভ্রংশের 'হোংতও' এবং প্রাচীন হিন্দীর এই 'হুংত' যে প্রাকৃত 'হিংতো'রই ক্রমিক পরিণামমাত্র, তাহাতে আর সংশয় নাই। বীম্স্ এবং হর্ণলের মতে, বাঙ্গালার 'হইতে' বিভক্তিও এই হিংতো হইতেই আসিয়াছে। 'হিংতো'র বিকারে হিংতে—হংতে— এইরূপ ক্রমে অনুনাসিকলোপে 'হতে' বা 'হইতে' উৎপন্ন হওয়া অসম্ভব নয়। অনুনাসিকলোপের দৃষ্টান্ত হিন্দীতেও আছে। যেমন তুলসীদাসে—

> আদিহিতে সব কথা সুনাঈ।

এ ব্যুৎপত্তি বেশ মনে লাগে বটে, কিন্তু তবু যেন একটু খট্কা থাকিয়া যায়। যেটুকু ছিল, দীনেশ বাবু সেটুকু দূর করিয়াছেন। প্রাচীন বাঙ্গালাগ্রন্থ হইতে তিনি দেখাইয়াছেন, এই ব্যাখ্যাই ঠিক্ ব্যাখ্যা। আলোয়ালের পদ্মাবতীতে আছে—

> কারে কন্ন নির্ম্মলী কাহাকে বলি আর।
> হাড় হন্তে নির্ম্মিয়া করয়ে পুনি হাড়॥

প্রাচীন বাঙ্গালায় পঞ্চমীবিভক্তির আর একটা রূপ ছিল—'হনে'। যেমন সঞ্জয়ের মহাভারতের—

> তাকে দেখি মোহ পাইল না দেখিল পুনি
> সেই হনে প্রাণ মোর আছে বা না জানি।

এখন দেখিতেছি, প্রাচীন বাঙ্গালার হন্তে

* Probability.

বা হনে, অপভ্রংশের হোন্তও এবং প্রাকৃতের হিংতো একই শৃঙ্খলার তিন গ্রন্থি। 'হন্তে' হইতে 'হতে'র উৎপত্তি অনায়াসেই বুঝা যায়। এরূপ অনুনাসিকলোপের দৃষ্টান্ত হিন্দীতেও আছে, দেখিয়াছি। অতএব বাঙ্গালার 'হতে' বা 'হইতে'* বিভক্তি প্রাকৃতের 'হিংতো' বিভক্তি হইতে আসিয়াছে, এমত বলিলে জোলম্ করা হয় না।

কিন্তু প্রাকৃতের হিংতো কোথা হইতে আসিল? হর্ণলে বলেন, সম্ভবতঃ 'হওন্ত' অর্থাৎ'ভবন্ত' হইতে। শ্রীনাথ বাবু 'হিংতো' 'হুংতো'র ধার ধারেন নাই, একেবারে খাঁটি সংস্কৃত 'ভবতঃ' শব্দ হইতেই 'হইতে' বিভক্তির ব্যুৎপত্তি করিয়াছেন। বীম্‌সের মতেও 'হইতে' বিভক্তির মূল ভূধাতু।† পঞ্চমীর স্থানে ভূধাতুর রূপ কিরূপে বসিতে পারে, বীম্‌স্ ও হর্ণলে তাহা যেমন বুঝাইয়াছেন, শ্রীনাথ বাবুও প্রায় তেমনই বুঝাইয়াছেন। শ্রীনাথ বাবু বলেন, " "হইতে" শব্দের অর্থ উৎপন্ন হইয়া (Springing from) অর্থাৎ কার্য্যটী এক স্থানে উৎপন্ন হইয়া অন্য স্থানে সমাপ্ত হইল। .... গ্রাম হইতে বলিলে গ্রামে উৎপন্ন হইয়া বুঝায়।" কথাটা একেবারে উড়াইয়া দিই না। মৌখিক ভাষায় পঞ্চমীর একটা বিভক্তি—থেকে। যেমন, পটলডাঙ্গা থেকে কালীঘাট যাচ্ছে। থেকে=থাকিয়া =বোধ হয়, স্তকিত্বা *। পূর্ব্ববঙ্গের কোন কোনও স্থানে এই 'থেকে'র বদলে 'থিয়া' বলে। থিয়া=স্থিত্বা। পটলডাঙ্গা থেকে=পটলডাঙ্গায় থাকিয়া। অর্থাৎ পূর্ব্বে পটলডাঙ্গায় ছিল, পরে কালীঘাট যাইতেছে। এই প্রকারে ভূধাতুর রূপেও পঞ্চমীর অর্থ কথঞ্চিৎ প্রকাশিত হইতে পারে, অস্বীকার করি না। কিন্তু তসিল্ প্রত্যয়ান্ত খাঁটি সংস্কৃত 'ভবতঃ' শব্দ হইতেই বাঙ্গালা 'হইতে' বিভক্তি আসিয়াছে, শ্রীনাথ বাবু এমন হুবহু তত্ত্বটা কোথায় পাইলেন? 'গ্রামাৎ' বুঝাইতে যদি সংস্কৃতে 'গ্রামভবতঃ' এইরূপ পদের প্রয়োগ হইত, তবে বলিতে পারিতাম, পঞ্চমীর অর্থ বুঝাইতে ভূধাতুর প্রয়োগ সংস্কৃতেই হইয়া থাকে। তবে বলিতে পারিতাম বটে যে, বাঙ্গালা 'হইতে' বিভক্তি সংস্কৃত 'ভবতঃ' হইতেই আসিয়াছে। কিন্তু পঞ্চমীর অর্থ বুঝাইতে সংস্কৃত-ভাষায় ভূধাতুর প্রয়োগ হয় না। হইতে পারে না, নাই বা বলিলাম; কিন্তু, হয় না। তাহাই যথেষ্ট। এরূপ প্রয়োগ অসংস্কৃত। বাঙ্গালার 'হইতে' বিভক্তি সংস্কৃতভাষা-মূলক নহে। তবে প্রাকৃতের হিংতো বিভক্তিতে যদি সত্যই ভূধাতু প্রচ্ছন্ন থাকে, তা হইলে তাহা প্রাকৃতেই প্রথম প্রবিষ্ট হইয়াছিল—সংস্কৃতের পঞ্চমী হইতে আসে

* 'হইতে'র ইকারটা ভূধাতুনিষ্পন্ন 'হইতে' পদের দেখাদেখি ঢুকিয়া থাকিবে। কিন্তু সে ইকারটাও আন্দাজিক।

† বীম্‌স্ হিন্দী হইতে দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন—বনারস্ হোকে আয়া হুঁ। দৃষ্টান্তটা ভাল হয় নাই। সেরূপ আমরাও বলি, কাশী হ'য়ে এসেছি। কাশী হইয়া আসিয়াছি আর কাশী হইতে আসিয়াছি, এ দুয়েতে প্রভেদ আছে। বাঙ্গালার পঞ্চমী-বিভক্তি 'হইয়া' নহে, 'হইতে'। আর 'হ' দেখিলেই স্থানে অস্থানে ভূধাতুটাকে লইয়া টানাটানি করা উচিত হয় না। বীম্‌স্‌ই তাহা বলিয়া দিয়াছেন। Beames's Comparative Grammar of the Modern Aryan Languages of India, Vol. II (1875), p. 226.

* ষ্টক প্রতীঘাতে। স্থাদিঃ। হিন্দীতে থক্‌না ধাতুর অর্থও প্রতীঘাত।

নাই। কিন্তু হিংতো যে 'হন্তস্ত' হইতেই জন্মিয়াছে, কোনও প্রাকৃতরচনা হইতে তুলিলে তার বিভিন্নগমক দেখাইতে পারেন নাই।

বস্তুতঃ 'হিংতো'র ব্যুৎপত্তিসম্বন্ধে বিখ্যাত জর্ম্মান্ পণ্ডিত লাসেনের মতই সমীচীন বলিয়া বোধ হয়। সে মত এই। প্রাকৃতে তৃতীয়াবহুবচনের বিভক্তি—হিং। ইহারই উত্তর তসিল্ প্রত্যয়ের প্রাকৃতরূপ 'তো' যুক্ত হইয়া হিংতো বিভক্তি জন্মিয়াছিল। এ মতের অনুকূলে একটা কথা বলিতে পারি। প্রাকৃতভাষাগুলির মধ্যে পালিই সর্ব্বপ্রাচীন। সেই পালিতে তৃতীয়া ও পঞ্চমীর বহুবচনের রূপ এক। যথা, পুরিসেহি (পুরুষৈঃ বা পুরুষেভ্যঃ)। তৃতীয়া হইতে পঞ্চমীর ভেদ পরিস্ফুট করিবার জন্য কালে ঐ 'হি'র পরে পঞ্চমার্থবোধক একটা অতিরিক্ত 'তো' প্রযুক্ত হইয়া থাকিবে। লাসেনের মতই সমীচীন।

বাঙ্গালায় আর দুইটা কঠিন বিভক্তি আছে। এক প্রথমা, আর এক ষষ্ঠী। প্রথমার একবচনের ব্যুৎপত্তি তেমন দুরূহ নয়। তবে "সংস্কৃতে ও প্রাকৃতে প্রথমার একবচনে ... ... কোন প্রভেদ নাই"—শ্রীনাথ বাবুর এ উক্তিটী মিথ্যা। প্রাকৃতে প্রাকৃত বুঝিলেও মিথ্যা, শ্রীনাথ বাবুর মত বাঙ্গালা বুঝিলেও মিথ্যা। অনুস্বারবিসর্গের লোপ নাই ধরিলাম, তবু প্রভেদ আছে। প্রাকৃতে পুংলিঙ্গে প্রথমার একবচনে 'বৃত্তস্ত' না হইয়া 'বুত্তন্তো' হয়, 'রবি' না হইয়া রবী' হয়, 'বন্ধু' না হইয়া 'বন্ধূ' হয়। মৃচ্ছকটিকে শকারাদির এবং অভিজ্ঞানশকুন্তলের ষষ্ঠ অঙ্কের প্রবেশকে মৎস্যজীবী ও শিবিরের উক্তিতে যে প্রাকৃত দেখিতে পাই, তার নাম মাগধী। মাগধীতে প্রথমার একবচনে পুংনপুংসক উভয়লিঙ্গেই অকারান্ত শব্দ একারান্ত হয়। যেমন—

বুত্তন্তে = বৃত্তান্তঃ
মাণুশে = মানুষঃ
মংশে = মাংসম্
শাকে = শাকম্।

সর্ব্বনামশব্দেও এইরূপ। যথা—

জে = যঃ
শে = সঃ
অবলে = অপরঃ।

অর্দ্ধমাগধীতে প্রথমার এই একারান্ত রূপ বৈকল্পিক। যথা, দেবে বা দেবো। আর্ষপ্রাকৃতে প্রথমার একবচনে অকারান্ত পুংলিঙ্গশব্দের তিন রূপই হয়। যথা দেবে, দেবো, বা দেব।* এই তৃতীয় রূপটা প্রণিধানযোগ্য। বাঙ্গালায় প্রথমার একবচনের কোনও বিভক্তি নাই। এই বিভক্তিশূন্য রূপ প্রাকৃতেই আরম্ভ হইয়াছিল, দেখিতে পাই। প্রাচীন বাঙ্গালাসাহিত্যে ঐ একারান্ত প্রথমারও অনেক দৃষ্টান্ত আছে। দীনেশ বাবু তার দুইটামাত্র দেখাইয়াছেন। তাঁহারই উদ্ধৃত কবিতারাশি হইতে আমরা আর কয়েকটা সঙ্কলিত করিতেছি—

মধ্যাহ্নে বধে সমাধে স্নান।
... ...
হরিণের ছায়ে যেন সিংহের বোলাও।
... ...
বিধিএ নির্ম্মল তাক কি কহিব অতি।
... ...
কথা কথা পক্ষীএ আকাশে উড়ি যাই।
... ...
রাহুএ যেন চন্দ্র নিল ধরি।

বাঙ্গালায় স্ত্রীলিঙ্গশব্দেও এই 'এ' বিভক্তি যোজিত হইয়াছিল। যথা—

* চণ্ডের প্রাকৃতলক্ষণ, ২।১০।

সুদেষ্ণাএ বোলেন্ত শুনহ বর নারী।

… … … …

সেইখানে দ্রৌপদীএ দিলেন্ত উত্তর।

প্রাকৃতে স্ত্রীলিঙ্গশব্দের পরে তৃতীয়ার একবচনের একারাদেশ হয়। যথা মালাএ (মালয়া), বুড্ঢীএ (বৃদ্ধ্যা), নঈএ (নদ্যা), ধেণূএ (ধেন্বা), বহূএ (বধ্বা)। উপরিধৃত কবিতাগুলির মধ্যে আকারান্ত, ঈবর্ণান্ত, এবং উবর্ণান্ত শব্দের পরে যে 'এ' বিভক্তি দেখিতেছি, তাহা এই তৃতীয়ার 'এ'ও হইতে পারে। অপভ্রংশে লিঙ্গভেদ এবং উক্তানুক্ত কর্ত্তার ভেদ উঠিয়া যাওয়া বিচিত্র নহে। যদি তাই হয়, তবে বাঙ্গালায় ইহাকেও প্রথমাবিভক্তি বলিতে পারি। কালে 'এ'র স্থানে 'তে'ও বসিয়াছে। যেমন বিজয়গুপ্তের পদ্মপুরাণে—

মূর্খেতে রচিল গীত না জানে মাহাত্ম্য।

… … … …

বিজয় গুপ্তেতে কয়,

এরূপ উচিত নয়।

হয়ত প্রথমার 'এ'কেও সপ্তমীর 'এ' বলিয়া লোকের ভ্রম হইয়াছিল, তাই সপ্তমীর 'তে'ও প্রথমায় বসিয়াছে। যাহা হউক, প্রথমার একবচনের * এই একারান্ত রূপ এখনও সুপ্রচলিত। এ, তে—দুইই আছে। আমরা এখনও বলি, কুকুরে মাংস খায়, গোরুতে ঘাস খায়। শ্রীনাথ বাবুও লিখিয়াছেন, "সকলেই যখন সংস্কৃত জানিবে," "কবির কর্ণে বুঝিতে পারে"। কিন্তু তাঁর ভাষাতত্ত্বে বিভক্তিটার নামও নাই কেন? শ্রীনাথ বাবুর গ্রন্থ অসম্পূর্ণ।

এ গেল একবচন। প্রথমার বহুবচনের বিভক্তি—'রা'। যেমন রামেরা, মুনিরা, তোমরা, আমরা। 'রা' কোথা হইতে আসিল? শ্রীনাথ বাবু তাহা এইরূপ বুঝাইয়াছেন। অকারান্ত এবং আকারান্ত সংস্কৃতশব্দ প্রথমাবহুবচনের বিভক্তিযুক্ত হইলে, 'আঃ' এই বর্ণে তাহাদের অবসান হয়। যথা রামাঃ, বিশ্বপাঃ, বিদ্যাঃ। কিন্তু রামাঃ = রামার্। ইহা হইতেই স্বরবিপর্য্যয়ে 'রামরা' বা 'রামেরা' পদ সিদ্ধ হইয়াছে। বেশ কথা। কিন্তু 'মুনিরা', 'সাধুরা', 'সখীরা', 'বধূরা' বলি কেন?—এ সকলে তো গোড়ায় 'আঃ' ছিল না। শ্রীনাথ বাবু বলেন, "অজ্ঞতা হেতু তাহা আমরা কখন কখন করিয়া থাকি"। পূর্ব্বপক্ষ চূর্ণ হইয়া গেল। তার পরেই সিদ্ধান্ত। সিদ্ধান্তও বলিতে পার, হিতোপদেশও বলিতে পার। "এই "রা" চিহ্ন কেবল রাম, বিশ্বপা এবং বিদ্যা শব্দের ন্যায় শব্দেই ব্যবহার্য্য, অন্য শব্দে নহে। অন্য শব্দে আদি, গণ, প্রভৃতি শব্দ যোগ না করিয়া "রা" চিহ্ন ব্যবহার করিলে ব্যাকরণ দোষ হয়।" কিন্তু 'মুনিরা,' 'সাধুরা,' 'সখীরা,' 'বধূরা' যদি অব্যবহার্য্য হয়, তবে 'তোমরা' 'আমরা'ও সুতরাং অব্যবহার্য্য হওয়া উচিত। কেন না, 'তোমরা' 'আমরা'র মূলে বিসর্গের গন্ধও ছিল না। 'তোম্' শব্দের পরে জস্‌বিভক্তি লাগাইলেও 'অঃ' পর্যন্ত পাওয়া যায়, 'আঃ' জুটে না। অধিকন্তু, সংস্কৃতের আশা ছাড়িতে হয়। তবে শ্রীনাথ বাবু 'তোমরা'

* বীম্‌সের মতে এই একার বহুবচন। প্রমাণস্থলে তিনি দুইটা উড়িয়া কবিতা উদ্ধৃত করিয়াছেন। কিন্তু ভাষাতত্ত্বে আমরা ইহাকে একবচনই বলিতে বাধ্য, কেন না মূলে ইহা একবচনমাত্র। তবে কখন কখনও ইহাতে জাতি বা বহুত্বও বুঝায় বটে। সেরূপ হইতে বাধা নাই। স্থলবিশেষে একবচনেও বহুবচনের কাজ হয়। 'ব্রাহ্মণ পূজ্য' বলিলে 'ব্রাহ্মণেরা পূজ্য' এইরূপই বুঝায়।

'আমরা' মঞ্জুর করিলেন কেন? ভাষাতত্ত্বে ইহার উত্তর নাই, বোধ হয় বলা বাহুল্য।

আসল কথা, বাঙ্গালাকে "কথিতাকারে লিখিত সংস্কৃতভাষা" করিতে গিয়া শ্রীনাথ বাবু ক্রমাগত বিপদে পড়িতেছিলেন। 'মুনয়ঃ' বা 'সখ্যঃ' হইতে 'মুনিরা' বা সখীরা' বাহির করা শ্রীনাথ বাবুর পক্ষেও কিঞ্চিৎ অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। কিন্তু যে পথ হউক, একটা পথ বাঙ্গালীকে খুলিয়া দিতে হইবে। শ্রীনাথ বাবুও গণ আদি প্রভৃতি শব্দ দেখাইয়া দিয়া নিষ্কৃতি পাইয়াছিলেন। 'তোমরা' 'আমরা' র বেলায় আর তা পারেন নাই। 'তোমরা' 'আমরা' উঠাইয়া দিয়া 'তোমাগণ' 'আমাগণ' বা 'তোমাদি' 'আমাদি'র ব্যবস্থা করিতে শ্রীনাথ বাবুর বুদ্ধিও কুণ্ঠিতা হইয়াছিল। আর এক কথা। শ্রীনাথ বাবুর অমন খাসা সিদ্ধান্তেও একটু গলদ্ আছে। আবার হিসাব করিলে তিনি দেখিতে পাইবেন, ইহাতে বিশ্বপ্‌রা বিষ্ণ্‌রা এই সমস্ত লোমহর্ষণ পদের সৃষ্টি হয়। 'রামেরা'র মত করিলেও বিশ্বপেরা বিষ্ণেরা হইয়া পড়ে! অতএব আর এক একটা আকার জমা না দিলে আর 'বিশ্বপারা 'বিষ্ণারা হইয়া উঠে না। ভাষাতত্ত্বে রা-তত্ত্বের দশা এইরূপ।

ঠিক্ বলিতে পারি না, সংস্কৃতপ্রীতি কিছু কমাইতে পারিলে হয়ত শ্রীনাথ বাবু বলিতেন, অকারান্ত শব্দের পরেই সম্ভবতঃ এই 'রা' বিভক্তি প্রথম জন্মিয়াছিল, কালে আকারান্ত ইকারান্ত প্রভৃতির পরেও বসিয়াছে। এরূপ হওয়া অসম্ভব নয়। কিন্তু রামরা বা রামেরা যে পূর্ব্বোক্ত ক্রমেই উৎপন্ন হইয়াছিল, আগে তার প্রমাণ চাই। শ্রীনাথ বাবু সে প্রমাণ দিতে পারেন নাই। শ্রীনাথ বাবু বলেন, "রাম্ শব্দের বহুবচনে প্রথমা বিভক্তিতে রামাঃ হয়। ষষ্ঠী বিভক্তির চিহ্ন প্রাকৃতে যে কারণে "র" হয় তাহা ১১ পৃষ্ঠার বলিয়াছি অর্থাৎ বিসর্গ স্থানে "র" উচ্চারণ করা হয়।" ১১ পৃঃ তিনি বলিয়াছেন, "সংস্কৃত ভাষায় 'স' স্থানে (ঃ), (ঃ) স্থানে 'র', 'র' স্থানে (ঃ) হয়। অর্থাৎ 'স', 'র,'ঃ একই জাতীয় বর্ণ। যথা, প্রাতর্ = প্রাতঃ, বহিস্ = বহিঃ, পুনর্ = পুনঃ, নমস্ = নমঃ।" সংস্কৃতে বিরামে পদান্ত রকারের স্থানে বিসর্গ হয়, এ কথা সত্য বটে। বিরামে পদান্ত সকারের স্থানেও বিসর্গ হয়, ইহাও সত্য। কিন্তু বিরামে বিসর্গের স্থানে রকার হয়, এ কথাটা সত্য নহে। শ্রীনাথ বাবুও এত দৃষ্টান্ত দিয়াছেন, কিন্তু ইহার দৃষ্টান্ত দিতে পারেন নাই। আর স,র, বিসর্গ একজাতীয় বর্ণ, এ কথাও মিথ্যা। ইহারা যে সবর্ণ নহে, পাঠশালার শিশুরাও তা জানে। স দন্ত্য, র মূর্দ্ধন্য, বিসর্গ কণ্ঠ্য। ইহারা পরস্পরবিনিময়সহও নয়। 'স'র স্থানে যদৃচ্ছাক্রমে রেফ বা বিসর্গ, রেফের স্থানে যদৃচ্ছাক্রমে বিসর্গ বা 'স,' কিংবা বিসর্গের স্থানে যদৃচ্ছাক্রমে 'স' বা রেফ বসাইতে পারি না। সংস্কৃতে রামস্য না বলিয়া রামর্য বা রামঃয, গোর্ভ্যাম্ না বলিয়া গোঃভ্যাম্ বা গোস্‌ভ্যাম্, অথবা রামাঃ না বলিয়া রামাস্ বা রামার্ বলিতে পারি না। পারিলে শ্রীনাথ বাবুর কিছু সুবিধা হইত, কিন্তু পারি না। সংস্কৃতে শ্রীনাথ বাবুর মতের নজীর নাই। প্রাকৃতেও না। এরূপ বিনিময় প্রাকৃতেও চলে নাই। সংস্কৃতের বিসর্গ প্রাকৃতে কোথাও 'উ,' কোথাও 'ও' হয়। যেমন বচ্ছো (বৃক্ষঃ),

মালাউ বা মালাও (মালাঃ)। কোথাও বা একেবারে লুপ্ত হয়। যেমন, বচ্ছা (বৃক্ষাঃ)। কিন্তু কোথাও 'স' বা 'র' হয় না। শ্রীনাথ বাবুর অনুকূল মতের প্রাকৃতেও নাই। রামরা বা রামেরা 'রামাঃ' হইতে আসিয়াছে, এ সিদ্ধান্ত অপ্রামাণিক।

তবে 'রা' কোথা হইতে আসিল? বীম্‌স্‌ও বুঝিতে না পারিয়া ফাঁকি দিয়াছেন। কিন্তু হর্ণলের গ্রন্থে একটা উত্তর আছে। প্রথমার বহুবচনের এই র-যুক্ত রূপ নেপালী ভাষায়ও পাওয়া যায়। নেপালী 'দেবহেরু' বা 'দেবহরু' = বাঙ্গালা 'দেবেরা'। নেপালীতে এই হেরু বা হরু কেবল প্রথমার বহুবচনের বিভক্তি নহে, অন্যান্য বিভক্তির বহুবচনেও আগমের মত যুক্ত হয়। যেমন দেব-হেরু-কো (দেবদিগের), দেব-হেরু-লাই (দেবদিগকে)। কিন্তু হর্ণলে দেখাইয়াছেন, মূলে হেরু বা হরু ষষ্ঠীবিভক্তিরই প্রতিরূপ। কথাটা একটু খুলিয়া বুঝাই। মাগধীতে ষষ্ঠীর একবচনের স্থানে বিকল্পে 'হ' হয়। যথা পুলিশাহ বা পুলিশশ্‌শ (পুরুষস্য)। প্রাকৃতে অনেক সময়েই আবার ষষ্ঠ্যন্ত পদের পরে ষষ্ঠীরই অর্থে একটা অতিরিক্ত কেরক বা কেরিক, কেলক বা কেলিক শব্দ প্রযুক্ত হইয়া থাকে। সংস্কৃতনাটক যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা ইহা অবগত আছেন। মৃচ্ছকটিকে "অপ্‌পণো কাদিং" এবং "অপ্‌পণো কেরিকং কাদিং," "অজ্জচালুদত্তস্‌স পবহণং" এবং "এশে কৃখু পবহণে অজ্জচালুদত্তাহ কেলকে," দুইরূপ প্রয়োগই আছে। এই 'কেরক' অপভ্রংশে 'কেরউ' হইয়াছিল।* প্রাকৃতের 'দেবাহ কেরকং' অপভ্রংশে 'দেবাহ কেরউ' হইয়াছিল। দেবাহ কেরউ হইতেই নেপালীর দেবহেরু আসিয়াছে। দেবাহ কেরউ হইতে দেবাহ এরউ—দেবা হেরউ—এইরূপ ক্রমে দেবাহেরু বা দেবহেরু উৎপন্ন হওয়া অসম্ভব নয়। আজ যাহা নেপালীতে প্রথমার বহুবচন, মূলে তাহা ষষ্ঠীর রূপ মাত্র। হর্ণলের মতে, বাঙ্গালার 'রা' বিভক্তিও ষষ্ঠীর 'র' হইতে আসিয়াছে।*

এক ঔপমানিকভাষাতত্ত্বের সাহায্যেই হর্ণলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন, আর কোনও প্রমাণ দেন নাই। কিন্তু এ মতের অনুকূল প্রমাণ বাঙ্গালাতেই আছে। ষষ্ঠীবিভক্তি বাঙ্গালায় অনেক বিভক্তির স্থানেই বসে বা বসিত। কখনও একাকী, কখনও বা সেই সেই বিভক্তির সহিত। যেমন দ্বিতীয়ার অর্থে—

হরিণের ছায়ে যেন সিংহের বোলাও।

সঞ্জয়ের মহাভারত।

সিংহেরে ডাকএ সেই হইতে নির্ম্মূল;

ঐ, ঐ।

দেওয়ানেরে গেলা প্রভু ধূলি কেন গায়।

মাধবাচার্য্যের চণ্ডী।

সকল দৃষ্টান্তই দীনেশ বাবুর গ্রন্থ হইতে ধার করা। প্রাচীন বৈষ্ণবকাব্যে দীনেশ বাবু "কাশীরে গমন"ও পাইয়াছেন। সিংহের, সিংহেরে = সিংহকে। দেওয়ানেরে, কাশীরে—এ দুইটাকে দ্বিতীয়ান্তও বলা যায়, চতুর্থ্যন্তও বলা যায়।† যারে, তারে, তোমারে, আমারে, রামেরে, সীতারে—এখনও অনেক প্রদেশের মৌখিক ভাষায় এবং পদ্যে সর্ব্বত্রই প্রচলিত আছে। আমরা

* হেমচন্দ্রের প্রাকৃতাষ্টাধ্যায়ী, ৪।৪৩৮।

* Hoernle's Comparative Grammar of the Gaudian Languages, § § 364, 369.

† গত্যর্থকর্ম্মণি দ্বিতীয়াচতুর্থ্যৌ চেষ্টায়ামনধ্বনি। পাণিনির ২।৩।১২। "মথুরাকে পাঠাইল রূপসনাতন" এখানেও 'মথুরাকে' দ্বিতীয়ান্ত বা চতুর্থ্যন্ত। দীনেশ বাবু অনর্থক বিভক্তির আশঙ্কা করিলেন কেন?

এখনও বলি, তাদের ডেকে আন, তাদেরে বোলো। চতুর্থীর অর্থে, যথা—

কোপ বাড়িবার শৈল্য বলে আর বার।
সঞ্জয়ের মহাভারত।

কার্য্য হেতু কেহ কারে ডাকিবার যায়।
মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণবিজয়।

মোর মন্দ করি যদি সারিবার পার।
বিজয় গুপ্তের পদ্মপুরাণ।

অপূর্ব্ব জ্ঞানে ধায় লোক আমা দেখিবারে।
কৃত্তিবাসের রামায়ণ।

চন্দ্র ধরিবারে হাত বাড়াএ কুতুহলে।
সঞ্জয়ের মহাভারত।

ভাল দ্রব্য যখন পাব
কালিকারে তুলিয়া না খোব।
ডাকের বচন।

বাণিজ্যেরে চলে ধনপতি সাধু তবে।
জনার্দ্দনের কালকেতু ও শ্রীমন্তের উপাখ্যান।

বাড়িবার, * ডাকিবার, সারিবার, দেখিবারে, ধরিবারে, কালিকারে, বাণিজ্যেরে—এ সকলই চতুর্থীর অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। প্রথম তিনটায় শুধু ষষ্ঠীর বিভক্তি, শেষ চারিটায় ষষ্ঠীর পিছে চতুর্থীর বিভক্তিও আছে। "সারিবার পার"—এখানে তুমর্থে চতুর্থীর স্থানে ষষ্ঠী। বাকীগুলিতে চতুর্থীর অর্থ—নিমিত্ত। বিক্রমপুরে এখনও বলে—ধরবার পারস্ না, খাবার গেছে। অর্থাৎ ধরিতে পারিস্ না, খাইতে গিয়াছে। মৌখিক ভাষায় পঞ্চমীর একটা বিভক্তি—'চেয়ে'। প্রায় সর্ব্বদাই ইহা ষষ্ঠ্যন্ত পদের পরে বসে। যেমন, তার চেয়ে সুন্দর। পূর্ব্ববঙ্গের স্থানে স্থানে বলে, তার থিয়া সুন্দর। 'থিয়া'ও পঞ্চমীর বিভক্তি, পূর্ব্বে বলিয়াছি। প্রাচীন বাঙ্গালায় বহুবচনের বিভক্তিও অনেক সময়ে ষষ্ঠ্যন্ত পদের পরে বসিত। গত বৈশাখের বঙ্গদর্শনে দীনেশ বাবু যে প্রাচীন গদ্যের নমুনা দেখাইয়াছেন, তাহাতে আছে—'রাজারদিগের,' 'চাকরের দিগকে'। এই সকল কারণে ষষ্ঠ্যন্ত 'রামের' হইতে 'রামেরা' র উৎপত্তিও অসম্ভব বোধ হয় না। 'রা'এর আকারটা প্রাকৃত হইতে আসিয়া থাকিবে।* প্রাকৃতে প্রথমার বহুবচনে 'আ' র উপরই ঝোঁক্ কিছু বেশী। অকারান্ত আকারান্ত ছাড়া অন্যান্য শব্দেরও প্রথমার বহুবচনে 'আ' হয়। যথা ভত্তারা (ভর্ত্তারঃ), পিঅরা (পিতরঃ), অপ্পাণা (আত্মানঃ), ণত্তিআ (নপ্তঃ)। খনার বচনে দীনেশ বাবু 'নয়া' 'গঙ্গা' 'বলদা' 'ছাগলা' দেখাইয়াছেন। বাঙ্গালাপদ্যে এখনও 'কত জনা' 'যত জনা' প্রভৃতির প্রয়োগ আছে। তবে আসল শব্দের পরে না করিয়া তার ষষ্ঠ্যন্ত রূপের পরে ঐরূপ বিভক্তিযোগ করা হইত কেন, তার কারণ এই বোধ হয় যে, ষষ্ঠ্যন্ত রূপের প্রয়োগে বিবক্ষিত অর্থে যেন একটু জোর পাওয়া যায়—শুধু শব্দে তা হয় না। হিন্দীতেও দেখি, দ্বিতীয়াদি বিভক্তি পরে থাকিলে সর্ব্বনামশব্দের যে যে রূপ হয়, মূলে তাহা ষষ্ঠীর রূপমাত্র। যেমন জিস্=প্রাকৃত জেসিং, জীসে (যস্য বা যস্যাঃ)। জিন্=জাণ, জীণ (যেষাং বা যাসাম্)। তিস্ তিন্ কিস্ কিন্ ইত্যাদিতেও এইরূপ। তুঝ্=তুজ্ঝ (তব)। মুঝ্=মজ্ঝ (মম)। দোনোঁ=দোণ্হং (দ্বয়োঃ)। 'দোনোঁ' প্রথমান্তেও হয়। 'তিনোঁ'র মূলও প্রাকৃ-

* বাড়িবার, বাড়্বার, বাড়ার,—একই শব্দের তিন রূপ। সেইরূপ ডাকিবার, ডাক্বার, ডাকার ইত্যাদি। পারি তো ভাষাতত্ত্বের আখ্যাতভাগের সমালোচনায় এ সকলের ব্যুৎপত্তি বুঝাইব।

* হর্ণলের মতে 'রা'ও ষষ্ঠীর 'র' এরই একটা strong form মাত্র।

তের তিণ্হং (ত্রয়াণাং বা তিসৃণাম্)। হর্ণলের মত অসম্ভব্ নয়।

কিন্তু হর্ণলের মতের এক দৃঢ়তর প্রমাণ আছে। প্রাকৃতে পুংলিঙ্গে যদ্‌শব্দের ষষ্ঠীর বহুবচনে 'জেসিং,' 'জাণং' বা 'জাণ', এবং তদ্‌শব্দের 'তেসিং,' 'তাণং' বা 'তাণ' হয়। এই 'তাণ' প্রাচীন বাঙ্গালায়ও পাওয়া যায়। সেখানে ইহার রূপ 'তান'। যথা—

নৃপতি হুসেন সাহ গৌড়ের ঈশ্বর।
তান হক্ সেনাপতি হওন্ত লস্কর।
কবীন্দ্র পরমেশ্বরের মহাভারত।
তান এক সেনাপতি লস্কর ছুটিখান।
শ্রীকর নন্দীর অশ্বমেধপর্ব্ব।
দিব্যরূপ দেখি তান ব্যাধ কালকেতু।
জনার্দ্দনের কালকেতু ও শ্রীমন্তের উপাখ্যান।

মূলে বহুবচন হইলেও, এ সমস্ত স্থলে 'তান' একবচন এবং গৌরববাচী। তান= তাঁর। সংস্কৃতে এক বুঝাইতেও গৌরবার্থে কখন কখনও বহুবচন হয়। শঙ্করাচার্য্য মানুষ একজন, কিন্তু বলি—ভাষ্যকারাঃ। উদ্ধৃত প্রয়োগগুলিরও বুনিয়াদ্ সেই। 'তান' এখনও লুপ্ত হয় নাই। গৌরবার্থে ষষ্ঠীর একবচনে 'তান' এবং 'যান' পূর্ব্ববঙ্গের অনেক স্থানে এখনও প্রচলিত আছে। এই দুই ষষ্ঠ্যন্ত পদের পরেই 'আ' যুক্ত করিয়া গৌরবার্থে প্রথমার বহুবচনে ঐ সকল দেশে 'তানা' ও 'যানা' বলে। তানা= তাঁরা, যানা=যাঁরা। বাঙ্গালা প্রথমার 'রা' বিভক্তি ষষ্ঠীর 'র' হইতে আসিয়াছে, 'তানা' 'যানা' এ কথার উৎকৃষ্ট প্রমাণ।'

কিন্তু ষষ্ঠীর 'র' কোথা হইতে আসিল? ইহার উত্তরে তিনটা বিভিন্ন মত আছে। (১) আমাদের শ্রীনাথ বাবুর মত। রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রেরও নাকি এই মত। (২) ডাক্তার হর্ণলের মত। বীম্‌সেরও এই মত। (৩) দীনেশ বাবুর মত। প্রথম মতটা ছাড়া আর কোনও মতই বড় তুচ্ছ নহে। (ক্রমশঃ)

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র গুহ।
এম্-এ।

জগন্নাথ-দর্শন।

অনেক দিন হইতে আমার জগন্নাথ দর্শনের ইচ্ছা হইয়াছিল। ভারতের বহু-দূর হইতে নানাশ্রেণীর নর-নারী যাহা দেখিবার জন্য বৎসর বৎসর, বহু প্রাচীন-কাল হইতে, পথের ভীষণ কষ্ট তুচ্ছ করিয়া, দলে দলে সমাগত হইয়া থাকে;— শৈশবকাল হইতে যাহার সম্বন্ধে বহুবিধ প্রবাদ-বাক্য নানামুখে শুনিয়া আসিয়াছি; —একদিন যে বিগ্রহ ও যাহার মন্দির, সেই সুপ্রসিদ্ধ "কালা পাহাড়ের" দেবমূর্ত্তি-ধ্বংসী বিক্রম সহ্য করিয়াছিল;—তাহা দেখিবার ইচ্ছা কাহার মনে জাগরূক না হয়? বিশেষতঃ রামায়ণের ন্যায় প্রাচীন কালে, যে অসীম জলরাশির অজাত-কুক্ষি-কবলের অন্তরালে আমাদের আজকালকার এই অসংখ্য প্রাণী সমাকুল হাস্যময় বঙ্গদেশ সম্পূর্ণরূপে নিমজ্জিত ছিল;—আবার বহু-বৎসর পরে যাহার অনুগ্রহে ও যাহার সচঞ্চল ক্রীড়ার প্রভাবে, ইহা নরনারীর আবাস-ক্ষেত্র রূপে পরিণত হইয়াছে;—পুরীতে গেলে সেই মহাশক্তির মহাসৃষ্টিরহস্য স্বরূপ সাগর দেখিতে পাইব,—এ ঔৎসুক্যও আমার ছিল। এবার, পুরীদর্শনের হঠাৎ একটী সুবিধা উপস্থিত হইল। কাঁকি-নার রাজা বাহাদুর, তাঁহার প্রজাবর্গের মধ্যে যাহারা নিজব্যয়ে দেশদর্শন করিতে সক্ষম নহে, এরূপ প্রায় শতাধিক প্রজার পথের ও আহারাদির ব্যয় স্বয়ং বহন

দেহ-কঙ্কাল দেখিয়া, তাহাদের মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদ শুনিয়া, তোমার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল—তাহাদের অনশন-জনিত ক্লেশ তুমি আত্মায় অনুভব করিলে। তাহাদের ক্ষুধা নিবারণের জন্য তুমি অন্নচ্ছত্র খুলিয়া দিলে। যেমন তাহাদের ক্ষুন্নিবৃত্তি, তেমন সঙ্গে সঙ্গে তোমার আত্মার শান্তি। কিন্তু যাহারা উপাধি পাইবার জন্য অর্থদান করিলেন, তাহাদের তৃপ্তি কোথায়? গেজেটে নাম উঠিল, উপাধী হইল না; উপাধী হইল, মনোমত হইল না, কিছু বাকী রহিল। এই আসক্তি, এই কামনাই তাহাদের সমস্ত কর্ম্মকে কলুষিত করিল। কেন না, ইহা কর্ত্তব্যবোধ-বিরহিত নিষ্কাম-প্রসূত, নহে। এরূপ স্থলে মুক্তি সুদূরপরাহত।

প্রত্যেক মনুষ্য যেরূপ নিজ সুকৃতি দুষ্কৃতি বশে উন্নতি এবং অবনতি প্রাপ্ত হয়, প্রত্যেক জাতিও তদ্রূপ। ইতিহাস ইহার প্রমাণ। কুবেরের দুই পুত্র নলকুবর ধনগর্ব্বে মত্ত হইয়া যথেচ্ছাচার পান এবং ব্যভিচারে লিপ্ত হইয়াছিলেন। নারদ তাহাদিগকে এইরূপ অবস্থায় দেখিতে পাইলেন। তাহারা লজ্জিত হওয়া দূরে থাকুক, বরং অধিকতর উল্লাস এবং প্রমত্ততার পরিচয় দিয়াছিল। এই পাপে তাহারা পরজন্মে বৃক্ষজন্ম প্রাপ্ত হইয়া যমলার্জ্জুন বৃক্ষনামে আখ্যাত হইয়াছিল; পরে শ্রীকৃষ্ণের চরণ স্পর্শে পুনরায় নরজন্ম প্রাপ্ত হয়। রাজা দশরথ পূর্ব্বজন্মে একটী তপস্বীবালককে ভ্রম বশতঃ বাণবিদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহাতেই তাঁহার মৃত্যু হয়। তাহার বৃদ্ধ পিতা দশরথকে পুত্রশোকে মৃত্যু হইবে বলিয়া অভিসম্পাত করিয়াছিলেন। পরজন্মে দশরথের তাহাই ঘটিল। যে রাবণ স্বীয় ঐশ্বর্য্য ও ক্ষমতার প্রভাবে ইন্দ্রের ইন্দ্রত্বকেও তুচ্ছ করিতেন; যাহার ভয়ে দেবতাগণ পর্য্যন্ত সন্ত্রাসিত হইয়াছিলেন; পতিপ্রাণা রামময়জীবিতা সীতার উষ্ণ নিশ্বাসে তিনিও সবংশে নিধন হইয়াছিলেন, তাহার সোণার লঙ্কা ছার খার হইয়াগিয়াছিল। পূর্ব্বজন্মে এক ঋষিকন্যা কর্ত্তৃক রাবণ অভিশপ্ত হইয়াছিলেন যে, তিনিই পরজন্মে অগর্ভ-সম্ভবা নারী রূপে তাঁহার নিধন সাধন করিবেন। এই ঋষিকন্যা সতীত্ব রক্ষার জন্য রাবণভয়ে অগ্নিপ্রবেশ করিয়াছিলেন। রাম বালীকে অকারণ বধ করিয়াছিলেন, পরজন্মে এই বালী ব্যাধরূপে রামাবতার কৃষ্ণকে বধ করিয়াছিল। টারকুইন বংশের জনৈক রাজা লুক্রেসিয়ার (Lucretia) ধর্ম্মনাশ করেন; তাহার পর হইতে রোমরাজ্যে প্রজাতন্ত্র শাসন-প্রণালী প্রতিষ্ঠিত হয়। ফরাসিরাজ্যে দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত শাসনপ্রণালীতে বর্ণ বৈষম্য এবং জাতি-বৈষম্য অপ্রতিহতরূপ চলিতেছিল। সাধারণ লোক এই সকল অত্যাচারে অত্যন্ত ব্যথিত এবং মর্ম্মাহত হইয়াছিল। ফরাসি-রাষ্ট্র-বিপ্লবের প্রবল স্রোতে সেই বর্ণবৈষম্য এবং জাতিবৈষম্য বিধৌত হইয়া সাম্যভাব-প্রবণ প্রজাতন্ত্র শাসন-প্রণালী প্রবর্ত্তিত হয়। বৈদিক-ধর্ম্ম অন্তঃসারশূন্য হইয়া কেবল যাগযজ্ঞে যখন পর্য্যবসিত হইল, তখন বুদ্ধদেব ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়া পবিত্র কর্ম্মযোগ-প্রচার করিলেন। ধর্ম্মব্যপদেশে যখন ব্রাহ্মণগণ স্বার্থপরতা এবং স্বেচ্ছাচারিতার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছিলেন, তখন শ্রীগৌরাঙ্গ বঙ্গবাসীর শুষ্ক প্রাণে ভক্তি ও প্রেমের অমৃতধারা বর্ষণ করিয়া, তাহাদিগকে ধর্ম্মের

জীবন্ত ছবি দেখাইয়াছিলেন এবং স্বার্থ-প্রণোদিত বিকৃত ধর্ম্মের গতি ফিরাইয়াছিলেন। গ্রীসের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে যখন পরস্পর বিদ্বেষানল এরূপ প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল যে, সেই প্রদেশবাসিগণ শত্রুর সহিত মিলিত হইয়া প্রতিবাসীর সর্ব্বনাশ এবং স্বদেশের স্বাধীনতা লোপ করিতে সর্ব্বদা প্রস্তুত; অন্তর্দ্রোহিতা প্রযুক্ত যখন তাহাদের স্বদেশহিতৈষণা প্রবৃত্তি একেবারে বিলুপ্ত হইয়াছিল, তখনই উহা প্রথমে ফিলিপ এবং আলেকজাণ্ডার কর্ত্তৃক ও তৎপর রোম কর্ত্তৃক অধিকৃত হয়। রোমের রাজ্যাধিকার অত্যন্ত বিস্তৃত হওয়ায় শাসন-প্রণালীর শৈথিল্য ঘটিয়াছিল। যে সকল জাতি উহার শাসনাধিকৃত, কালে তাহাদের নৈতিক শিথিলতা রোমকদিগকে স্পর্শ করিয়াছিল। স্বার্থপরতা ক্রমে স্বদেশহিতৈষণার স্থান অধিকার করিল; সম্রাটগণ নিজ নিজ আধিপত্য অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য যোদ্ধৃগণ এবং বীরদিগকে দুর্ব্বিনীত করিয়াছিলেন; পাছে তাহারাই সম্রাটদিগের স্থান অধিকার করিয়া বসে। এই সকল কারণে রোমের সৌভাগ্য-রবি ক্রমে হীনপ্রভ, এবং অবশেষে একেবারে অস্তমিত হইল। আজ যে বোয়ারগণ (Boers) স্বদেশ রক্ষার জন্য অমিত তেজে প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছে, তাহারা এক সময়ে ট্রান্সভ্যালের (Transvaal) আদিম অধিবাসিদিগের স্বাধীনতা হরণ করিয়া তাহাদিগকে স্বদেশ হইতে উৎখাৎ করিয়াছিল। পাপ এবং দুষ্কৃতির অধঃপতন অবশ্যম্ভাবী। বিশ্ব জগৎ এই কর্ম্মফল সূত্রে বাঁধা। ভারতবাসি! তুমি এক সময় পৃথিবীকে নিষ্কাম ধর্ম্ম শিক্ষা দিয়াছিলে ; আজ তোমার সকল কর্ম্মই স্বার্থ-বিজড়িত। তুমি মুখে যাহা বল, তোমার কার্য্যে তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত। তাই তোমার সকল অনুষ্ঠানই অন্তঃসারশূন্য। ধর্ম্মের গ্লানি কি এখন হইতে বাকী আছে? হে নারায়ণ! তোমার আসিবার কি এখনও সময় হয় নাই? পূর্ণ আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া, ভারতবাসী আবার নিষ্কাম ধর্ম্ম করে শিখিবে? করে বলিবে—

"অনন্ত উন্নতি
প্রকৃতির নীতি, প্রভো নহে অবনতি।
মানব অপূর্ণ, মাত্র পূর্ণ নারায়ণ!
পূর্ণব্রহ্ম মহাদর্শ রাখিয়া সম্মুখে,
অপূর্ণ আমরা, প্রভো, যাইব ভাসিয়া
সেই পূর্ণতার দিকে নিব ভাসাইয়া
সমস্ত মানবজাতি উন্নতির পথে।"

শ্রীকুলচন্দ্র রায়চৌধুরী।

ভাষাতত্ত্ব। (২)

সংস্কৃতে ষষ্ঠীর একবচন—ঙস্। প্রয়োগে তাহা স্য বা বিসর্গ হয়। শ্রীনাথ বাবুর মত, এই স্য বা বিসর্গ হইতেই বাঙ্গালা ষষ্ঠীর 'র' আসিয়াছে। তাঁর যুক্তি এই। "স, ঃ এবং র একজাতীয় বর্ণ, উহারা অনেক সময় একে অন্যর স্থানে বসে"। যেমন, বহিস্+ভাগঃ=বহির্ভাগঃ। সংস্কৃত পাথস্=প্রাকৃত পাথার। বহিঃ=বাহির। আরো একটা যুক্তি আছে। এ যুক্তি দীনেশ বাবুর। কেন না, নিজের স্বতন্ত্র মত থাকিলেও এ মতও তিনি অগ্রাহ্য করেন নাই। দীনেশ বাবু বলেন, "এই

মতের সাপেক্ষে (?) বলা যাইতে পারে যে, 'স' এবং 'র' উভয়ই বিসর্গে পরিণত হয়"।

যেমন আছে, তেমনই ধরিয়া লইলাম। দেখিয়াছি, সংস্কৃতে বিসর্গ বা স' এর স্থানে বিরামে কখনও র হয় না। অকার বা আকারের পরে বিসর্গ বা স, অন্য বর্ণ পরে থাকিলেও, র হয় না। মানস্ বা মনঃ, রামাস্ বা রামাঃ কখনও মনর্ বা রামার্ হয় না। তবে স্বর বা হশ্ পরে থাকিলে, অ আ ভিন্ন স্বরের পরস্থিত পদান্ত বিসর্গ বা স' এর স্থানে র হইতে পারে বটে। যেমন মুনিরাসীৎ, মুনের্বাক্যম্, সাধুরিচ্ছতি, সাধোর্হৃদয়ম্, আশীরস্তু, ধনুর্ভ্রিয়তে। কিন্তু এই কারণেই যদি মুনেঃ সাধোঃ প্রভৃতি ষষ্ঠ্যন্তপদ হইতে বাঙ্গালার ষষ্ঠীতে মুনির সাধুর প্রভৃতি পদ আসিল, তবে মুনিঃ সাধুঃ আশীঃ ধনুঃ প্রভৃতি প্রথমান্তপদ হইতেই বা বাঙ্গালার প্রথমায় মুনির সাধুর আশীর ধনুর প্রভৃতি পদ আসিল না কেন? বিসর্গ মুনিঃ প্রভৃতিতেও যেমন, মুনি প্রভৃতিতেও তেমনই। সে বিসর্গ মুনেঃ প্রভৃতিতে যে কারণে র হয়, মুনিঃ প্রভৃতিতেও ঠিক্ সেই কারণেই র হইয়া থাকে। বিরামে বিসর্গ কখনও র হয় না—মুনিঃ প্রভৃতিতেও না, মুনেঃ প্রভৃতিতেও না। তবে প্রথমাতেই বা মুনির সাধুর আশীর বা ধনুর হইল না কেন? প্রমাণান্তরে শ্রীনাথ বাবুর মত সমর্থিত না হইলে এ আপত্তির অবকাশ থাকে। কিন্তু ভাষাতত্ত্বে আর কোনও প্রমাণ নাই। প্রাকৃতে এ বিসর্গবাদের নজীর নাই, পূর্ব্বেও বলিয়াছি। কি প্রাচীন কি অর্ব্বাচীন, কোনও প্রাকৃতে সংস্কৃতের বিসর্গ র হয় না।

তবে বহিঃ হইতে 'বাহির' হইল কিরূপে? শ্রীনাথ বাবুর এই এক কথা আছে। আপাততঃ কথাটা অমূলকও নয়। হেমচন্দ্রও বলেন, বহিরর্থে প্রাকৃতে বাহিং ও বাহিরং হয়।* কিন্তু তাহাতে এমন প্রমাণ হয় না যে, বহিঃ হইতেই 'বাহির' আসিয়াছিল। হেমচন্দ্র খ্রীঃ দ্বাদশ শতাব্দীর লোক। তখন তিনি প্রাকৃতে ঐ দুইটা শব্দ পাইয়াছিলেন, সন্দেহ নাই। কিন্তু হেমচন্দ্রের জন্মের বহুপূর্ব্বে—ন্যূনকল্পেও ৬০০ বৎসর পূর্ব্বে—বররুচির প্রাকৃত-প্রকাশ রচিত হয়। সেই প্রাকৃত-প্রকাশে বাহির শব্দ নাই। প্রাকৃত-প্রকাশের মতে বাহিং † হয়, কিন্তু বাহিরং হয় না। ইহাতে আমার এই বোধ হয় যে, বররুচির কাল পর্য্যন্তও প্রাকৃতে বাহির শব্দ ছিল না। থাকিলে, এমন একটা আটপৌরে শব্দের এত বড় একটা উচ্ছৃঙ্খল বিকার তিনি অবশ্য লিপিবদ্ধ করিতেন। বাহি বাহি বা বাহিং অতি প্রাচীন প্রাকৃতেও ছিল, কিন্তু বাহিরং প্রাকৃত প্রকাশেরও পরে জন্মিয়াছে। জন্মের পৌর্ব্বাপর্য্যে আগে বাহিং, পরে বাহিরং। এক আপত্তি হইতে পারে। পালি মাহারাষ্ট্রী প্রভৃতিতে না হউক, আর কোনও পুরাণে প্রাকৃতে হয়ত বহিঃ হইতে বাহির শব্দই হইয়াছিল। হেমচন্দ্র তাহাতেই ঐ বাহিরং পাইয়াছেন। এরূপ বুঝিতে বাধা কি? প্রমাণ পাইলে বাধা নাই। কিন্তু সে পুরাণ প্রাকৃতটার প্রমাণ কই? এই জন্য আমার বিশ্বাস, বাহি হইতেই 'বাহির' আসিয়াছে, বহিস্ বা বহিঃ হইতে আসে

* হেমচন্দ্রের প্রাকৃতব্যাকরণ, ২।১৪০। ভুলে আমি পূর্ব্ব প্রবন্ধে ইহকে প্রাকৃতাষ্টাধ্যায়ী বলিয়াছি। হেমচন্দ্র কৃত শব্দানুশাসন নামক বিস্তীর্ণ গ্রন্থের অষ্টম অধ্যায় মাত্র।

† প্রাকৃত প্রকাশ ৪।৬, ১২।

নাই। ইহাতে কিছু অসম্ভবও নাই। অন্তর বাহির, বা ভিতর বাহির—ভাবমিথুন। একে অন্যের নিত্যসংসর্গী। সকল প্রাকৃতেই অন্তরশব্দ আছে। অর্ব্বাচীন প্রাকৃতে বা অপভ্রংশে অব্‌ভন্তর হইতে 'ভিতর' শব্দও জন্মিয়াছিল। অন্তর বা 'ভিতর' এর দেখা দেখি বাহি'ও কালে 'বাহির' হইয়া থাকিবে। ইংরেজ শাব্দিকেরা ইহাকে Analogy বলেন। Analogy ধ্বনিবিকারের অন্ততম হেতু। আর কোথাও প্রাকৃতে * স বা বিসর্গের স্থানে র হইতে না দেখিয়া, আমার এ বিশ্বাস দৃঢ়ীভূত হইয়াছে মাত্র।

কিন্তু এক বিসর্গের উপরই শ্রীনাথ বাবু নির্ভর করেন নাই। তাঁর মতে, রামস্য হইতেও রামর বা রামের আসিতে পারে। যেমন সংস্কৃত পাথস্ হইতে আধুনিক পাথার। 'স' যে কোথাও র হয় না, আমিও এমত বলি না। লাটিনে দুই স্বরের মধ্যবর্ত্তী s অনেক সময়ে r হয়। গ্রিমের সিদ্ধান্তে সংস্কৃতের 'স' ও লাটিন, অস্কান্, ইংরেজী বা আধুনিক হাইজর্ম্মাণে অনেক স্থলে r হয়। কিন্তু তাহাতে শ্রীনাথ বাবুর কোনও উপকার নাই। ধ্বনিবিকারের ধারা এক এক ভাষায় এক একদিকে বয়। এক ভাষায় একরূপ বলিয়া সকল ভাষায়ই সেই রূপ হইবে, এমন কোনও নিয়ম নাই। † সংস্কৃতেও অনেক সময়ে স' এর স্থানে র হয়। তাহাতে নির্ভর করিলে কি দোষ হয়, বিসর্গবাদের বিচারে বলিয়াছি। অতএব রামস্য হইতে রামর আসিয়াছে, দেখাইতে হইলে আগে শ্রীনাথ বাবুকে দেখাইতে হইবে যে, সংস্কৃতের স প্রাকৃতে বা অপভ্রংশেও র হয়। প্রাকৃত বা অপভ্রংশের কথা এইজন্যও বলিতেছি যে, ইহারা সংস্কৃতের অধিকতর সন্নিকৃষ্ট, অথচ বাঙ্গালা আবার ইহাদেরই বংশধরা। যদি দেখি যে, সংস্কৃতের স প্রাকৃতে, অথবা প্রাচীন প্রাকৃতের স বা শ অর্ব্বাচীন প্রাকৃতে বা অপভ্রংশে অনেক সময়েই র হয়, তবে রামস্য রামস্স বা রামশ্‌শ † হইতেও রামর হওয়া অসম্ভব বোধ করি না। কিন্তু শ্রীনাথ বাবু তাহা দেখাইতে পারেন নাই। এক আধটা দৃষ্টান্তেই ভাষাতত্ত্ব নির্ণীত হয়, স্বীকার করিলেও, শ্রীনাথ বাবুর দৃষ্টান্তে তাহা হয় না। নিজেরই যার প্রমাণ চাই, সে অপরের প্রমাণ হইতে পারে না। পাথার শব্দ পাথস্ হইতেই আসিয়াছে, এ কথাটারই যে প্রমাণ চাই। প্রাকৃতে দেখি, হলন্ত শব্দই নাই। পাথস্ এরও স থাকে না। পালিতে প্রথমা ও দ্বিতীয়ায় থাকে না, মহারাষ্ট্রী প্রভৃতি অর্ব্বাচীন প্রাকৃতে কোনও বিভক্তিতে থাকে না। ‡ পাথস্‌শব্দ প্রথমা ও দ্বিতীয়ার একবচনে পালিতে পাথং, মহারাষ্ট্রী প্রভৃতিতে পাহো ও পাহং § হয়। পালিতে যে যে বিভক্তিতে স থাকে, সেখানেও তাহা র হয় না। তবে পাথস্ এরই স পাথারে র হইয়াছে বলি কিসে? ধ্বনিতে অর্থে উভয়তঃ সাদৃশ্য থাকিলেও কিন্তু দুই শব্দে জন্যজনকভাব না থাকিতে পারে। এখানে পূর্ণ সাদৃশ্যও নাই। বাহির শব্দের র'ও বহিস্ হইতে আসে নাই, এমন বিবে-

* শনৈঃশব্দও প্রাকৃতে সণিঅং হয়।

† Sayce, Introduction to the Science of Language, Ed. 1883,Vol 1., P. 321.

† স্য মাগধীতে 'শ্‌শ', অন্যান্য প্রাকৃতে 'স্স' হয়।

‡ অন্ত্যস্য হলঃ। প্রাকৃতপ্রকাশ, ৪।৬।

§ সসান্ত প্রাবৃট্‌শরদঃ পুংসি। ঐ, ৪।১৮।

চনা করিবার কারণ কি দেখাইয়াছি। দীনেশ বাবুর যুক্তির উত্তরে ইহা বলিলেই যথেষ্ট যে, সংস্কৃতে চ ও হ উভয়ই ক'এ পরিণত হয়, তবু কোনও প্রাকৃতে চ'এর স্থানে হ বা হ'এর স্থানে চ হয় না। এমন প্রত্যুদাহরণ আরও আছে।

কিন্তু মূলকথাটা শ্রীনাথ বাবুও ভুলিয়াছেন, দীনেশ বাবুও ভুলিয়াছেন। সংস্কৃতে বর্ণ বিশেষের অত্যন্ত সান্নিধ্যহেতু উচ্চারণে তাঁর অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী বর্ণবিশেষ বিকৃত হয় বটে। শুধু পূর্ব্ববর্ণ কেন, অনেক সময়ে পূর্ব্ব পর দুইই বিকৃত হয়। বর্ণ দ্বয়ের এইরূপ সন্নিকর্ষকে সংস্কৃত ব্যাকরণে সংহিতা বা সন্ধি বলে। পূর্ব্বে মুনিরাসীৎ মুনের্ব্বাক্যম্ প্রভৃতি যত দৃষ্টান্ত দিয়াছি, তাহা এই সন্ধিরই দৃষ্টান্ত। শ্রীনাথ বাবুর 'বহির্ভাগঃ' বা দীনেশ বাবুর 'বহির্গত'ও তাই। আমার কথা এই যে, বাঙ্গালার ব্যুৎপত্তি বুঝাইতে সংস্কৃতের এই সমস্ত সন্ধিঘটিত ধ্বনিবিকারের উপর নির্ভর করা যায় না। উচ্চারণে এই সকল বিকার সর্ব্বত্রই স্বাভাবিক বা অবশ্যম্ভাবী কি না, সে বিচার এখানে তুলিব না।(১) বলিয়াছি, প্রাকৃতই সংস্কৃতের প্রথম বিকার। এখানে এই মাত্র বলিলেই যথেষ্ট যে, সেই প্রথম বিকারেই সন্ধির জঞ্জালটা কাটিয়া গিয়াছিল। প্রাকৃত সে দিক্‌ই মাড়ায় নাই। মুনিরাসীৎ বা সাধুরিচ্ছতি প্রকৃতে মুনী আসি বা সাহূ ইচ্ছই হয়। মুনের্ব্বাক্যম্ প্রাকৃতে মুনিনো বা মুনিস্‌স বাকং হয়। স্য-স্থানে র হইবে দূরে থাকুক, ইকারান্ত উকারান্ত শব্দেও মুনিস্‌স সাহুস্‌স! ধনুর্দ্ধরতি বা ধনুর্ভিঃ প্রাকৃতে ধণুং ধরই বা ধণূহিং হয়। যেথানেও বা সন্ধির একটু গন্ধ পাই, সেথানেও তাহা সংস্কৃতের অনুকারী নহে। আশীর্ব্বাদঃ ধনুর্দ্ধরঃ বহির্ভাগঃ বা বহির্গত প্রাকৃতে আসিব্বাদো ধণুদ্ধরো বহিব্‌ভাও বা বহিগ্‌গঅ হয়। প্রাকৃতে স্বরহীন র'ই নাই। সংস্কৃত, প্রাকৃত, অপভ্রংশ, বাঙ্গালা—সে পারম্পর্য্যধারাটা পাঠককে আবার স্মরণ করাইয়া দিই। যে নজীরের বলে বিসর্গ বা স হইতে র করিতে চাই, পাঠক দেখিবেন, বাঙ্গালার মাতামহী বা প্রমাতামহীই সে নজীরটা রদ্ করিয়া লইয়াছিলেন। সংস্কৃতকে সম্মুখে করিয়া বাঙ্গালা জন্মে নাই। বাঙ্গালা যথন জন্মিয়াছিল, তথন সংস্কৃত প্রেত। সম্ভবতঃ যাহাদের মুখে বাঙ্গালা জন্মিয়াছিল, সংস্কৃতের তারা ধারও ধারিত না। র' এর ব্যুৎপত্তি বুঝাইতে বহির্ভাগঃ বা বহির্গত প্রভৃতির দৃষ্টান্ত এই কারণে অসঙ্গত।

একটা বিশ্ববিশ্রুত নামের সহিত সংসৃষ্ট বলিয়াই এ মতটা এত তন্ন তন্ন করিয়া আলোচনা করিলাম। কিন্তু এ পথই নয়। বাঙ্গালার জন্মরহস্য জানিতে হইলে আগে প্রাকৃতের কাছে খুঁজিতে হইবে, সরাসর সংস্কৃতে তাহা পাইবার সম্ভাবনা অল্প। ইহাকেই আমি আরোহি-প্রণালী বলিয়াছিলাম। হর্ণলের প্রণালীও সেই। র' এর ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে দ্বিতীয় মত হর্ণলের। ইংরেজীবিৎ পাঠক বঙ্গদেশীয় আসিয়টিক সোসাইটির ১৮৭২ সালের জর্নালে সে মত সবিস্তার পাঠ করিবেন। কিন্তু আমার সকল পাঠক ইংরেজী জানেন না, অতএব এথানেও তার পরিচয় দেওয়া আবশ্যক।

পূর্ব্ব প্রবন্ধে বলিয়াছি, প্রাকৃতে অনেক

(১) Whitney's Sanskrit Grammar, §§ 103, 115, &.

সময়ে ষষ্ঠীর অর্থে কেরক কোরক প্রভৃতি শব্দ প্রযুক্ত হইয়া থাকে। সর্ব্বনামশব্দে উহা ষষ্ঠ্যন্ত পদের পরেই বসে। যথা মম কেলকাইং গোণাইং (মম গাঃ), অম্হ কেলকে গেহদুআরং (অস্মাকং গেহদ্বারম্), কস্স কেরকং এদং পবহণং (কস্য এতৎ প্রবহণম্)। অন্য শব্দে ষষ্ঠ্যন্তের পরেও বসে, সমাসবৎ মূল শব্দেও যুক্ত হয়। যথা অপ্‌পণো কেরিকং জাদিং (আত্মনঃ জাতিম্) শালকাহ (১) কেলকে উজ্জাণে (শ্যালকস্য উদ্যানম্) পড়িবেসি অগহবই-দারঅকেরিআএ সুবণ্ণসআড়আএ (প্রতিবেশিগৃহপতিদারকস্য সুবর্ণশকটিকয়া), লাঅশালঅশণ্ঠাণকেলকে পবহণে (রাজ-শ্যালকসংস্থানস্য প্রবহণম্। কথাগুলি মৃচ্ছ-কটিকের। মৃচ্ছকটিকের প্রাকৃতেই এই কেরক প্রভৃতির বহুল প্রয়োগ দেখি। অন্যান্য সংস্কৃত নাটকেরও কোন কোন খানাতে আছে, কিন্ত খুব কম। যেমন অভিজ্ঞানম শকুন্তল রত্নাবলী বা মালতী-মাধবে। অনেক নাটকে একেবারে নাই। যেমন, বোধ হয়, উত্তররামচরিতে।

বররুচির প্রাকৃতপ্রকাশে এই কেরক প্রভৃতির কোনও উল্লেখ নাই। কিন্তু হেম চন্দ্রের কালে শব্দটার ভূয়ঃপ্রচার হইয়াছিল বোধ হয়। তাঁর প্রাকৃত ব্যাকরণে এ বিষয়ে এক পৃথক্ সূত্রই আছে। (২) সেখানে ইহার রূপ—কেব়। পূর্ব্ব প্রবন্ধে বলিয়াছি, হেম-চন্দ্রের মতে অপভ্রংশে ঐ শব্দই কেরউ হইত। অপভ্রংশ নামে তিনি সেকালের লৌকিক ভাষাই বুঝিতেন না কি, বলিতে পারি না। কেন না তাঁরই প্রায় সমকালিক চাঁদ বর্দাই এর কাব্যেও শব্দটা আছে—

দৌরৈ গাজ অন্ধং চাহুবান কেরৌ।

চৌহানের হাতী অন্ধ হইয়া ছুটিতেছে। এ তিরৌরী না থানেশ্বর? চাঁদের প্রায় আড়াইশত বৎসর পরে কবীর। কবীরের পদেও আছে—

কো তেরা পুত্র পিতা তূঁ কাকো
মিথ্যা ভ্রম জগকেরো।

কেরউ কেরৌ বা কেরো একই শব্দ।

কবীরের শতবর্ষ পরে তুলসীদাস। তুলসী দাসেও কেরো আছে। তা ছাড়া, কের কেরা কেরে কেরি এবং কেরী আছে। প্রাকৃতে যেমন লিঙ্গভেদে বা বচনভেদে রূপ-ভেদ হইত, এখানেও তাই। পুংলিঙ্গের একবচনে কের বা কেরা, বহুবচনে কেরে। স্ত্রীলিঙ্গে কেরি বা কেরী। আর একটা পরিবর্ত্তন তুলসীদাসের পূর্ব্বেই আরম্ভ হইয়াছিল, কেন না কবীরেও তাহা দেখিতে পাই। কের স্থানে কর হইয়াছে। কাশীর সন্নিকটে প্রচলিত গঁবারী ভাষায় এই 'কর' এখনও পাওয়া যায়। যেমন কেরর বা কেকৈ, একর বা একৈ। অর্থাৎ কার, এর।

পশ্চিম ছাড়িয়া এখন প্রাচীতে যাই। আমাদের বিদ্যাপতি মৈথিল। বিদ্যাপতি তুলসীদাসেরও পূর্ব্বে, কবীরেরই প্রায় সম-কালে। বঙ্গদেশে প্রচলিত বিদ্যাপতির পদে কের কেরা প্রভৃতি নাই। কর'ও আমি তিনটা শব্দ মাত্র পাইয়াছি—যাকর, তাকর, পিয়াকর। মিথিলায় প্রচলিত অন্যান্য পদে এই সকল কি পরিমাণে আছে, বলিতে পারি না। তবে বিদ্যাপতির কালে মৈথিলীতে 'ক'ই ষষ্ঠীর প্রধান বিভক্তি হইয়া

(১) শালকাহ—শ্যালকস্য। ঙসো হো বা দীর্ঘত্বং চ। প্রাকৃতপ্রকাশ, ১১।১২। এইরূপ শুধু মাগধীতে হয়। অন্যান্য প্রাকৃতে—সালকস্স।

(২) ইদমর্থস্য কেরঃ। ২।১৪৭।

দাঁড়াইয়াছিল, এ কথা নিশ্চিত। কের'ও ছিল, বোধ হয়। মিথিলা পর্য্যন্ত কের কর দুইই পাই।

উড়িয়াতে কের নাই, কিন্তু কর আছে। উড়িয়াতে ষষ্ঠীর বহুবচনের বিভক্তি—মানঙ্কর। যেমন ঘরমানঙ্কর (ঘরগুলির)।

তার পর, বাঙ্গালা। বিদ্যাপতিকে আমাদের বলিতে প্রমাণ দিতে হয়। বিদ্যাপতি বাঙ্গালার আদিকবিও নহেন। কেন না, তাঁরও শতাব্দী পূর্ব্বে কৃত্তিবাস। দীনেশ বাবুর অনুমান সত্য হইলে,সেই কৃত্তিবাসেরও প্রায় দুই শত বৎসর পূর্ব্বে মাণিকচাঁদের গীতটার অধিকাংশ গ্রথিত হয়। কিন্তু এ দুয়েতে কোথাও কের বা কর নাই। ইহা'দের প্রায় সর্ব্বত্রই ষষ্ঠীর চিহ্ন—র। কম পক্ষেও তবে সাতশত বৎসর হইল, বাঙ্গালায় এই র বিভক্তিটা আসিয়াছিল। আজিও তাই আছে। উড়িয়াতেও ষষ্ঠীর একবচন —র। যেমন ঘরর (ঘরের)। মাণিকচাঁদের গীতেও এইরূপ পদ আছে। যেমন রূপর, চরণর। বিদ্যাপতির মৈথিলীতেও মোর হামার তোর তোহর তোহার প্রভৃতি র যুক্ত ষষ্ঠ্যন্ত পদ পাওয়া যায়। তা ছাড়া পিয়ার হিয়ার সখীর প্রভৃতিও আছে। কিন্তু সে গুলি খাঁটি বিদ্যাপতির হইলে বাঙ্গালারই দেখা দেখি গড়া হইয়াছিল মনে হয়। কেন না, খাস্ মৈথিলীতে সর্ব্বনাম ছাড়া অন্য শব্দে ষষ্ঠীর এই র বসিত, বোধ হয় না। সব সর্ব্বনামেও বসিত কি না সন্দেহ। হিন্দী বা উর্দ্দুতেও এই ষষ্ঠীর র আছে। এখন তাহা বারটা পদে মাত্র পাওয়া যায়—মেরা-রে-রী, হমারা-রে-রী, তেরা-রে-রী, তুম্‌হারা-রে-রী। কিন্তু প্রাচীন উর্দ্দুতে অন্যত্রও বসিত। মেঘরাগের এক প্রসিদ্ধ ধ্রুপদে আছে—

সলিতা গহর ভরে যেন প্রমাণ
উছল চলত তীখে বারপার মগমুদে
পাতি সন্দেহরা উপজত ঞনতাহি।

আধুনিক উর্দ্দুতে 'সন্দেহরা' র-স্থানে সন্দেহকা হইত।

প্রকৃত বিষয় হইতে কিছু দূরে আসিয়া পড়িয়াছি। বাঙ্গালায় এই ষষ্ঠীর র ত্রিবিধ যোগে দেখিতে পাই। প্রথম, এর। যেমন কুলের, বংশের, মায়ের, ভাইএর, বউএর। দ্বিতীয়, অরবার। যেমন মাণিকচাঁদের গীতে জীবর, রঙ্গর, পুরুসর, সিদ্ধার, পাথার; অন্যত্র বিদ্যার, সরস্বতীর, সাধুর, মেঝ্যের, গোক্‌লোর। তৃতীয়, আর। যেমন সবার, আপনার, আমার; মাণিকচাঁদের গীতে পরার। হর্ণলের মত, কের ও কর হইতেই এই এর ও অর আসিয়াছে। কের ও কর দুই বিভিন্ন ধারায় বিকৃত হইয়াছিল। এক, র'এর লোপে। (১) তাহাতে কেঅ এবং কঅ হয়। কেঅ হইতেই সম্ভবতঃ প্রাচীন হিন্দী ও আধুনিক গঁ-বারীর কে বা কৈ এবং কঅ হইতে মৈথিলী ও আধুনিক হিন্দীর ক কা' প্রভৃতি আসিয়া থাকিবে। ষষ্ঠীর এই ক কচিৎ প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যেও (২) পাওয়া যায় এবং পূর্ব্ববঙ্গের বহু স্থানে এখনও প্রচলিত আছে। বিকা-

(১) কর্পূরমঞ্জরী হইতে হর্ণলে দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন, "অকলি অপইরন্তবিবভমাইং"। পাইরন্ত—পরিরক্ত। কিন্তু কের বা কর হইতে কে বা ক হইবার আরও একটা সম্ভবপর কারণ আছে। এখানে আর তাহা বলিলাম না।

(২) বাঙ্গালা বৈষ্ণবকাব্যের ক বোধ হয় ব্রিজ-বোলি বা মৈথিলীর নকল। কিন্তু তা ছাড়াও ক আছে। দীনেশ বাবুর দত্ত "ভীমক ডরে যত সৈন্য যায় পলাইয়া" দেখুন।

রের দ্বিতীয় ধারা, ক'এর লোপে। তাহাতে এর বা অর হয়। হিন্দী, উর্দু, উড়িয়া বা বাঙ্গালার র'এর বীজ সেই।

কের বা কর হইতে ক'এর লোপ অসম্ভব নহে। সংস্কৃত শব্দের মধ্যগত অসংযুক্ত ক প্রাকৃতে প্রায়ই লুপ্ত হয়। (১) যেমন নউলং (নকুলম্), মহুঅরো (মধুকরঃ), সহআরো (সহকারঃ। মৃচ্ছকটিকে আছে, অহং চন্দণও চম্মারও (অহং চন্দনকঃ চর্ম্মকারঃ)। প্রাকৃতের ক'ও অপভ্রংশে এইরূপে লুপ্ত হইয়া থাকিবে, বিচিত্র নহে। হর্ণলের সাতশত বৎসর পূর্ব্বে হেমচন্দ্রের মনেও কথাটা জাগিয়াছিল বোধ হয়। কেন না, তাঁর মতে প্রাকৃত অম্হ কেরো এবং তুম্হ কেরো অপভ্রংশে অম্হহং কেরউ বা অম্হারা এবং তুম্হহং কেরউ বা তুম্হারা হয়। (২) অম্হ কেরো=অম্হ করো=অম্হ অরো=অম্হারো বা অম্হারা, বা বঙ্গালাতে আমার উড়িয়াতে অম্হর। অথবা, অম্হ কেরো=অম্হ কারো=অম্হ আরো=অম্হারো বা অম্হারা, বাঙ্গলাতে আমার। সেইরূপ তুম্হ কেরো হইতে তুম্হারো বা তুম্হারা এবং বাঙ্গালাতে তোমার। (৩) কের হইতে কার সহজেই জন্মিতে পারে। 'এ' হইত 'অ্যা'—'অ্যা' হইতে আর একটু সরিলেই 'আ' হয়। কার হইতে 'আর'। বাঙ্গালার ষষ্ঠীতে যে শুধু 'র' ব্যবহৃত হয়, তাহাও এর বা অর'এরই অবশেষ। 'র' কেবল স্বরান্তশব্দের পরেই বসে। এক স্বরের অব্যবহিত পরে আর একটা স্বর উচ্চারণ করিতে একটু বাধো-বাধো ঠেকে। এই স্বরপ্রশ্লেষ (৪) দূর করিবার জন্যই কালে স্বরান্ত শব্দের পরস্থিত এর বা অর'এর এ বা অ লুপ্ত হইয়াছে। অনেক স্থলে এখনও তার চিহ্ন পাই। যেমন মাএর বা মার, ঝিএর বা ঝির। দুই রূপই প্রচলিত।

তা হিন্দী প্রভৃতিতে কের কর আছে, সেখানে নয় তো হর্ণলের মত মানিয়া লইলাম। কিন্তু বাঙ্গালার ষষ্ঠীও যে কের হইতে আসিয়াছে, তার প্রমাণ কি? তারও প্রমাণ আছে। আজকের, কালকের, কতকের, যতকের প্রভৃতি এখনও প্রচলিত। মাণিকচাঁদের গীতে কের বা কর নাই, কিন্তু কার আছে। যথা কোটেকার (কোথাকার)। (৫) মৃচ্ছকটিকের 'অপপণো কেরিকং এবং বাঙ্গালার 'আপনকার' মিলাইয়া দেখুন। আপনকার হইতেই আবার 'আপনার' হইয়াছে। কবেকার, কখনকার, কোন্ খানকার, কোথাকার, সেখানকার, সেদিনকার, গেলবছরকার, উপরকার, নীচেকার প্রভৃতিও দেখাইতে পারি। এ সকল যেমন ব্যবহৃত হয়, তেমনই আবার এখানের, সেদিনের, উপরের প্রভৃতিও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। পূর্ব্ববঙ্গে কবের কোন্খানের'ও বলে। প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যেও দোঁহাকার দোঁহার, সবাকার সবার, দুইই পাই। শেষ হিন্দী মৈথিলী উড়িয়া বাঙ্গালা সহোদর না হইলেও সপিণ্ডা, পাঠক সে কথটা ভুলিবেন না।

(১) কগচজতদপযবাং প্রয়োলোপঃ। প্রাকৃতপ্রকাশ, ২।২।

(২) ৪।৪৩৪।

(৩) আমার তোমার, মূলে দুই ই বহুবচন।

(৪) Hiatus.

(৫) কোটে=কোন্‌টে=কোন্‌ঠেঁ=কোন্ ঠাঁএ। প্রাকৃতে স্থানশব্দ ঠাণ হয়। ঠাণে=ঠাঁএ। এখনও বলি—আমার ঠেঁ, তার ঠেঁ। অর্থাৎ আমার কাছে বা আমার কাছ থেকে, তার কাছে বা তার কাছ থেকে। ঠেঁ'র স্থানে পূর্ব্ববঙ্গে ডে হইয়াছে। প্রাচীন বাঙ্গালায় ঠাঁঞি ছিল।

এখন এ সকলের যাহা মূল; সেই কেরক বা কের কোথা হইতে আসিল? হর্ণলে বলেন, 'কৃত' হইতে। কৃত প্রাকৃতে কিদ কিঅ কদ কত কঅ বা কড় (১) হয়। কড় হইতে কের হইয়া থাকিবে। কিন্তু এ ব্যাখ্যা মনোরম নহে। কৃত হইতে কের আসিয়াছে বলিলে অর্থেও বড় কষ্টকল্পনা করিতে হয়। বস্তুতঃ এ মতে ১৮৭২ সালে হর্ণলের যে দাঢ্য ছিল, ১৮৮১ সালে (২) আর যেন সে দাঢ্য দেখি না। তখন তিনি ভারতবর্ষীয় পুরাতন জনবাদের উপরও নির্ভর করিয়াছেন! কেরক'এর মূল এখনও অনিশ্চিত।

কিন্তু তাহাতে প্রধান সিদ্ধান্তের হানি নাই। বলিয়াছি, এ আরোহিপথে যতটুকু উঠিতে পারি, ততটুকুই লাভ। আর কয়েকটা পদের ব্যুৎপত্তি দেখাইয়া হর্ণলের মত সম্পূর্ণ করি। অস্মদ্ এবং যুস্মদ্'এর ষষ্ঠীর একবচনে প্রাকৃতে মহ এবং তুহ হয়। মহ চাঁদের কাব্যেও আছে—

মহ সগগন সা করিহি স্তু কেমং। আমার সখীত্ব সে করিবে কিরূপে? বিদ্যাপতিতে মোহি আছে। অন্ত্য অকার লুপ্ত হইলে মহ্ ও তুহ্ হয়। বিদ্যাপতিতে মো এবং তো আছে—

তৈখনে করব মো চেতনে।

* * *

রামা হে তো বড়ি কঠিন দেহ।

বিদ্যাপতিতে তু'ও আছে। 'তুয়া' তো কত আছে, তার সংখ্যা নাই। প্রাকৃতে মহ ও মহ কেরো, দুয়েরই এক অর্থ। মহ কেরো = মহ কর = মহ অর = মহর। কবীন্দ্রের মহাভারতে মোহর এবং সঞ্জয়ের মহাভারতে মোহোর আছে। ইহা হইতেই হকারলোপে (৩) 'মোর'। এইরূপে তুহকেরো হইতে তুহর। বিদ্যাপতিতে তোহর আছে। তা হইতেই 'তোর'। প্রাকৃতে তদ্‌শব্দ ষষ্ঠীর একবচনে তস্‌স তাস বা তাহ (৪) হয়। তাহ কেরা = তাহা কর = তাহ আর = তাহর বা তাহার। পক্ষান্তরে হকার লোপে, তাহকর = তাকঃ। তাহর বা তাকর হইতে 'তার'। এইরূপে যাহার যার, কাহার কার। প্রথমার একবচনে অদস্ শব্দ প্রাকৃতে তিন লিঙ্গেই অহ(৫)হয়। তাহ জাহ প্রভৃতির দেখাদেখি প্রথমান্ত অহ হইতেও বোধ হয় অহর বা আহার এবং অকর জন্মিয়াছিল। আহার হইতে ওহার বা উহার, এবং অহর বা অকর হইতে অর বা ওর আসিয়াছে। 'অস্য' হইতে অর হইতে পারে না। ওহার বা ওআর এবং অর পূর্ব্ববঙ্গে প্রচলিত আছে। এতদ্ শব্দ পুংলিঙ্গে প্রথমার একবচনে প্রাকৃতে এসো বা এস হয়। ক্রমদীশ্বরের মতে অপভ্রংশে তাহা তিন লিঙ্গেই 'এহ' হয়। (৬) এহ হইতেও এহর বা এহার এবং একর। এহার বা এআর পূর্ব্ববঙ্গে ও একর গঁবারী ভাষায় প্রচলিত আছে। এহার হইতে

(১) কৃকমৃঙগমাং স্তস্য ডঃ। প্রাকৃত-প্রকাশ, ১১।১৫।

(২) সেই বৎসর হর্ণলের Comparative Grammar প্রকাশিত হয়।

(৩) Spiritus asper প্রথম হয়ত Spiritus lenis হইয়াছিল। কালে তাও গিয়াছে।

(৪) যেমন, শালকাহ। শালকাহ পূর্ব্বে বুঝাইয়াছি।

(৫) হশ্চ সৌ। প্রাকৃত-প্রকাশ, ৬।২৪।

(৬) এহাদিরেতদস্ত্রিসমঃ। সংক্ষিপ্তসার, প্রাকৃতপাদ, অপভ্রংশারম্ভ, ৮ সূঃ।

'ইহার' এবং এহর বা একর হইতে 'এর'। অথবা ইহার' এর মূল ইদম্‌শব্দও হইতে পারে। অহ এহ'র দেখাদেখি 'ইহ' ও চলিয়া থাকিবে।

তৃতীয় মত দীনেশ বাবুর। প্রাকৃতে ষষ্ঠী বহুবচনের বিভক্তি ণং বা ণ। দীনেশ বাবুর মতে, এই ণই বাঙ্গালায় 'র' হইয়াছে। এরূপ ধ্বনিবিকার অসম্ভব নয়। ণকার রকার, উভয়ই মূর্দ্ধন্য। ণএর ধ্বনিতে ড় বা র' এরও একটু আমোদ আছে। ণ হইতে প্রথম বোধ হয় ড়ঁ, ড়ঁ হইতে পরে ড় বা র। উড়িয়াদের মুখে এখনও ঐ ড়ঁ ধ্বনি শুনা যায়। চরণ বলিতে তারা চড়ঁর বলে। বাঙ্গালায়ও দৃষ্টান্ত আছে। রণ (১) = রড় = লড়। প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে 'রড়ে' পাওয়া যায়। মাণিকচাঁদের গীতে লহড় এবং পূর্ব্ববঙ্গে এখনও লড় শব্দ আছে। তার অর্থ—দৌড়। হিন্দীতে লড়না ধাতুর অর্থ দৌড়ান নয়, যুদ্ধ করা। যুদ্ধবাচী রণশব্দও গত্যর্থক বা শব্দার্থক রণ ধাতু হইতেই আসিয়াছে। ছিন্ন = ছিন্ন = ছিণ্ণ = ছিঁড়া। মহাভাষ্যকার বলেন, গোশব্দের একটা অপভ্রংশ গোণী। (২) মৃচ্ছকটিকের প্রাকৃতে ঐ শব্দটাই পুংনপুংসক লিঙ্গে আছে—প্রথমার একবচনে গোণা, দ্বিতীয়ার বহুবচনে গোণাইং। মূলশব্দটা তবে বোধ হয়—গোণ। ক্রমদীশ্বরের মতে গোণশব্দ অপভ্রংশে প্রথমার এক বচনে'গোণু'হয়। (৩) গোণু হইতেই 'গোরু'। অন্ত = অন্ন = আণ = আন বা আর। আর'এর এই ব্যুৎপত্তি শ্রীনাথ বাবুও মঞ্জুর করিয়াছেন। ণ হইতে র হওয়া অসম্ভব নয়।

কয়েকটা পদের ব্যুৎপত্তি এই মতেই বুঝা যায়, হর্ণলের মতে তাহা বুঝাইতে পারি না। পূর্ব্বপ্রবন্ধে বলিয়াছি, প্রাকৃতে যদ্ ও তদ্ ষষ্ঠীর বহু বচনে জাণ ও তাণ হয়। এই জাণ হইতেই জাঁর অর্থাৎ যাঁর এবং তাণ হইতে তাঁর আসিয়াছে। চন্দ্রবিন্দুটা 'কাহারও মনগড়া নহে। উহা ঐ বিলুপ্ত অনুনাসিকেরই অবশেষ। যেখানে যেখানে অনুনাসিক বিকৃত হইয়াছে, তার সর্ব্বত্রই বোধ হয় প্রথমে এইরূপ চন্দ্রবিন্দু ছিল। কালে অনেক শব্দেই তাহা ক্ষীণ বা বিলীন হইয়াছে। কেবল যেখানে নিশানা না থাকিলে সদৃশ শব্দের সহিত গোল হয়, সেখানে কিছু পরিস্ফুট আছে। যেমন হাস হাঁস; সাজ সাঁজ। সেইরূপ যার যাঁর, তার তাঁর। যাঁর তাঁর'এর অর্থ পূর্ব্ব প্রবন্ধে বুঝাইয়াছি। ইহাদের রূপান্তর যাঁহার তাঁহার। এই হা'এর উৎপত্তি তিন প্রকারে বুঝান যায়। প্রথম, হয়ত ইহা আস্থানিক মাত্র—স্বরের অস্বাভাবিক বল বৃদ্ধিতে জন্মিয়াছে।(৪) যেমন,' এথা'হইতে হেথা, প্রাচীন বাঙ্গালায় কখন কখন 'কোন' হইতে কোহ্ন, 'বিনে' হইতে বিহনে। বিন্দুহীন যাহার তাহার'এর হা'ও বিন্দুহীন যার তার হইতে এইরূপে জন্মিয়া থাকিবে, বিচিত্র নহে। অথবা পূর্ব্বে যেরূপ বলিয়াছি, বিন্দুহীন যাহার তাহার যদি সেইরূপেই জন্মিয়া থাকে, তবে হয়ত তারই দেখাদেখি বিন্দুযুক্ত যাঁর তাঁর'ও যাঁহার তাঁহার হইয়াছে। অথবা প্রাকৃতে দেখি,

(১) কণ রণ গতৌ। ভ্বাদিঃ।

(২) মহাভাষ্যে ১ অ. ১ পা. ১ আ.।

(৩) অতা ঘমোরুন্ধা। সংক্ষিপ্তসার, প্রা. অপ. ২২ সূ.।

(৪) স্বরের সঙ্গে প্রথম প্রথম বোধ হয় Spirittus lenis পরে Spiritus asper.

ষষ্ঠ্যেক বচনান্তে পদের পরেও ষষ্ঠী বহুবচনের বিভক্তি বসে। যেমন মহাণ, মজ্ঝাণ, তুহাণ, তুজ্ঝাণ। মহ, মজ্ঝ, তুহ, তুজ্ঝ—এ সকলই ষষ্ঠীর একবচন। ইহাদের দেখাদেখি ষষ্ঠ্যেকবচনান্ত জাহ তাহ হইতেও ষষ্ঠীর বহুবচনে জাহাণ তাহাণ হইয়া থাকিবে। জাহাণ=জাহাঁর, তাহাণ=তাহাঁর। কালে চন্দ্রবিন্দুটা মধ্য হইতে আদিতে গিয়াছে। এখানেও র'এর বীজ 'ণ', বিন্দু অনুনাসিকের প্রতিনিধি। এ পক্ষেও দীনেশ বাবুর শরণ লইতে হয়। যাঁর যাঁহার তাঁর তাঁহার—হর্ণলের মতে এ চন্দ্রবিন্দু বুঝাইতে পারি না।

কোথায় দীনেশ বাবুর মত অবশ্যগ্রাহ্য, দেখাইলাম। কিন্তু সকল স্থলে তাহা সমীচীন বোধ হয় না। না হইবার প্রধান কারণ এই যে, ণ বহুবচনের বিভক্তি। হিংতো যেমন গোড়ায় বহুবচন হইলেও অর্ব্বাচীন প্রাকৃতে (১) এক বচনেও বসিতে দেখি, ণ'এর সম্বন্ধে আমি সেরূপ কোনও প্রমাণ পাই নাই। তা না পাইলে দীনেশ বাবুর মতও সর্ব্বত্র গ্রহণযোগ্য হয় না। 'আমার' 'তোমার' মূলে বহুবচন হইলেও এখন একবচন বটে। কিন্তু ইহাদের কথা স্বতন্ত্র। অস্মদ্ শব্দে একবচন বা দ্বিবচনের স্থানে সংস্কৃতেও বহুবচন হইত।(২) প্রতিযোগিভাবে অস্মদ্‌এর সহিত নিত্যসংসৃষ্ট বলিয়াই বোধ হয় যুস্মদ্‌এও পরে ঐরূপ প্রয়োগ চলিয়াছে। কিন্তু সকল স্থলে Analogy ধরিলে বড় কল্পনাগৌরব হয়। হর্ণলের মতে তাহা আবশ্যক নহে। যাঁর তাঁর প্রভৃতি ছাড়া অন্যত্র হর্ণলের মতই শ্রেয়ঃ।

(১) আর্যপ্রাকৃত ও অর্দ্ধমাগধীতে।

(২) অস্মদো দ্বয়োশ্চ। পাণিনি, ১।২।৫৯।

দ্বিতীয়া ও চতুর্থী বিভক্তি বাঙ্গালায় একরূপ—কে, রে, বা এ। অনেক স্থলে কর্ম্মে বিভক্তিই নাই। প্রাকৃতে দ্বিতীয়ার একবচন ছিল অনুস্বার। তার লোপেই বাঙ্গালা কর্ম্মের এই নগ্ন রূপ। কালে বিভক্তিশূন্য কর্ত্তা হইতে এই বিভক্তিশূন্য কর্ম্মকে পৃথক্ করিবার জন্যই ঐ 'এ' বিভক্তিটা (৩) জন্মিয়া থাকিবে। সংস্কৃতের ঙে বিভক্তির সহিত ইহার কোনও সম্পর্ক নাই। ঙে প্রাকৃতেই উঠিয়া গিয়াছিল। রে'র এ'ও এইরূপে আসিয়াছে। পূর্ব্ব প্রবন্ধে দেখাইয়াছি, ষষ্ঠীর র দ্বিতীয়া বা চতুর্থীতেও বসিত এবং কচিৎ এখনও বসে। ষষ্ঠীর সাধারণ অর্থ হইতে এই সকল বিভক্তির অর্থ বিশিষ্ট করিবার জন্য এখানেও 'এ' আসিয়াছে। কে'র এ'ও এইরূপ। মাণিক চাঁদের গীত, সঞ্জয় ও কবীন্দ্রের মহাভারত প্রভৃতি প্রাচীন রচনায় দ্বিতীয়া বা চতুর্থী অনেক স্থলেই শুধু 'ক'। ক আবার ষষ্ঠীরও বিভক্তি। তা শুধু হিন্দী বা মৈথিলীতে নয়, কচিৎ প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যেও আছে, দেখিয়াছে। পূর্ব্ববঙ্গের অনেক স্থানে এখনও ষষ্ঠীর বহুবচনের বিভক্তি ক বা গ। যেমন আমাক (গ), তোমাক (গ), তাক (গ), ব্রাহ্মণক (গ)। (৪) অর্থাৎ আমাদের, তোমাদের, তাদের, ব্রাহ্মণদের।

(৩) দীনেশ বাবুর ধৃত জনার্দ্দন কবির দুইটা চরণ এই—

…ব্রতের বিধান সর্ব্ব ব্রতীএ কহিল।
দিব্য বস্ত্র অলঙ্কারে সাধুএ তুষিল।

জনার্দ্দিনে কে, রে'ও আছে।

(৪) আর এক রূপ—আমারক্ (গ), তোমারক্ (গ) তারক্ (গ), ব্রাহ্মণেরক্ (গ)। ঐ সকল স্থানে দ্বিতীয়া এবং চতুর্থীরও ঠিক্ এই দুই রূপ।

এখানেও তবে দ্বিতীয়া চতুর্থীর নির্দ্ধারণ চাই। অথবা 'কে' ই আদিম রূপ। তাও অসম্ভব নয়।(১)

কিন্তু পূর্ব্ব মতে কে'র ক কোথা হইতে আসিল? দীনেশ বাবু ও শ্রীনাথ বাবুর মত, সংস্কৃতেঃ স্বার্থিক ক প্রত্যয় হইতে। প্রমাণ-স্থলে দীনেশ বাবু বলেন, অর্ব্বাচীন সংস্কৃতে বৌদ্ধগাথায় এবং প্রাকৃতে এই স্বার্থিক ক'এর ভূরি প্রয়োগ হইত। কিন্তু তাহাতে সিদ্ধান্ত হয় না। এই ক যে কেবল দ্বিতীয়াতেই প্রযুক্ত হইত, এমত নহে। দীনেশ বাবুর ধৃত ললিতবিস্তরের গাথায়ই ক যেমন দ্বিতীয়াতে আছে, তেমনই আবার প্রথমা বা সপ্তমীতেও আছে। আর নিজেও তিনি স্বীকার করিয়াছেন, "'ক' পূর্ব্বে বিভক্তি-বোধক চিহ্ন বলিয়া পরিগণিত ছিল না, উহা শুধু শব্দের অন্ত্যবর্ণ ছিল।"

বীমস্ ও হর্ণলের মতে, 'কক্ষে' হইতে কে আসিয়াছে। কক্ষে—কক্‌খে—কক্‌খহুঁ—কহাহুঁ—কহি—কহে এই রূপে নাকি সম্ভবতঃ শেষে বাঙ্গালায় 'কে'। এরূপ ধ্বনি-বিকারই অসম্ভব, এমত বলি না। কিন্তু চাঁদ ও তুলসী দাসের কতকগুলি সংদিগ্ধ পদ ছাড়া এ মতের কোনও প্রকৃষ্ট প্রমাণও নাই।

ভাষাতত্ত্বে অনেক আন্দাজ চলে। আমিও একটা আন্দাজ করিতে পারি। সংস্কৃতে সম্বন্ধমাত্রাবিবক্ষায় ষষ্ঠী হয়। তার অর্থ এই। ক্রিয়ার সহিত কারকের সম্বন্ধ আছে। সকল কারকেই আছে বলিয়া এ সম্বন্ধ সাধারণ। কিন্তু ক্রিয়ার সহিত কর্ম্মকরণ প্রভৃতি এক এক কারকের এক একটা বিশিষ্ট সম্বন্ধও আছে। এ সম্বন্ধ সাধারণ নহে, কেন না, এরূপ সম্বন্ধ সেই একটা কারকেই আছে, আর কোনও কারকে নাই। ভাষায় এই সকল বিভিন্ন সম্বন্ধ বিশেষ করিয়া বুঝাইবার জন্য বিভিন্ন বিভক্তি বসিয়া থাকে। যেমন সংস্কৃতে কর্ম্ম বুঝাইতে দ্বিতীয়া, করণ বুঝাইতে তৃতীয়া, ইত্যাদি। কিন্তু যেখানে ক্রিয়ার সহিত কিছুর সম্বন্ধ আছে, এই টুকু মাত্র বুঝাইতে চাই—কিন্তু কি সম্বন্ধ, তা আর অত খুলিয়া বলিতে চাই না, কেন না, না বলিলেও তাহা বুঝা যাইবে, সেখানে সকল কারকেই ষষ্ঠী হইতে পারে। কর্ম্ম বুঝাইতে মাতরং স্মরতি না বলিয়া মাতুঃ স্মরতি, বা ভজে শম্ভোশ্চরণৌ না বলিয়া ভজে শম্ভোশ্চরণয়োঃ বলিতে পারি। বেদের অসংখ্য স্থলে চতুর্থীর স্থানে ষষ্ঠী আছে। (২) সম্বন্ধমাত্রবিবক্ষায় কর্ম্ম প্রভৃতিতেও ষষ্ঠী হয়।

ইহাতে ভাষা কিছু সোজা হইল। ভাষা যখন বিকৃত হইতে থাকে, তখন সোজা পথটাই বাছিয়া লয়। প্রাকৃত এইরূপে সংস্কৃতের চতুর্থী বিভক্তিটা একেবারে তুলিয়া দিয়াছিল। পালি, মহারাষ্ট্রী প্রভৃতি কোনও প্রাকৃতে চতুর্থী নাই। চতুর্থীর স্থানে ষষ্ঠী বসে। ব্রাহ্মণায় ধনং দদাতি প্রাকৃতে বহ্মণস্‌স্ ধনং দেই হয়।

বলিয়াছি, ষষ্ঠীর অর্থে প্রাকৃতে

(১) মৃচ্ছকটিকের প্রাকৃতে একটা 'কে' দেখিয়া দীনেশ বাবু বুঝিয়াছেন, প্রাকৃতেও আমাদের দ্বিতীয়ার 'কে' টা ছিল। কিন্তু সেখানে 'চারুদত্তাকে' দ্বিতীয়ান্ত নহে, প্রথমান্ত। বাচ্যও সেখানে কর্ম্ম নয়, কর্ত্তা। যে প্রাকৃতে ঐ কথাটা রচিত, তার নাম মাগধী। মাগধীতে অকারান্ত শব্দের পরে প্রথমার একবচনে 'এ' হয়। প্রাকৃত-প্রকাশ, ১১।১০। চারুদত্তাকে = চারুদত্তকঃ। পুত্তে = পুত্রঃ।

(২) এজন্য পাণিনিকে একটা পৃথক্ সূত্র করিতে হইয়াছে—চতুর্থ্যর্থে বহুলং ছন্দসি (২।৩।৬২)।

কেরক বা কের হইত। অর্ব্বাচীন প্রাকৃতে এই কেরটার ভূরি প্রচার হইয়াছিল, এইরূপ বিবেচনা করিবারও কারণ আছে। আমার বোধ হয়, কালে অবশেষে সর্ব্ববিধ ষষ্ঠীর স্থানেই কের প্রযুক্ত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। তাহাতে বহ্মণস্স ধনং দেইর স্থানেও বহ্মণকেরং ধনং দেই হইত। বহ্মণকেরং—বহ্মণকেরঃ—বহ্মণকে—এইরূপে ক্রমে বাঙ্গালার চতুর্থীতে 'বামনকে' হওয়া অসম্ভব নহে। আর যেখানে কেঃ হইতে কর হইয়াছিল, সেখানে চতুর্থীর রূপও কে নহে, ক। সঞ্জয়ের মহাভারত প্রভৃতিতে এই ক'ই বেশী, কে কম। পূর্ব্ববঙ্গের অনেক স্থানে ষষ্ঠী চতুর্থী দুয়েরই বহুবচনের বিভক্তি ক বা গ। যেমন আমাক (গ) বাড়ী, আমাক (গ) দিবে। অর্থাৎ আমাদের বাড়ী, আমাদিগকে দিবে। আমাক (গ) ইহার আর একরূপ আমার্ক (গ)। বোধ হয়, আমাকর্ বা আমাগর্ হইতেই বর্ণবিপর্য্যয়ে আমারক্ বা আমার্গ হইয়াছে। বামনকে দেয় বা বামনকে বলে যদি হইল, তবে তার সঙ্গে সঙ্গে 'বামনকে মারে' 'বামনকে ধরে' প্রভৃতিও আসিতে পারে। কালে সম্প্রদানকেও কর্ম্ম ভাবিয়া বিশুদ্ধ কর্ম্মেও সম্প্রদানের মত বিভক্তি প্রযুক্ত হইয়া থাকিবে। সংস্কৃতে যে ধাতুগুলিকে দ্বিকর্ম্মক বলি, তাহাদের অনেকের অপ্রধান কর্ম্মটা বস্তুত: সম্প্রদান মাত্র।

কিন্তু দ্বিতীয়ার কে বা ক প্রকারান্তরেও বুঝান যায়। প্রাকৃতে সম্প্রদান ছাড়া অন্যত্রেও সম্বন্ধ মাত্র বিবক্ষয়ে ষষ্ঠী হয়। যথা—

আধ সুহেইদে ণলিনী পওবাও
(অপি সুখয়তি স্বাং নলিনীপত্রবাতঃ)।

পণম ভঅবদীণং
(প্রণাম ভগবতীঃ)।
ণ সে বিসসসোমি
(ন তৎ তস্মিন্ বা বিশ্বসিমি)।
বা তস্স দংসইসসাদিত্তি
(সা তং দর্শয়িষ্যতীতি)।

ণহু সো উবরদো জসস বল্লহো স্মরোদি
(নহি স উপরতো যং বল্লভঃ স্মরতি)।

অতএব এ সকল স্থলেও ষষ্ঠীর অর্থে কের প্রযুক্ত হইয়া পূর্ব্বোক্ত রূপে কে বা ক আসিতে পারে। আবার কৃৎ প্রত্যয়ের যোগে কর্ম্মে ষষ্ঠী হয়। ভানোঃ সেবা—এখানে ভানু কর্ম্ম। ভানোঃ প্রাকৃতে ভাণুস্স্ ভাণুণো বা ভাণুকেরা হইত। ভাণুকেরা হইতে ভাণুকেঃ বা ভাণুকর। প্রথমার বিকারে ভানুকে, দ্বিতীয়ার বিকারে 'ভানুক'। দুইই কর্ম্ম। ভানুকে সেবা বা ভানুক সেবা হইতে শেষে ক্রিয়াপদও জন্মিতে পারে। * বিদ্যাপতিতে আছে—

কহয়ে চলয়ে ধনী ভানুক সেবি।

বিদ্যাপতির ভাষায় ষষ্ঠী ও ক। দীনেশ বাবুর ধৃত সঞ্জয়ে আছে—

সে সে ভার্য্যা অনুক্ষণ পতিক সেবয়।

বাঙ্গালায় ষষ্ঠীতে ক আছে। অথবা, ভানুকে সেবা বা ভানুক সেবা প্রভৃতির সহিত কৃ ধাতু যুক্ত হইতে পারে। আমরা বলি ভানুকে সেবা করি, পতিকে সেবা করে। এ সকল স্থলে কর্ম্মত্ব পরিস্ফুট। পক্ষান্তরে আবার ভানুর সেবা করি, পতির সেবা করে, এরূপও বলিয়া থাকি। এখানে কর্ম্মত্ব কিছু ম্লান। কিন্তু যখন বলি, ভানুরে, সেবা করি, পতিরে সেবা করে, তখন আবার তাহা পরিস্ফুট হয়। ভানুর বা ভানুরে,

* Sayce, l. c. Vol. II. p. 331 দেখুন।

পতির বা পতিরে—বস্তুতঃ কিন্তু একই, কোনও প্রভেদ নাই। কবীন্দ্রের "ভীষ্মক ভয়ে" = ভীষ্মের ভয়ে। ক্রিয়াযোগে কবীন্দ্রই বলিতেন, ভীষ্মকে ভয় করে। তখন কর্ম্মত্বে (১) সংশয় থাকিত না। আমরা বলি, ভীষ্মকে ভয় করে, ভীষ্মের ভয় করে, ভীষ্মেরে ভয় করে। দ্বিতীয় বাক্যটায় কর্ম্মত্ব কিছু প্রচ্ছন্ন, আর দুইটায় পরিস্ফুট। এইরূপ অন্যত্রে বাঙ্গালার চতুর্থী ও দ্বিতীয়া মূলে ষষ্ঠীরই রূপ মাত্র। তিনেরই মূল প্রাকৃতের কের।

এ ধারণা আমার আরও এক কারণে জন্মিয়াছে। সংস্কৃত মূলক অনেক আধুনিক ভাষায়ই দেখি, ষষ্ঠী চতুর্থী ও দ্বিতীয়ার রূপ এক অথবা প্রায় এক। যেখানে বিসদৃশ, সেখানেও তার সমস্তই হয় ণ নয় কের হইতে বুঝান যায়। হিন্দী বা মৈথিলীতে ঐ তিন বিভক্তিই এখন ক-যুক্ত—কা, কে, কী কো বা ক বলিয়াছি, প্রাকৃতে অস্মদ্ ও যুষ্মদ্ ষষ্ঠীর একবচনে মহ বা মজ্ঝ এবং তুহ বা তুজ্ঝ হয়। বিদ্যাপতিতে মোহি মোহে মোর মো বা মঝু, এবং তুয়া তু বা তো আছে। বিদ্যাপতির দ্বিতীয়া এবং চতুর্থীও মোহে মোয় বা মুঝে, এবং তোহে (২) তোর বা তোই। হিন্দীতে তুঝেও আছে। সকলেরই মূল মহ বা মজ্ঝ, তুহ বা তুজ্ঝ। উড়িয়ার ষষ্ঠী র এবং কর, দ্বিতীয়া কু। কু, হিন্দীর কো এবং মৈথিলীর ক মূলে একই। মরাঠীতে ষষ্ঠী চা, দ্বিতীয়া ও চতুর্থী লা বা লৈ। ণ = ড় = ল। হর্ণলে দেখাইয়াছেন, হিন্দী কা'এরই ধ্বনি বিকারে চা। দ্বিতীয়া ও চতুর্থী প্রাচীন হিন্দীতে নেঁ বা নৈঁ, গুজরাটীতে নে, মারবারীতে নৈ, পাঞ্জাবীতে নূঁ। এ সকলেরই বুনিয়াদ্ বোধ হয় প্রাকৃত ষষ্ঠীর ণ। বাঙ্গালার ষষ্ঠী—র। বাঙ্গালায় দ্বিতীয়া বা চতুর্থীরও একটা রূপ র (৩) বা রে। হিন্দী ও মৈথিলীর মত বাঙ্গালায়ও ষষ্ঠীর আর একটা বিভক্তি—ক। খুব সম্ভব যে, দ্বিতীয়া চতুর্থীর কে বা ক আর এই ক'এও মূলতঃ কোনও প্রভেদ নাই।

বাঙ্গালায় আর একটা কে আছে, সেটাকে 'নিমিত্তার্থক কে' বলিতে পারি। এখন আর তা প্রচলিত আছে কি না, বলিতে পারি না। কিন্তু পূর্ব্বে ছিল। যথা দীনেশ বাবুর কৃত ডাকের বচনে

> রৌদ্রে কাঁটাকুটার রাঁধে
> খড়কাট বর্ষাকে বাঁধে।
> ... ...
> কাথে কলসী পাণিকে যায়।

রবীন্দ্রনাথ পুরাণ বিভক্তিটা পুনরুজ্জীবিত করিয়াছেন—

> "বেলা যে পড়ে' এল, জলকে চল্!"

বর্ষাকে অর্থাৎ বর্ষার জন্য। পানিকে, জলকে অর্থাৎ জলের জন্য। হিন্দীতেও এইরূপ স্থলে বরসাৎকো পানীকো প্রভৃতি প্রযুক্ত হয়। সংস্কৃত কৃতে শব্দের বিকারে এই কে বা কো জন্মিয়াছে। অভিজ্ঞান-শকুন্তলে আছে—

> ণং ভণাহি ইমস্স কএ মচ্ছি আকড্ঢ়ণো ত্তি
> (ননু ভণ অস্য কৃতে মাৎস্যিক ভর্ত্তৃরিতি)।
> ইমস্স কএ সউন্তলা কিলম্মই
> (অস্য কৃতে শকুন্তলা ক্লাম্যতি)।

(১) অপাদান না বলিয়া কর্ম্মই বলিলাম। বাঙ্গালায় 'ভয় করা'ই একটা ধাতু। তাহা অকর্ম্মক।

(২) তোঁহে পৃথক্ শব্দ। তার মূল তুম্হে।

(৩) সপ্তমের "সিংহের বোলাও" দেখিয়াছি। দীনেশ বাবুর ধৃত কবিকঙ্কণে আছে—

> একের করিয়া নিন্দা যাব অন্য স্থান।
> সে ধনী বাসিবে মোর প্রাণের সমান॥

এখানেও, মোর = মোরে।

কৃতে = কএ = কে। কৃতে একারান্ত অব্যয়। ইহার অর্থ নিমিত্তে। সংস্কৃতে সুবন্তের সহিত কৃতে শব্দের সমাসও হইতে পারে। জলস্য কৃতে, জলকৃতে—দুইই হয়। পোশতু ও সিন্ধীভাষার ব্যাকরণকার ট্রম্প সাহেবের মতে, হিন্দীর সমস্ত কো এবং বাঙ্গালার সমস্ত কে'রই ব্যুৎপত্তি এইরূপ। এ কথা ঠিক্ নহে। কোথায় ট্রম্পের মত সমীচীন, দেখাইলাম। ঘরকে গমন, মথুরাকে পাঠাইল—এখানেও সাধারণ কে, কৃতের সহিত কোনও সংস্রব নাই। (১)

তৃতীয়ায় শ্রীনাথ বাবু এক 'দ্বারা'র নাম করিয়াছেন। এইটাই সোজা বটে। কিন্তু খাঁটি তৃতীয়া বিভক্তি এ এবং তে। সংস্কৃতে অকারান্ত শব্দের পরে তৃতীয়ার এক বচনের চিহ্ন—এন। পালিতেও তাই। মাহারাষ্ট্রী প্রভৃতিতেও তাই, কেবল ন'এর স্থানে ণ। "সংস্কৃত 'রামেণ' স্থলে প্রাকৃতে 'রামএ' ব্যবহৃত হইত"—দীনেশ বাবু ইহা কোথায় পাইলেন? 'এ' এখনও দূরে। এন অপভ্রংশে এং হইয়াছিল। (২) যেমন রামেং, বণেং। মরাঠীতে তৃতীয়ার বিভক্তি—এঁ। মৈথিলী ও বাঙ্গালায় শুধু 'এ' অবশিষ্ট আছে। যেমন বিদ্যাপতিতে—

বিদ্যিনি বিথারিত বাট।
প্রেমক আয়ুধে কাট।

দীনেশ বাবুর কৃত কবিকঙ্কণে—

মিথ্যা হৈলে চোয়াড়ে কাটিব তোর নাসা।

(১) এং টা। সংক্ষিপ্তসার, প্রা • অপ • ২৪ সূ •।

(২) আর একটা 'কে' আছে। সেটা বিভক্তি নহে, তদ্ধিত। যেমন শতকে হাজারকে বিদ্যাপতির "কোটিকে গুটিক পাই"। ইহারই রূপান্তর বোধ হয়—কড়া। যেমন শতকড়া, গণকড়া, হিন্দীতে, সৈকড়া। কে কড়ার মূল কৃধ্বচ প্রত্যয় বা কি?

আয়ুধে, চোয়াড়ে—উভয়তঃ করণে তৃতীয়া। এ'র আর একটা বুনিয়াদ্ আছে। পূর্ব্বপ্রবন্ধে বলিয়াছি, প্রাকৃতে স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের পরে তৃতীয়ৈক বচনের একটা বিভক্তি এ। বাঙ্গালায় তাও আছে। যেমন দীনেশ বাবুর ধৃত—

শিরেতে বান্ধিছে চূড়া মালতী মালাএ।
ফণী নামে নদীএ বেষ্টিত চারিধার।

কিন্তু ঈকারান্ত প্রভৃতির পরে এখন আর এ বসে না, তে বসে। তে'র মূল সংস্কৃতের তঃ—বৈয়াকরণেরা বলিবেন, সার্ব্ববিভক্তিকস্তসিল্। এ, তে—এখনও দুইই প্রচলিত। বাঙ্গালায় 'দ্বারা' বিভক্তি তুল্য হইলেও, মূলে উহা বিভক্তি নহে। বহুত্ববাচী গণসমূহ প্রভৃতি শব্দও তাই। প্রাকৃতের কেরও তদ্রূপ। ভাষা নির্ব্বিভক্তিক হইতে আরম্ভ করিলে এই সকল শব্দে বিভক্তির কাজ হয়। তৃতীয়ার অর্থে এই রূপে দিয়া, বোলে, ও কোরে শব্দও প্রযুক্ত হইয়া থাকে। তিনটাই মূলে ধাতুজ। (১) কোরে আবার তে'র সঙ্গেই বসে। যেমন, তাতে কোরে। ডবল বিভক্তির আরও দৃষ্টান্ত আছ। যেমন ঔষধের দ্বারাতে, উকীলের দ্বারাতে। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা তিনটাও বসান। যেমন, তদ্দ্বারাতে কোরে। উচ্ছৃঙ্খল হইলে সবই সম্ভবে।

ভাষাতত্ত্বের সর্ব্বনামাধ্যায়টাও অপদার্থ। বলিবার কিছু না থাকিলে যেমন হয়, তেমনই। কতকগুলি সর্ব্বনামপদের ব্যুৎপত্তি দেখাইয়াছে। এখানে আর কয়েকটা দেখাই। অসৌ = অহ = ওহা বা উহা, হকার

(১) 'দ্বারা'র বিকারে দিয়া হইয়াছে, দীনেশ বাবুর এ উক্তি অমূলক। দ্বারা যেমন বেশী দিনের নহে। দুর্গলের মত আরও দুর্ব্বোধ।

লোপে 'ও'। পূর্ব্ববঙ্গে ওআ বলে। অহ হি=অহি=হলোপে, অই বা ঐ। শ্রীনাথ বাবুর ব্যুৎপত্তি ঠিক্ নহে। অমী প্রাকৃতেই উঠিয়া গিয়াছিল। এইরূপ, এহ হি=এহি(১) =এই। এষঃ—এস=এহ=এহা বা ইহা, হলোপে 'এ'। পূর্ব্ববঙ্গে এআ বলে। এখন ও এবং এ পুং স্ত্রী, উহা ইহা ক্লীবলিঙ্গ। ইহাদেরই দেখাদেখি বোধ হয় যাহা ও তাহা পূর্ব্ববঙ্গে যেআ এবং তএর স্থানে হ করিয়া হেআ বলে। এইরূপ হলোপেই বোধ হয় যা ও তা। (২) অথবা যাহা ও তাহার মূল মাগধীর ষষ্ঠ্যন্ত জাহ ও তাহ। হিন্দীতে ইহার নজীর আছে, দেখিয়াছি। যিনি তিনির মূলও বোধ হয় প্রাকৃতের ষষ্ঠীবহুবচনান্ত জাণ বা জীণ, তাণ বা তীণ। (৩) হিন্দীতে জিণকা জিণকার অর্থও যাঁর তাঁর। যিনি তিনির দেখাদেখি ইনি ও উনি। অনেন প্রাকৃতে ইমিণা বা ইমেণ হয়। ইমেণ হইতে স্বরবিপর্য্যয়ে ইমণে বা এমনে। এমনে মূলে ক্রিয়ার বিশেষণ। পূর্ব্ববঙ্গে এখনও বলে, এমনে করে। অন্যত্র বলে, এমনই করে। কিন্তু এখন ইহা অধিকাংশ স্থলেই বিশেষ্যনিষ্ঠ। যথা এমন পুরুষ, এমন নারী। এমনএর দেখাদেখি অমন, কেমন, যেমন, তেমন। এখানেও শ্রীনাথ বাবুর ব্যুৎপত্তি অসঙ্গত। প্রাকৃতে অমুষ্মিন্এর নকারই থাকে না, তার স্থানে অনুস্বর হয়। প্রাকৃতে অমন প্রভৃতি শব্দও নাই। অপভ্রংশে আর এক প্রকার বিকারও হইয়াছিল। যথা জিম, তিম, কিম বা কেমু ইত্যাদি। (৪) চাঁদ বর্দ্দাইএর কাব্যে জেম, তেম, কেম বা কেমং আছে। প্রাকৃতে কিম্‌শব্দ ষষ্ঠীতে বিকল্পে কীস বা কীশ হয়। মৃচ্ছকটিকে আছে:—

তা কীশ এশে ইধ আগস্তে
(তৎ কস্মাদ্ এষ ইহাগতঃ)।
জই অম্মাণংজননী তা কীস ণণীঅলংকিদা;
(যদ্যস্মাকং জননী তৎকস্মাদ্ অলঙ্কৃতা)।
ধলণীএ কীশ পড়িদে দালুণকে অশণিশাল্লিহে খগ্‌গে
(ধরণ্যাং কস্মাৎ পতিতো দারুণোঽশনিসন্নিঃভ খড়্‌গঃ।

এ সকল স্থলে কীস বা কীশ=কস্মাৎ। পঞ্চমীর স্থানে ষষ্ঠী। বাঙ্গালা কিসে শব্দেরও মূল এই। আমারাও বলি, কিসে বুঝ্‌লে? কিসে এমন হোলো? কিসে কি হয়! কালে কিসে একটা পৃথক্ শব্দ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যেমন কিসে খায়, কিসের জন্য। (৫) কতি=কই=কয়=ক। যেমন কজন? পূর্ব্ববঙ্গে বলে, কয়জন? হিন্দিতে, কই আদ্‌মী? কিয়ৎ, এতাবৎ, যাবৎ, তাবৎ =কেত্তিঅ, এত্তিঅ, জেত্তিঅ, তেত্তিঅ=

(১) যেমন দীনেশ বাবুর ধৃত—

মৃগলক্ষ পুঁথি এহি হরগৌরীর পায়।
দেশী ভাষায় এহি কথা রচিল পয়ার।

বিদ্যাপতিতেও এহি আছে।

(২) তৎ ও প্রাকৃতে তা হয়। কিন্তু সে তৎ বা তা অব্যয়। অর্থ অনেকটা তবে'র মত। আমরাও বলি, তা নিতান্তই যাবে ত আমিও সঙ্গে যাই। এই তো শব্দের মূলও প্রাকৃত। তো=তস্মাৎ। প্রাকৃতপ্রকাশ, ৬।১০।

(৩) অথবা, তৃতীয়ান্ত জিণা তিণা? প্রাচীন বাঙ্গালায় তিনি'র স্থানে তিঁহ আছে। হিন্দীতে তিন্‌হোঁক'র অর্থ—তাহাদের। তিন্‌কাও তিন্‌হোঁকা বোধ হয় মূলে একই। এ বিষয়ে আরও অনুসন্ধান করা আবশ্যক।

(৪) সংক্ষিপ্তসার, প্রা॰ অপ॰ ১১, ১২ সূ॰।

(৫) শ্রীনাথ বাবুর ব্যুৎপত্তি যেন অন্যায়। কিসে খায়—অর্থাৎ "সে কি, সে খায়?"।

কত, এত, যত, তত। ইহাদেরই দেখা দেখি—অত। কস্মিন্ = কহিং = কহি = কই বা কৈ। অর্থাৎ কোথা। কুত্র, অত্র, যত্র, তত্র = কথ, এথ, জথ, তথ = কোথা, এথা, জেথা, তেথা। এথা বা তেথা না বলিয়া হেথা বা সেথা বলি। হেথা'রই সঙ্গে সঙ্গে বোধ হয়—হোথা। যাবৎ, তাবৎ = জাব, তাব = হিন্দীর জব তব, বাঙ্গালার যবে তবে। তাহারই দেখা দেখি হিন্দীর কব্, বাঙ্গালার কবে এবং হিন্দীর অব্, বাঙ্গালা পত্তের এবে। কোন্, কঃ পুনঃ = কোণ্, কোউণ = হিন্দীর কৌন্, বাঙ্গালার কোন।

বাঙ্গালার সংখ্যা শব্দের সহিত পালি ও অন্যান্য প্রকৃত সংখ্যা শব্দের খুব সাদৃশ্য আছে। প্রাকৃত জানিলে শ্রীনাথ বাবু তাহা দেখাইতে পারিতেন। তাহাতে সিদ্ধান্তও দৃঢ় হইত। শ্রীনাথ বাবুর মতে সহস্র হইতে বাঙ্গালার হাজার শব্দ আসিয়াছে, যেমন ইদানীং হইতে প্রাকৃতে দাণীং। আমি আরও একটা দৃষ্টান্ত দিতে পারি—যেমন অরণ্যম্ হইতে রণ্ণং। তবু এ ব্যুৎপত্তি সমীচীন বোধ হয় না। কেন না, পালি প্রভৃতিতেই সহস্র শব্দ 'সহস্‌সা হয়, র'টা থাকে না। বিদ্যাপতিতেও 'সহস' আছে। যথাঃ—

অবসর দেলৈঁ সহস ভোলাম।

এই পরিণামই স্বাভাবিক। হিন্দুস্থানী ও পার্শী উভয় ভাষার উৎকৃষ্ট ব্যাকরণকার প্লাট্‌স্ সাহেবের মত, হিন্দুস্থানীর হাজার শব্দ পার্শী হইতে গৃহীত। বাঙ্গালা সম্বন্ধেও আমার সেই মত। মুসলমান সংসর্গের নিশ্চিত পূর্ব্বেকার বাঙ্গালা বা হিন্দী প্রভৃতিতে হাজার শব্দ না দেখিলে শ্রীনাথ বাবুর মত গ্রহণ করিতে পারি না। তবে সংস্কৃত সহস্র ও পারসীক হাজার বা হাজাঁরা, এ দুয়েতে জ্ঞাতিসম্পর্ক থাকিতে পারে। সে কথা স্বতন্ত্র।

ভাষাতত্ত্বের নামভাগ শেষ করিলাম। তিন কারণে আমি এ পুস্তকের এত বিস্তৃত সমালোচনা করিয়াছি। প্রথম, বিষয়টা বাঙ্গালা সাহিত্যে এখনও তেমন পরিচিত নহে। দ্বিতীয় ভাষাতত্ত্বে প্রমাণ বড় সাবধানে প্রয়োগ করিতে হয়। কেন না, অনেক স্থলেই তাহা সম্ভবানুমান মাত্র। এ পুস্তকে সে সাবধানতা নাই। যথাস্থানে তাহা খুলিয়া দেখান আবশ্যক বোধ করিয়াছি। তাহাতে কিছু উপকার হইতে পারে। শেষ, এ ক্ষেত্রে কেবলধ্বংসিনী সমালোনায় কোনও লাভ নাই। খণ্ডনের সঙ্গে সঙ্গে তাই আমি স্থাপনও করিয়াছি। যেখানে পুস্তকের মত অগ্রাহ্য, প্রায়ই তাই, সেখানে সমীচীন মত কি, দেখাইয়াছি। দীনেশ বাবুর পরিশ্রমে প্রাচীন বাঙ্গালার অনেক নমুনা এখন একাধারে পাই। তার আলোকে বাঙ্গালা ভাষাতত্ত্বের যে যে দিক্ একটু পরিষ্কার হইতে পারে, সেখানে তাও ধরিয়া দেখাইয়াছি। এ সকল কারণেও প্রবন্ধ বড় হইয়াছে। বিষয়-গৌরবে সমালোচনা বাড়িয়াছে। নহিলে পুস্তকখানির এমন কোন্‌ও গুণ নাই, যাহাতে বিশিষ্ট সমালোচনায় যোগ্য হয়।

ভাষাতত্ত্বের আখ্যাতভাগের সমালোচনা এখনও বাকী। শীঘ্র তাহা করিয়া উঠিতে পারি, এমন সম্ভাবনা নাই।

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র গুহ।

এস্-২।

যদি দেখা হয়।

১

যদি দেখা হয়—
নবীন বরষ আজি,
ভূতলে আসিল সাজি,
চির পুরাতন আজি নবীনতা ময় ;
নূতন উদ্যম আশা,
নবীভূত ভালবাসা,
পুরাতনে পড়ে মনে সমস্ত সময়—
তাই আমি ভাবিতেছি যদি দেখা হয় !

২

যদি দেখা হয়—
কি ভাবিনু হরি ! হরি !
আপনি সরমে মরি,
কত যে নবীন বর্ষ হতেছে বিলয়।
নীরব নিশ্বাস সনে,
শত ঘুম জাগরণে,
বহিতেছে জীবনের অমূল্য সময়—
তবু কেন ভাবি হেন যদি দেখা হয় !

৩

যদি দেখা হয়—
এত অশ্রু এত হাসি,
জমিছে যে রাশি রাশি,
এত স্নেহ আকাঙ্ক্ষা আশা কহিবার নয় ;
এত কথা এত গাথা,
এত ফুল এত পাতা,
কেন হেন তুলে রাখি কে রাখিতে কয় ?
কেন আসে পোড়া মনে যদি দেখা হয় ?

৪

যদি দেখা হয়—
হা ধিক অবোধ মন !
সে শুভ মাহেন্দ্র ক্ষণ
গিয়াছে—সে পুণ্যবল হইয়াছে ক্ষয় ;
সে নিশা হয়েছে ভোর,
ভেঙ্গেছে সে ঘুম ঘোর,
ফুরায়েছে সত্য যুগ চিরানন্দ ময় !—
আজো কেন আসে মনে যদি দেখা হয় !

৫

যদি দেখা হয়—
আর কি এ বসুন্ধরা,
আছে প্রীতি পুণ্যভরা,
আর সে শশী কি হাসে, সে জ্যোছনাময় ;
আর কি মলয়ানিলে,
তেমন অমিয় মিলে,
আর কি পাপিয়া কণ্ঠে সেই গীতি বয়,
আর কি দেখাব তারে যদি দেখা হয় !

৬

যদি দেখা হয়—
নির্ম্মল দর্পণ সম,
কোথা সে হৃদয় মম,
সোণার কৈশোর সেই সরলতা ময় !
দেবের আশীষ সম,
সে শুভ জীবন মম—
কত আদরের সে যে, স্বতঃ মৃত্যুঞ্জয় !
আজি কি দেখাব তারে যদি দেখা হয় !

৭

যদি দেখা হয়—
সে যে গেছে যুগ শত,
জনমি মরিনু কত,
কত বিপ্লাবন ঝড়ে গেছে সে হৃদয়।
দ্বেষ, হিংসা, হা হতাশ,
অভিমান, অবিশ্বাস,
শোক, রোগ, সর্ব্বনাশ, নিত্য পরাজয় !

ঐন্দ্র মহাভিষেক।

রাজ্যারোহণকল্পে ইংরেজ রাজার কিরীটাধানকে অভিষেক বলা যায় জোর করিয়া, কেন না ইহাতে স্নানের গন্ধও নাই। এ কিরীটাধানে অভ্যঞ্জন আছে—প্রধান পুরোহিতকে রাজদেহের স্থানে স্থানে একটু মাখন মাখাইয়া দিতে হয়। রাজসূয় প্রভৃতি সোমযাগে দীক্ষিত করিবার কালেও যজমানকে নবনীতে অভ্যক্ত করিতে হয়। কিরীটাধানেও অভ্যঞ্জন আছে, কিন্তু অভিষেক নাই। এ দুয়ের ফলেও বড় প্রভেদ। ইংরেজ রাজার এ কিরীটাধান একটা উৎকৃষ্ট তামাসা মাত্র, মোটে না হইলেও তাহাতে রাজার অধিকারে কোনও দোষ স্পর্শে না।* কিন্তু এদেশের ধর্ম্মশাস্ত্রমতে অনভিষিক্তের রাজধর্ম্মে অধিকার নাই। ভারতীর পাঠককে সে শ্রুতি শুনাইব।

বেদে রাজাভিষেক দুই প্রকারের আছে। কতকগুলি অপর কোনও প্রধান কর্ম্মের অঙ্গমাত্র। সেই সেই প্রধান কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলেই অঙ্গভূত সেই সকল অভিষেক করিতে হয়, নচেৎ হয় না। যেমন রাজসূয়ের অভিষেক। রাজসূয়ে অন্যূন তিনটা অভিষেক আছে। একবার দীক্ষণীয়েষ্টিতে, একবার মাধ্যন্দিন্ সবনে, শেষ যাগান্তে পুনরভিষেক। তিনই রাজসূয়ের অঙ্গ। রাজসূয় করিলেই এই সকল অভিষেক করিতে হয়, আর রাজসূয় না করিলে এ সকলও করিতে হয় না। পক্ষান্তরে এমন অভিষেকও আছে, যাহা অপর কোনও প্রধান কর্ম্মের অঙ্গ নহে, স্বয়ংই প্রধান। তার জন্যই তার অনুষ্ঠান করিতে হয়। বহ্বৃচগণের ঐন্দ্র মহাভিষেক এবং তৈত্তিরীয়গণের রাজাভিষেক

* Broom's Constitutional Law, First Edition, pp. 15, 16, 30.

এই শ্রেণীর। অথর্ব্ববেদেও অভিষেক আছে। ইন্দুমতীনাথের অভিষেক অনেক পাঠকেরই মনে পড়িবে—

স বভূব দুরাসদঃ পরৈঃ
গুরুণাহ্‌ থর্ব্ববিদা কৃতক্রিয়ঃ।

অথর্ব্বোক্ত অভিষেকও এই শ্রেণীর।

ঐন্দ্র মহাভিষেক ও রাজসূয়ের পুনরভিষেক অনেকটা একরূপ। দুইই ঐতরেয় ব্রাহ্মণের। রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র লিখিয়াছেন,* ঐতরেয়ব্রাহ্মণে তিন রকমের অভিষেক আছে। এক শুধু অভিষেক, ছোট ছোট রাজার জন্য। আর এক পূর্ণাভিষেক, একটু বড় রাজার জন্য। শেষ মহাভিষেক, সাফ্‌ সম্রাটের জন্য। মুনিরও মতিভ্রম হয়। এ সূক্ষ্ম অধিকারবিভাগও ঐতরেয়তে নাই। ঐ গ্রন্থ রাজা মার্টিন হাউগের তর্জ্জমায় কিছু তাড়াতাড়ি পাঠ করিয়া থাকিবেন। পুনরভিষেক তাই পূর্ণাভিষেক হইয়া পড়িয়াছে! সাধারণ অভিষেকও আছে বটে, যেমন সোমযাগে দীক্ষণীয়েষ্টির অভিষেক। কিন্তু তাও শুধু রাজার জন্য নয়। রাজা, অরাজা, যথাসম্ভব সকল ত্রৈবর্ণিকেরই তাহাতে অধিকার আছে। ঐন্দ্র মহাভিষেকও শুধু সম্রাট বা শুধু রাজার জন্য নয়। সকল ক্ষত্রিয়েরই তাহাতে অধিকার আছে। রাজসূয়েও তাই। প্রভেদ এই যে, অন্য ক্ষত্রিয়ের অভিষেক না হইলেও ক্ষতি নাই, কিন্তু রাজ্যারূঢ়কে অবশ্য অভিষিক্ত হইতে হইবে। যেটা হউক, একটা অভিষেক চাই। অনভিষিক্তের রাজধর্ম্মে অধিকার নাই।

আবার শ্মাস্‌ অভিষেকের পদ্ধতি ঐন্দ্র মহাভিষেকেও যেমন, তৈত্তিরীয়ের রাজাভিষেকেও† প্রায় তেমনই। তবে দ্বিতীয়ে অভিষেকের পূর্ব্বে সাতটা আহুতিহোম এবং পরে রাজার রথারোহণ ও

---

* Indo-Aryans, Vol. II, pp. 46-47.

† তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণ ২।৭।১৫-১৭।

কেশ-বপন করিতে হয়। এ প্রবন্ধে আমি ঐন্দ্র মহাভিষেকই বর্ণিত করিব। প্রজাপতির সহিত দেবতারা নাকি ইন্দ্রকে এই অভিষেকে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন, তাই ইহার এই নাম। ঐতরেয়ব্রাহ্মণের অষ্টম পঞ্চিকায় এই মহাভিষেক বিহিত আছে।

প্রথমেই অধিকারবিধি। যে ক্ষত্রিয় ইচ্ছা করিবেন,—

অহং সর্ব্বা জিতীর্জয়েয়মহং সর্ব্বাংল্লোকান্ বিন্দেয়মহং সর্বেষাং রাজ্ঞাং শ্রৈষ্ঠ্যমতিষ্ঠাং পরমতাং গচ্ছেয়ং সাম্রাজ্যং ভৌজ্যং স্বারাজ্যং বৈরাজ্যং পারমেষ্ঠ্যং রাজ্যং মাহারাজ্যমাধিপত্যমহং সমন্তপর্য্যায়ী স্যাং সার্বভৌমঃ সার্ব্বায়ুষ আন্তাদা পরার্দ্ধাৎ পৃথিব্যৈ সমুদ্রপর্য্যন্তায়া একরাড়িতি—

"আমি সকল যুদ্ধভূমিতে বিজয়ী হই, আমি সকল দেশ প্রাপ্ত হই, আমি সকল রাজার মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব, চিরজীবিত্ব, উৎকৃষ্টত্ব লাভ করি, সাম্রাজ্য ভোগসমৃদ্ধি অপারতন্ত্র্য, অন্য রাজা হইতে বৈশিষ্ট্য প্রজাপতি-পদ রাজ্য মহারাজ্য আধিপত্য লাভ করি, আমি দেশে কালে সর্ব্বব্যাপী হই, সমুদ্রতীরপর্য্যন্ত সার্ব্বভৌম, পরার্দ্ধকালপর্য্যন্ত আয়ুষ্মান্ হই, আমি সমুদ্র পর্য্যন্ত পৃথিবীর একেশ্বর হই," আচার্য্য ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে এই ঐন্দ্র মহাভিষেকে অভিষিক্ত করিবেন।

কামনাগুলা মহাভিষেকেরই মত বটে—মহারাজ্য, সাম্রাজ্য, ঐকরাজ্য! বেদে খালি পুরোডাশ পাকাইবারই কথা নাই!

আন্তাদা পরার্দ্ধাৎ পৃথিব্যৈ সমুদ্র পর্য্যন্তায়া একরাট্

... ...

অশ্বরথঃ কবচ ইষুধন্বম্*

... ...

ধন্বনা গা ধন্বনাজিঞ্জয়েম

ধন্বনা তীব্রাঃ সমদো জয়েম

---

* ঐতেরয়ব্রাহ্মণ, ৭,৪।১।

এ সকলও আছে! সবই ছিল, নহিলে বেদ কিসের? পৃথিব্যৈ সমুদ্রপর্যন্তায়ৈ—সেকালের দৌড় ঐ পর্য্যন্ত। ইংরেজের জন্য নূতন বেদ করিতে হয়।

অভিষেকে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে আচার্য্য রাজাকে এক শপথ করাইয়া লইবেন। শপথটা এইরূপ। আচার্য্য বলিবেন—

যাঞ্চ রাত্রীমজায়েথা যাঞ্চ প্রেতাসি তদুভয়মন্তরেণেষ্টাপূর্ত্তং তে লোকং সুকৃতমায়ুঃ প্রজাং বৃঞ্জীয়ং যদি মে দ্রুহ্যেঃ।

হে ক্ষত্রিয়! যদি আমার প্রতি দ্রোহী হও, তবে যে রাত্রিতে তুমি জন্মলাভ করিয়াছিলে আর যে রাত্রিতে প্রাণত্যাগ করিবে, এ দুয়ের মধ্যবর্ত্তী তোমার শ্রৌতস্মার্ত্তকর্ম্মফল পুণ্যলোক পুণ্য আয়ুঃ পুত্রাদি-সন্ততি সব বিনষ্ট করিব।

ক্ষত্রিয় তাহাতে সংশয় না করিয়া শ্রদ্ধার সহিত শপথ করিবেন—

যাঞ্চ রাত্রীমজায়েহং যাঞ্চ প্রেতাস্মি তদুভয়মন্তরেণেষ্টাপূর্ত্তং মে লোকং সুকৃতামায়ুঃ প্রজাং বৃঞ্জীথা যদি তে দ্রুহ্যেয়ম্।

হে আচার্য্য! যদি আপনার প্রতি দ্রোহী হই, তবে যে রাত্রিতে আমি জন্মলাভ করিয়াছিলাম আর যে রাত্রিতে প্রাণত্যাগ করিব, এ দুয়ের মধ্যবর্ত্তী আমার শ্রৌতস্মার্ত্তকর্ম্মফল পুণ্যলোক পুণ্য আয়ুঃ পুত্রাদি সন্ততি সব যেন বিনষ্ট করেন।

কিরীটাধানকালে ইংলণ্ডের রাজাকেও এক শপথ করিতে হয়। ইংরেজ প্রজার সহস্রবর্ষব্যাপী ইতিহাস সেই এক শপথে গ্রথিত আছে। আমি তার সহিত এই বৈদিক শপথের তুলনা করিতেছি না। অঙ্কুরের সহিত মহামহীরুহের তুলনা হয় না। কিন্তু এ বৈদিক শপথেও তার অঙ্কুর ছিল। অঙ্কুরই মাত্র, তার বেশী নয়। এ দেশে অঙ্কুরটা পচিয়া গিয়াছিল, বিলাতে বাঁচিয়াছে। কথাটা খুলিয়া বুঝাইবার এ স্থান নয়।

শপথের পর আচার্য্য পরিচারকগণকে বলিবেন—

চতুষ্টয়ানি বানস্পত্যানি সম্ভরত নৈয়গ্রোধান্যৌদুম্বরাণ্যাশ্বত্থানি প্লাক্ষাণি।

বট যজ্ঞডুম্বুর অশ্বত্থ পাকুড়, এই চারি প্রকার বনস্পতির ফল আহরণ কর।

ফলসম্ভারের পরে আচার্য্য আবার বলিবেন—

চতুষ্টয়ান্যোষধানি সম্ভরত তোক্মকৃতানি ব্রীহীণাং মহাব্রীহীণাং প্রিয়ঙ্গূণাং যবানাম্।

ব্রীহি মহাব্রীহি প্রিয়ঙ্গু যব, এই চারি প্রকার ঔষধির অঙ্কুর আহরণ কর।

ভাষ্যকার বলেন, সরু ধানই ব্রীহি আর মোটা ধানই মহাব্রীহি। প্রিয়ঙ্গু কবিরাজদের প্রিয়, বেণের দোকানে পাওয়া যায়। প্রিয়ঙ্গুও ধান্যবিশেষ, শ্যামাধানের জাতি। এই সকল যোগাড় হইলে রাজার বসিবার জন্য এক আসন্দী অর্থাৎ আসন আহরণ করিবে। এই আসন্দী যজ্ঞডুমুরের কাষ্ঠে নির্ম্মিত হওয়া চাই। তার পায়া চারিটা প্রত্যেকে এক প্রাদেশ করিয়া উঁচু এবং সেগুলি যুড়িবার কাঠ চারিখানা প্রত্যেকে দুই প্রাদেশ করিয়া লম্বা হইবে। উপরে কাঠের ছাউনী না করিয়া মুঞ্জতৃণে রচিত রজ্জুর ছাউনী করিবে। মুঞ্জ ইক্ষুজাতীয় তৃণ। মুঞ্জের দড়ি কাশীর অঞ্চলে পাওয়া যায়। এ আসন্দী একখানা ছোট খাট চার পায়েরই মত। চারপায়ের ছাউনী সামান্য দড়ির, আসন্দীর ছাউনী মুঞ্জের দড়ি বুনিয়া করিতে হয়। অভিষেকে রাজাসন এইরূপ। রামায়ণে ইহারই নাম ভদ্রপীঠ, মহাভারতে সর্ব্বতোভদ্র। ইংলণ্ডের রাজাকেও হাজার বছরের জরাগ্রস্ত এক আশ্চর্য্য কুর্সীতে বসিয়া কিরীট লইতে হয়। তারও নাম সিংহাসন।

ঐ আসন্দীর উপরে একখানা ব্যাঘ্রচর্ম্ম বিছাইবে। যেন চর্ম্মের লোমযুক্ত পিঠ্‌টা উর্দ্ধে এবং গলার দিক্‌টা পূর্ব্বদিকে থাকে। এক অপূর্ব্ব অর্থবাদে এই আস্তরণের প্রশংসা আছে—

ক্ষত্রং বা এতদারণ্যানাং পশূনাং যদ্ব্যাঘ্রঃ ক্ষত্রং রাজন্যঃ ক্ষত্রেণৈব তৎ ক্ষত্রং সমর্দ্ধয়তি।

ব্যাঘ্রই আরণ্য পশুদিগের ক্ষত্রিয়। রাজন্যও ক্ষত্রিয়। অতএব ক্ষত্রিয়ের দ্বারাই ক্ষত্রিয়কে সমৃদ্ধ করে।

যে দেশের কল্পনায় ক্ষত্রিয়শিশু দুরন্ত সিংহশাবকের মুখ হাঁ করাইয়া তার দাঁত কটা গণিয়া দেখিতে চায়, এ বিধিবাদও সেই দেশের। নহিলে সব ফেলিয়া ব্যাঘ্রচর্ম্ম রাজার আস্তরণ হইবে কেন?

সকল সম্ভারই এইরূপ রূপকময়। বল বীর্য্য ঐশ্বর্য্যের রূপক।—

ক্ষত্রং বা এতদ্বনস্পতীনাং যন্ন্যগ্রোধঃ……ভৌজ্যং বা এতদ্বনস্পতীনাং যদুদুম্বরঃ……সাম্রাজ্যং বা এতদ্বনস্পতীনাং যদশ্বত্থঃ……স্বারাজ্যঞ্চহ বা এতদ্ বনস্পতীনাং যৎ প্লক্ষঃ।

ক্ষত্রং বা এতদোষধীনাং যন্ব্রীহয়ঃ……সাম্রাজ্যং বা এতদোষধীনাং যন্মহাব্রীহয়ঃ…ভৌজ্যং বা এতদোষধীনাং যৎ প্রিয়ঙ্গবঃ……সৈনান্যং বা এতদোষধীনাং যদ্ যবাঃ।

যজ্ঞডুমুর ও প্রিয়ঙ্গু সেকালের বড় প্রশস্ত খাদ্য ছিল বোধ হয়, নচেৎ একেবারে ভোগসমৃদ্ধির অবতার হইত না। সপ্তম পঞ্চিকায়ও এক স্থানে আছে, বটের জটা এবং যজ্ঞডুমুর অশ্বত্থ ও পাকুড়ের ফলই ক্ষত্রিয়ের উচিত ভক্ষ্য। যজ্ঞডুমুরের ফল খাইয়া রক্সবরা ~~সাহেব~~ কিন্তু সুখ পান নাই। কঠোর যুগের ভোগও কঠোর। লাইকর্গসের স্পার্টায় আর এক্‌প্রকার ডুমুর যবনেরও বিহিত ভক্ষ্য ছিল।

ইহার দুই একটা রূপক কিছু কৃত্রিম, কিছু আকস্মিক ঠেকে বটে। আমার বোধ হয়, অভিষেকের এই সমস্ত উপকরণ আচারপরম্পরায় ঐতরেয়ব্রাহ্মণের পূর্ব্ব হইতেই চলিয়া আসিতেছিল। যেমন আসিয়াছিল, ব্রাহ্মণেও তেমনই গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অভিষিক্তকে লক্ষ্য করিয়া রূপকচ্ছলে ঐ সকল উপকরণের এক একটা তাৎপর্য্য বুঝাইবার চেষ্টা আছে। চেষ্টা আছে—অর্থহীনকে সার্থক করিবার

জন্য, বেদ জড়েও চিতের প্রতিমা খুঁজিতেছিল। সে উদ্দেশ্য সর্ব্বত্রই পরিস্ফুট, কিন্তু যার সাহায্যে তাহা সফল করিবার চেষ্টা, সকল স্থলে সে রূপকটা ভাল মিশে নাই। বিস্মৃতমূল অনাদি আচারে রূপক কল্পনা করিতে গেলে এমন দুই একটা কষ্টকল্পনাও অবশ্যম্ভাবী।

হ্যাণ্ডেলযুক্ত চতুষ্কোণ পাত্রবিশেষের নাম চমস। যজ্ঞডুমুরকাঠের চমস বা অন্যরূপ পাত্রে অথবা মৃন্ময় পাত্রে পূর্ব্বোক্ত চারি প্রকারের ফল ও অঙ্কুর স্থাপন করিবে। পরে তাহা দধি মধু ঘৃত ও আতপবর্ষ্য জলে পূর্ণ করিয়া রাখিয়া দিবে। আতপবর্ষ্য জল অর্থাৎ রৌদ্রের সঙ্গে সঙ্গে যে বৃষ্টি হয়, তার জল। এই শরৎকালে জিনিসটা তেমন দুর্লভ নয়। এখানেও সেই অর্থবাদ—

ইন্দ্রিয়ং বা এতদস্মিঁল্লোকে যদ্দধি···রসো বা এতদোষধিবনস্পতিষু যন্মধু···তেজো বা এতৎ পশূনাং যদ্ঘৃতম্···অমৃতং বা এতদস্মিঁল্লোকে যদাপঃ। তেজশ্চ হ বৈ ব্রহ্মবর্চ্চসং চাতপবর্ষ্যা আপঃ। ভাষ্যকার বুঝাইয়াছেন, সূর্য্যকরসম্পর্ক আছে বলিয়া আতপবর্ষ্য জল তেজঃস্বরূপ, আর বেদবিহিত আহুতির ফলে বৃষ্টি হয় বলিয়া উহা স্বাধ্যায়স্বরূপ। এই জলে রাজার অভিষেক হইবে।

অভিষেকসম্ভার পূর্ণ হইল। আচার্য্য এখন সজ্জিত আসন্দী এই মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিবেন—

বৃহচ্চ তে রথন্তরঞ্চ পূর্ব্বপাদৌ ভবতাং বৈরূপঞ্চ বৈরাজঞ্চাপরৌ শাক্বররৈবতে শীর্ষণ্যে নৌধসঞ্চ কালেয়ঞ্চানূচ্যে ঋচঃ প্রাচীনাতানাঃ সামানি তিরশ্চীনবায়া যজূংষ্যতীকাশা যশ আস্তরণং শ্রীরুপবর্হণং সবিতা চ তে বৃহস্পতিশ্চ পূর্ব্বৌ পাদৌ ধারয়তাং বায়ুশ্চ পূষা চাপরৌ মিত্রাবরুণৌ শীর্ষণ্যে অশ্বিনাবনূচ্যে।

হে আসন্দি! বৃহৎসাম ও রথন্তরসাম তোমার পূর্ব্ব দুই পাদ এবং বৈরূপসাম ও বৈরাজসাম তোমার অপর দুই পাদ হউক। শাক্বরসাম ও রৈবতসাম তোমার পূর্ব্ব পশ্চিম দুই ফলক এবং নৌধসসাম ও

কালেয়সাম তোমার পার্শ্ববর্ত্তী দুই ফলক হউক। ঋকসমূহ তোমার পূর্ব্ব পশ্চিমায়ত এবং সামসমূহ তোমার তির্য্যগায়ত রজ্জুশ্রেণী হউক। যজুঃসমূহ তোমার রজ্জুময় আচ্ছাদনের অন্তরালচ্ছিদ্র হউক। কীর্ত্তি তোমার আস্তরণ, লক্ষ্মী তোমার উপাধান হউক। সবিতা ও বৃহস্পতি তোমার পূর্ব্ব দুই পাদ, বায়ু ও পূষা তোমার অপর দুই পাদ, মিত্র ও বরুণ তোমার পূর্ব্ব পশ্চিম দুই ফলক, এবং অশ্বিদ্বয় তোমার পার্শ্ববর্ত্তী দুই ফলক ধারণ করুন।

তার পর রাজা আসন্দীতে আরোহণ করিবেন। আরোহণকালে আচার্য্য এই মন্ত্র পাঠ করিবেন —

বসবস্ত্বা গায়ত্রেণ ছন্দসা ত্রিবৃতা স্তোমেন রথন্তরেণ সাম্নাহঽরোহন্তু তানন্বারোহ সাম্রাজ্যায়। রুদ্রাস্ত্বা ত্রৈষ্টুভেন ছন্দসা পঞ্চদশেন স্তোমেন বৃহতা সাম্নাহঽরোহন্তু তানন্বারোহ ভৌজ্যায়। আদিত্যাস্ত্বা জাগতেন ছন্দসা সপ্তদশেন স্তোমেন বৈরূপেণ সাম্নাহঽরোহন্তু তানন্বারোহ স্বারাজ্যায়। বিশ্বে ত্বা দেবা আনুষ্টুভেন ছন্দসৈকবিংশেন স্তোমেন বৈরাজেন সাম্নাহঽরোহন্তু তানন্বারোহ বৈরাজ্যায়। মরুতশ্চ ত্বাঙ্গিরসশ্চ দেবা অতিচ্ছন্দসা ছন্দসা ত্রয়স্ত্রিংশেন স্তোমেন রৈবতেন সাম্নাহঽরোহন্তু তানন্বারোহ পারমেষ্ঠ্যায়। সাধ্যাশ্চ ত্বাহঽপ্ত্যাশ্চ দেবাঃ পাংক্তেন ছন্দসা ত্রিণবেন স্তোমেন শাক্বরেণ সাম্নাহঽরোহন্তু তানন্বারোহ রাজ্যায় মাহারাজ্যায়াধিপত্যায় স্বাবশ্যায়াতিষ্ঠায়ারোহ।

হে আসন্দি! বসুগণ গায়ত্রীচ্ছন্দঃ ত্রিবৃৎস্তোম ও রথন্তরসামের সহিত তোমাতে আরোহণ করুন; হে ক্ষত্রিয়! সাম্রাজ্যসাধনের জন্য তুমি তাঁহাদের পশ্চাৎ আরোহণ কর। রুদ্রগণ ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দঃ পঞ্চদশস্তোম ও বৃহৎসামের সহিত তোমাতে আরোহণ করুন; হে ক্ষত্রিয়! ভোগসমৃদ্ধিসাধনের জন্য তুমি তাঁহাদের পশ্চাৎ আরোহণ কর। ইত্যাদি

সকল দেবতা, সকল বেদ, সকল ছন্দঃ, সকল সাম লইয়া ক্ষত্রিয় রাজাসন আরোহণ করিতেছেন। সকল দেবতাত্মা পরমেশ্বর, সকল বেদাত্মা ধর্ম্ম এ রাজত্বের সাক্ষী। এ সব মন্ত্রের তাৎপর্য্য এই। ভাষ্যকার সত্য বলিয়াছেন, এ আসন্দী বেদময়ী।

ব্যাঘ্রচর্ম্মসমাস্তীর্ণা আসন্দীতে সমাসীন রাজাকে তৈত্তিরীয়েরা এই মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করেন—

ব্যাঘ্রো বৈয়াঘ্রেঽধি। বিশ্রয়স্ব দিশো মহীঃ।
বিশস্ত্বা সর্বা বাঞ্ছন্তু। মা ত্বদ্রাষ্ট্রমধিভ্রশৎ॥

হে ক্ষত্রিয়! ব্যাঘ্রচর্ম্মে ব্যাঘ্রবৎ অধিষ্ঠিত হইয়া সকল মহাদিক্ আশ্রয় কর। সমস্ত প্রজা তোমাকে কামনা করুক। রাজ্য যেন তোমা হইতে ভ্রষ্ট না হয়।

সকল বেদেই এক ধ্বনি। কিন্তু বহ্বৃচদিগের এই অভিমন্ত্রণটা নাই।

আসন্দীতে রাজা আসীন হইলে,, তাঁহার স্বজনেরা বলিবেন—

ন বা অনভ্যুৎকুষ্টঃ ক্ষত্রিয়ো বীর্যাং কর্ত্তুমর্হত্যভোনমুৎক্রোশাম।

চতুর্দ্দিকে ঘোষণা না হইলে ক্ষত্রিয় বীর্য্য প্রকাশ করিতে পারে না। অতএব চল, ইঁহাকে চতুর্দ্দিকে ঘোষিত করি।

আবার বলিবেন—

তথা।

তাই বটে।

তখন রাজস্বজনেরা এই মন্ত্রে ঘোষণা করিবেন—

ইমং জনা অভ্যুৎক্রোশত সম্রাজং সাম্রাজ্যং ভোজং ভোজপিতরং স্বরাজং স্বারাজ্যং বিরাজং বৈরাজ্যং পরমেষ্ঠিনং পারমেষ্ঠ্যং রাজানং রাজপিতরং ক্ষত্রমজনি ক্ষত্রিয়োঽজনি বিশ্বস্য ভূতস্যাধিপতিরজনি বিশামত্তাঽজন্যমিত্রাণাং হন্তাঽজনি ব্রাহ্মণানাং গোপ্তাঽজনি ধর্ম্মস্য গোপ্তাঽজনি।

হে জনগণ! তোমরা ইঁহাকে চতুর্দ্দিকে ঘোষিত কর—ইনি সম্রাট্ সাম্রাজ্যদক্ষ, ভোক্তা, ভোগপালক, স্বরাট্, স্বারাজ্যদক্ষ, বিরাট্, বৈরাজ্যদক্ষ, প্রজাপতিরূপী, .প্রজাপতিপদলাভের যোগ্য, রাজা, সকল রাজার পালক। ক্ষত্রজাতি জন্মিল, ক্ষত্রিয় জন্মিল, সর্ব্বভূতের অধিপতি

জন্মিল, প্রজাগণের ভোক্তা* জন্মিল, শত্রুগণের হন্তা জন্মিল, ব্রাহ্মণগণের রক্ষক জন্মিল, ধর্ম্মের রক্ষক জন্মিল।

সেকালের প্রক্লেমেশন্ এইরূপ ছিল। "ধর্ম্মস্য গোপ্তা" ইংলণ্ডের রাজারও এক উপাধি। বলা বাহুল্য, সে ধর্ম্মের অর্থ চর্চ্চ্ অব্ ইংলণ্ডের খ্রীষ্টধর্ম্ম।

ঘোষণার পরে আচার্য্য রাজাকে এই ঋকে* অভিমন্ত্রিত করিবেন—

নিষসাদ ধৃতব্রতো বরুণঃ পস্ত্যাস্বা সাম্রাজ্যায় ভৌজ্যায় স্বারাজ্যায় বৈরাজ্যায় পারমেষ্ঠ্যায় রাজ্যায় মাহারাজ্যায়াধিপত্যায় স্বাবশ্যায়াতিষ্ঠায় সুক্রতুঃ।

সকল অশুভের নিবারয়িতা, ধৃতব্রত, শোভনসঙ্কল্প ইন্দ্র গৃহে আগমন করিয়া সাম্রাজ্য প্রভৃতি সিদ্ধির জন্য এই আসন্দীতে উপবিষ্ট হইয়াছিলেন।

এই ঋকের প্রকৃত দেবতা বরুণ। এখানে প্রকরণের অনুরোধে ভাষ্যকার ইন্দ্র বুঝিয়াছেন। ইন্দ্রকেই নাকি দেবতারা প্রথম এই অভিষেকে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন। উদ্ধৃত ঋকে আচার্য্য রাজাকে ইন্দ্রের কথা স্মরণ করাইতেছেন। যিনি

রথীতমং রথীনাম্‌······জেতারমপরাজিতম্—

যিনি বজ্রভৃদ্দস্যুহা ভীম উগ্রঃ
সহস্রচেতাঃ শতনীথ ঋভ্বা—

যিনি শূরেভির্হব্যো যশ্চ ভীরুভি
র্যো ধাবদ্ভির্হূয়তে যশ্চ জিগ্যুভিঃ—

ঐতরেয়ব্রাহ্মণের অনেক স্থানে আছে, অশ্নুতেহ প্রজানামৈশ্বর্যমাধিপত্যম্। প্রজাগণের ঈশ্বরত্ব অধিপতিত্ব লাভ করে। ও প্রজাভোগের অর্থও তাই।

* ঋগ্বেদসংহিতা, ১।২৫।১০। ভৌজ্যায় হইতে আতিষ্ঠায় পর্য্যন্ত পদগুলি ব্রাহ্মণে বেশী আছে। এইরূপ মন্ত্রের নাম প্রপদ।

যিনি পতির্বভূথাসমো জনানাম্
একো বিশ্বস্য ভুবনস্য রাজা—

সেই ইন্দ্র ; আদর্শ মন্দ ছিল কি?

আমি বলিয়াছি, এই ঐন্দ্র মহাভিষেক ও রাজসূয়ের পুনরভিষেক অনেকটা একরূপ। প্রভেদও আছে। দ্বিতীয়ে, অভিষেকের পূর্ব্বে অভিষেকজলের শান্তিবাচন করিতে হয়। প্রথমে তাহা নাই। শান্তি-বাচনের মন্ত্র এই। আগে ঋত্বিক্, পরে যজমান বলিবেন—

শিবেন মা চক্ষুষা পশ্যতাপঃ
শিবয়া তন্বোপস্পৃশত ত্বচং মে।
সর্ব্বাঁ অগ্নীঁরপ্সুষদো হুবে বো
ময়ি বর্চো বলমোজো নিধত্ত॥

হে জলদেবতাগণ! শান্ত নেত্রে আমাকে দর্শন করিও, শান্ত তনুতে আমার ত্বক্ স্পর্শ করিও। তোমাদের জলস্থিত বাড়বাদি সকল অগ্নিকে আহ্বান করিতেছি, আমার মধ্যে কান্তি বল ওজঃ নিহিত কর।

শান্তিজলেও অগ্নির আবাহন! বর্চো বলম্ ওজঃ, তাছাড়া কামনা ছিলনা।

এখন অভিষেক। আসন্দীতে রাজা পূর্ব্বমুখ হইয়া বসিবেন। পত্নীও পার্শ্বে বসিবেন, কেন না এ সকল কর্ম্মে দম্পতীর সহাধিকার। সম্মুখে আচার্য্য পশ্চিমমুখ হইয়া দাঁড়াইবেন। এবং, রাজার শীর্ষদেশে একটী আর্দ্রপত্রযুক্ত যজ্ঞডুমুরের শাখা ও একটী সুবর্ণময় কুশাগ্র রাখিয়া তার উপরে পূর্ব্বকল্পিত অভিষেকবারি এই ঋক্, এই যজুঃ, এই ব্যাহৃতি উচ্চারণ করিতে করিতে ঢালিয়া দিবেন—

"ইমা আপঃ শিবতমা ইমা সর্ব্বস্য ভেষজীঃ।
ইমা রাষ্ট্রস্য বর্দ্ধনীরিমা রাষ্ট্রভৃতোঽমৃতাঃ॥

যাভিরিন্দ্রমভ্যষিঞ্চৎ প্রজাপতিঃ
সোমং রাজানং বরুণং যমং মনুম্।
তাভিরদ্ভিরভিষিঞ্চামি ত্বামহং
রাজ্ঞাং ত্বমাধিরাজো ভবেহ ॥
মহান্তং ত্বা মহীনাং সম্রাজং চর্ষণীনাম্।
দেবী জনিত্র্যজীজনদ্ভদ্রা জনিত্র্যজীজনৎ ॥

দেবস্যত্বা সবিতুঃ প্রসবেঽশ্বিনোর্বাহুভ্যাং পূষ্ণো হস্তাভ্যামগ্নেস্তেজসা সূর্য্যস্য বর্চসেন্দ্রস্যেন্দ্রিয়েণাভিষিঞ্চামি বলায় শ্রিয়ৈ যশসেঽন্নাদ্যায়। ভূর্ভুবঃ স্বঃ ॥

এই অভিষেকবারি অতিশয় শান্তিকর। ইহা দারিদ্র্যাদি সকল রোগের ঔষধস্বরূপ। ইহা রাজ্যের অভিবৃদ্ধিহেতু। ইহা রাজ্যের ধারক এবং বিনাশরহিত।

হে ক্ষত্রিয়! যে বারিতে প্রজাপতি ইন্দ্র সোম বরুণ যম এবং মনুকে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন, সেই বারিতে আমি তোমাকে অভিষিক্ত করিতেছি। তুমি ইহজগতে সকল রাজার অধিরাজ হও।

হে ক্ষত্রিয়! তোমার জননীদেবী তোমাকে সকল মহাপুরুষের মহান্, সকল মনুষ্যের সম্রাট করিয়া প্রসব করিয়াছিলেন। তোমার জননী দেবী পুণ্যাত্মা।

হে ক্ষত্রিয়! প্রেরক দেব পরমেশ্বরের অনুজ্ঞায় বল সম্পৎ কীর্ত্তি এবং অন্নসমৃদ্ধির জন্য আমি অশ্বিদ্বয়ের বাহুদ্বারা, পূষার হস্তদ্বারা, সূর্য্যের কান্তিদ্বারা, এবং ইন্দ্রের ইন্দ্রিয়সামর্থ্যদ্বারা তোমাকে অভিষিক্ত করিতেছি।”

তেজঃ, বর্চ্চঃ, ইন্দ্রিয়, বল, শ্রী, কীর্ত্তি! রাগ বহাল্ আছে। প্রথম তিনটা ঋক্, চতুর্থটা যজুঃ।

অভিষেকের পরে আচার্য্য এই মন্ত্রে রাজাকে অভিমন্ত্রিত করিবেন—

প্রাচ্যাং ত্বা দিশি বসবো দেবাঃ ষড়্‌ভিশ্চ পঞ্চবিংশৈরহোভিরভিষিঞ্চন্ত্বেতেন চ তৃচেনৈতেন চ যজুষৈতাভিশ্চ ব্যাহৃতিভিঃ সাম্রাজ্যায়। দক্ষিণস্যাং ত্বা দিশি রুদ্রা দেবাঃ ষড়্‌ভিশ্চ পঞ্চবিংশৈরহোভিরাভিষিঞ্চন্ত্বেতেন চ তৃচেনৈতেন চ যজুষৈতাভিশ্চ ব্যাহৃতিভির্ভৌজ্যায়।

ইত্যাদি। অভিষেক হইল। এখন দক্ষিণা। অভিষেক্তা ব্রাহ্মণকে রাজা সহস্রনিষ্কপরিমিত সুবর্ণ, ভূমি এবং পশু দান করিবেন। পারিলে আরও দিবেন। ~~হে ইংরেজ~~! পরিহাস করিতেছি না, বিধিই এই।

তারপর—আমি যেমন আছে তেমনই লিখিতেছি—তারপর আচার্য্য এককাংস্যপাত্র সুরায় পূর্ণ করিয়া রাজার হাতে দিবেন। দিবার কালে মন্ত্রে বলিবেন—

স্বাদিষ্ঠয়া মদিষ্ঠয়া পবস্ব সোম ধারয়া।
ইন্দ্রায় পাতবে সুতঃ॥ RV. 9, 1, 1

হে সোম! তোমার স্বাদুতম মদিরতম ধারায় যজমানকে শোধিত কর। ইন্দ্রের পানার্থ তুমি অভিষুত হইয়াছ।

রাজা সেই কাংস্যপাত্রস্থ সুরা এই দুই মন্ত্রে পান করিবেন—

যদত্র শিষ্টং রসিনঃ সুতস্য
যদিন্দ্রো অপিবচ্ছচীভিঃ।
ইদং তদস্য মনসা শিবেন
সোমং রাজানমিহ ভক্ষয়ামি॥
অভি ত্বা বৃষভা সুতে সুতং সৃজামি পীতয়ে।
তৃম্পা ব্যশ্নুহী মদম্॥

ইন্দ্র যাহা কর্ম্মবিশেষের দ্বারা সংস্কৃত করিয়া পান করিয়াছিলেন, এই পাত্রে সেই রসযুক্ত অভিষুত দ্রব্যের যেটুকু অবশিষ্ট আছে, শান্তমনে সোমতুল্য সেইটুকু আমি এই পান করিতেছি।

হে শ্রেষ্ঠ ইন্দ্র! তোমার জন্য অভিষুত হইয়াছে, অভিষুত দ্রব্য তোমারই হাতে দিতেছি। তৃপ্ত হও, পরম হর্ষ লাভ কর।

অপিবৎ শচীভিঃ—ডাক্তার মার্টিন্ হগ্ ইহার অনুবাদ করিয়াছেন Drank with his associates. শচীতে তিনি সচিব বুঝিয়াছেন! ইন্দ্রাণী বুঝিলে এ মদিষ্ঠা সুরা আরও মাদিনী হয়। কিন্তু অনুবাদ হয় না। বেদে শচীশব্দে বাক্য, কর্ম্ম এবং প্রজ্ঞা বুঝায়, আর কিছু বুঝায় না। সচিবও না, ইন্দ্রাণীও না।

সুরাপান করিয়া রাজা এই দুই ঋক্ উচ্চারণ করিবেন—

অপাম সোমমমৃতা অভূমা
গন্ম জ্যোতিরবিদাম দেবান্।
কিং নূনমস্মান্ কৃণবদরাতিঃ
কিমু ধূর্ত্তিরমৃত মর্ত্ত্যস্য ॥
শংনো ভব হৃদ আ পীত ইন্দো
পিতেব সোম সূনবে সুশেবঃ।
সখেব সখ্য উরুশংস ধীরঃ
প্রণ আয়ুর্জীবসে সোম তারীঃ ॥

হে মরণহীন সোম! তোমাকে পান করি, তবে আমরাও অমৃত হইব। আমরা দ্যুতিমান্ স্বর্গলোকে গিয়াছি, আমরা দেবতাদিগকে চিনিয়াছি। শত্রুতে আর এখন আমাদের কি করিবে? মানুষ হই, তবু বা হিংসকে আমাদের কি করিবে?

হে সোম! পিতা যেমন পুত্রের, সখা যেমন সখার সুখকর হয়েন, পীত হইয়া তুমিও আমাদের হৃদয়ের সেইরূপ সুখকর হও! হে বহু-কীর্ত্তি! তুমি ধীর, জীবনের জন্য আমাদের আয়ুঃ বর্দ্ধিত কর।

রাজসূয়েও যজমানকে সুরা পান করিতে হয়। যৎ সুরা ভবতি ক্ষত্ররূপং তৎ। রাগ কর আর যাই কর, ক্ষত্রিয়েরা মদ খাইত। মহেন্দ্রশৈলে রঘুসেনার মত, সুরাবীর্য্য শত্রুবীর্য্য একসঙ্গে পান করিত।

'মার্টিন্ হাউস্ মহামহোপাধ্যায় ব্রাহ্মণদের দ্বারা সোমরস প্রস্তুত [redacted] করাইয়া পান করিয়া বলিয়াছেন — "It is a nasty drink".

মিতাক্ষরাকার দেখাইয়াছেন, ধর্ম্মশাস্ত্রেও পৈষ্টী * সুরা ছাড়া আর কোন সুরা ক্ষত্রিয়ের পক্ষে নিষিদ্ধ নয়। লাইকর্গসের বিধানে যে যবন মাংসও কদাচিৎ খাইতে পাইত মাত্র, তারও সুরাপান নিষিদ্ধ ছিল না। বৃথামাংস ভক্ষণ ক্ষত্রিয়েরওনিষিদ্ধ, কিন্তু সুরাপানে আমি বৃথা অবৃথা পাই নাই। কিন্তু তাই বলিয়া তারা অমিতপায়ী ছিল, এমত দেখাইতে পারিবে না। বেদোক্ত ক্ষত্রিয়েও না, স্পার্টাবাসী যবনেও না। হিমালয় পাদে থাকিয়াও ক্ষত্রিয় ইংরেজের পূর্ব্বপুরুষ টিউটন্‌জাতির মত চিরন্তন-শিশিরযামিনী অবিরলগলজ্জলিত সুরায় জ্বালাইয়া রাখিত না। তবু একটা কথা নজর করিবার আছে। পাঠক দেখিবেন, পানমন্ত্রগুলির সকলেরই দেবতা সোম। সোমরস বেদের পবিত্র পান। °মার্টিন্ হগ্ (হাউস্) নিজমুখে খাইয়া দেখিয়াছেন, সে রস সুরার মত স্বাদু বা মাদক নয়। যাগে ছাড়া তাওখাইবার বিধি নাই। অভিষেকসুরায় সেই সোমের আরোপ হইতেছে। একটা অর্থবাদে তাহা আরও পরিস্ফুট—

যো হ বাব সোমপীথঃ সুরায়াং প্রবিষ্টঃ সহৈবৈতেনৈন্দ্রেণ মহাভিষেকে-ণাভিষিক্তস্য ক্ষত্রিয়স্য ভক্ষিতো ভবতি ন সুরা।

ইহাতে আমার এই বিবেচনা হয় যে, হয়ত পরম্পরাগত আচারের অনুরোধেই কচিৎ সুরাপান বিহিত হইয়াছিল।

বলিয়াছি, তৈত্তিরীয়কল্পে অভিষেকের পর রাজাকে রথারোহণ করিতে হয়। রথে চড়িয়া অভিষিক্ত রাজা জনপদে বাহির হইতেন! কত শত প্রজারা আসিয়া তাঁর রথ ঘিরিয়া দাঁড়াইত। রাজা প্রার্থনা করিতেন—

অন্নবতামোদনবতামামিক্ষবতামেষাং রাজা ভূয়াসম্।

প্রভূতভক্ষ্যযুক্ত প্রভূতঅন্নযুত প্রভূতক্ষীরাদিরসযুত—যেন এমন গ্রাম-সমূহের রাজা হই।

---

* ব্রীহিযবাদি অন্নের বিকারে [redacted] যথা ধেনো বা হুইস্কি।

কিন্তু তৈত্তিরীয়ের রথ অনেক দিন চলিয়া গিয়াছে।

এ দেশেও অভিষেক ছিল, দেখাইলাম। যে স্পর্দ্ধিনী ধারণা এই মহাভিষেক কল্পিত করিয়াছিল, তাও এই দেশের। বল, বীর্য্য ও ঐশ্বর্য্যের এত তৃষা বুঝি কোনও জাতির ছিল না। অধঃপাতও এমন কোনও জাতির হয় নাই। যে বলিষ্ঠ ওজোঘন অপূর্ব্ব শব্দবন্ধে সে বলিষ্ঠা ধারণা শরীরিণী হইয়াছিল, বার বার পাঠককে বিরক্ত করিয়া আমি তাহাও তুলিয়া দেখাইয়াছি। তিন সহস্র বৎসর পরে আজিও তাহা তেমনই বলিষ্ঠ, নষ্ট পৌরুষের মহারসায়ন।

শ্রীঅবিনাশ চন্দ্র গুহ।
এম্‌-এ।

কলাশিক্ষা।

(২)

পূর্ব্ব প্রবন্ধে কলাভ্যাস সম্বন্ধে অনেকগুলি বিষয়ের অবতারণা করা গিয়াছে। তন্মধ্যে কলাশিক্ষার সোপানও প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা গিয়াছে। স্থূলতঃ তিনটি সোপান উল্লেখ করা যাইতে পারে। (১) দেশের যাবতীয় কারুকর্ম্মালয়—অর্থাৎ দেশের প্রত্যেক কারুকের কর্ম্মস্থান; (২) করশিক্ষালয় বা ম্যানুয়েল ট্রেনিং স্কুল—ইহা এদেশে নাই, কিন্তু আবশ্যক; (৩) দেশের ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ও বিদেশের টেকনিকাল কলেজ। এক্ষণে ঐ তিনটি সোপান সম্বন্ধে দুই চারি কথা বলা যাইবে।

(১) মায়াবাদপরীক্ষা।

বেদান্তের অদৃষ্ট ভাল, কেন না তার প্রতি ইংরেজীশিক্ষিতদেরও নজর পড়িয়াছে। নজর অনেক দিনই পড়িয়াছিল, এখন আরও বেশী পড়িয়াছে। পথও আর তেমন দুর্গম নাই। কলিকাতাবিশ্ববিদ্যালয়ে শ্রীগোপাল বসু মল্লিকের ফেলোশিপ্ স্থাপিত হইয়া এই এক মহৎ কাজ হইয়াছে যে, অনেকেই এখন ইচ্ছা করিলে সংস্কৃত বা ইংরেজী না জানিয়াও মোটামুটি ভারতীয় প্রায় সকল দর্শনের, বিশেষতঃ শাঙ্করদর্শনের উৎকৃষ্ট জ্ঞান লাভ করিতে পারেন। গত পাঁচ বৎসরের ফেলোর বক্তৃতায় যে পাণ্ডিত্য প্রদর্শিত হইয়াছে, এ দেশে তার তুলনা পাওয়া কিছু কঠিন। সে বক্তৃতা শুদ্ধাদ্বৈতবাদের উপন্যাসমাত্র নয়। শুধু উপন্যাসে পাঁচ বৎসর লাগে না। আস্তিক নাস্তিক, ভারতীয় প্রায় সকল বিরোধী মত খণ্ডিত করিয়া তবে তাহাতে শুদ্ধাদ্বৈতবাদ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এক দিকে যতদূর সম্ভব, তার অনেকটা পাইয়াছি। অনেকটা বলিতেছি, কেন না দুই একটা বিরোধী বাদ আরও বিস্তৃত রূপে আলোচিত হওয়া উচিত ছিল। জ্ঞাতির শত্রু জ্ঞাতি যেমন হয়, তেমন আর কেহ হয় না। শুদ্ধাদ্বৈতী শঙ্করেরও প্রধান শত্রু বিশিষ্টাদ্বৈতী রামানুজ। রামানুজের অনেক গ্রন্থ এখন প্রকাশিত হইয়াছে। শাঙ্করদর্শনের বিরুদ্ধে রামানুজের আপত্তিগুলি অতিস্পষ্টরূপে শ্রীভাষ্যে বিবৃত আছে। সেগুলি একে একে সমস্ত আলোচিত হওয়া উচিত ছিল। রামানুজ খাড়া থাকিতে তারজেও শঙ্করদিগ্বিজয় অপূর্ণ রহিয়া যায়। আর এককথা। কালক্রমে শাঙ্কর পরিণাম লাভ করিয়াছিল, এমত আশঙ্কা করিবার কারণ আছে। মূলসিদ্ধান্তে নয়—কিন্তু অবান্তরসিদ্ধান্ত ও যুক্তিপ্রণালীতে কচিৎ সংস্কার, কচিৎ পরিষ্কার, অনেক পরিপুষ্টি হইয়া থাকিবে। খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দীর পূর্ব্বসন্ধ্যায় শঙ্করের যৌবনোদয়। তার ৮০০ বৎসর পরে সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে অপ্যয়দীক্ষিত জীবিত ছিলেন। আচার্য্যের গ্রন্থাবলী হইতে অপ্যয়দীক্ষিতকৃত শাস্ত্রসিদ্ধান্তলেশসংগ্রহের টীকা পর্য্যন্ত, এই ৮০০ বা ৯০০ বৎসরের প্রায় সমস্ত প্রধান প্রধান বেদান্তগ্রন্থ এখন কলিকাতা, কাশী, পুনা, বোম্বাই, মহীশূর এবং মান্দ্রাজপ্রদেশের কুম্ভকোণম্ নগরে মুদ্রিত হইয়াছে। এখন আর মসলার অভাব নাই। কিন্তু কারিকর চাই। গত পাঁচ বৎসরের ফেলো সে পরিণামধারা দেখান নাই। যে বিদ্যা বুদ্ধি প্রতিভা এ কার্য্যে আবশ্যক, তা একাধারে তাঁরই ছিল। ভবিষ্যতে যিনি বেদান্তদর্শনের জীবনবৃত্ত লিখিবেন, তাঁহাকে এই পরিণামের ইতিহাস দেখাইতে হইবে। মোক্ষমূলরের বেদান্তবক্তৃতা বা ষড়্দর্শনীতে তাহা নাই। ডএসেন্ প্রভৃতির জর্ম্মান্ গ্রন্থে আছে কি না, আমি বলিতে পারি না।

কিন্তু ঐ বক্তৃতার সর্ব্বাপেক্ষা শোচনীয় অভাব এই যে, উহা মহৈশ্বর্য্যশালী ইউরোপীয়দর্শনের সাহায্য পায় নাই। তা পাইলে অনেক অনাবশ্যক জঞ্জাল কাটিয়া যাইত। পক্ষান্তরে, অনেক ম্লান সিদ্ধান্ত উজ্জ্বল

* The Vedanta and Its Relation to Modern Thought. By Sitanath Tattvabhushan. Vol. I., B. M. Press, Calcutta.

হইত। নব্য ইউরোপের দার্শনিক প্রণালীও আমাদের প্রণালী হইতে উৎকৃষ্ট। সীতানাথ বাবুর গ্রন্থে পাঠক যে উৎকর্ষ দেখিতে পাইবেন। কিন্তু শুধু সাহায্যের কথা কেন? যে জ্ঞানস্রোতঃ খ্রীষ্টজন্মের ৬০০ বৎসর পূর্ব্বে আরম্ভ হইয়াছিল, যে স্রোতে কাণ্ট দর্শনের মহাপ্রপাত, হেগেলে যার সাগরসঙ্গম, এ কালে তার অবহেলা করিতে কাহারও অধিকার নাই। বিশেষতঃ যিনি শুদ্ধাদ্বৈতবাদপ্রতিষ্ঠায় সমুৎসুক, তাঁহাকে জর্ম্মান্ দর্শন তুচ্ছ করিলে চলিবে না। শঙ্করের এক প্রতিদ্বন্দ্বী রামানুজ, আর এক প্রতিদ্বন্দ্বী হেগেল্। হেগেল্‌দর্শন বর্ত্তমান থাকিতে নির্ব্বিশেষবাদের জয়াশা কোথায়?

সে কথাটাও বুঝিয়া দেখিতে বাকী আছে। সংস্কৃতে যাহা সাধ্য, গত পাঁচ বৎসরের শ্রীগোপাল বসু মল্লিক ফেলো তার অনেকটা করিয়াছেন। এ কাজটা ইংরেজীশিক্ষিতকে করিতে হইবে। জর্ম্মান্ দর্শনের অগ্নদঙ্গারে শঙ্করের দর্শন পোড়াইয়া দেখিতে হইবে। একটা ইস্পার উস্পার হইয়া যাওয়া ভাল। ভিখারিণীও জানিয়া গিল্‌টী পরিতে চায় না। ভারতলক্ষ্মীকে গিল্‌টী পরাইব কেন? সীতানাথ বাবুর গ্রন্থে এই অগ্নিপরীক্ষা আছে। পরীক্ষকও হেগেলিয়ান্।

শাঙ্করদর্শনের বিরুদ্ধে সীতানাথ বাবুর আপত্তিগুলি আলোচনা করিবার পূর্ব্বে ঐ দর্শনের দুই একটা কথা স্মরণ করা আবশ্যক। এই পরিদৃশ্যমান জগৎ অত্যন্তবিরুদ্ধ দুইটা ভাগে বিভক্ত দেখি। এক ভাগ অহম্, আমি, চিৎ বা আত্মা। আর এক ভাগ ইদম্, আমি-না, অচিৎ বা জড়। বলা বাহুল্য, এ 'আমি' শুধু প্রবন্ধকার নয়। তোমারও চিদংশ 'আমি', অচিদংশ 'আমি-না'। কিন্তু অত্যন্ত বিরুদ্ধ হইলেও চিদচিৎ অত্যন্ত অসংবদ্ধ নয়। আমি বিষয়ী, জড়বর্গ বিষয়। আমি জ্ঞাতা, জড়বর্গ আমার জ্ঞেয়। চিদচিতে সম্বন্ধ আছে। কিন্তু এ সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হইল কিরূপে? চিদচিতের মিলনসম্ভাবনা কই?

একটা দৃষ্টান্ত দিই। আমি এই ফুলটী দেখিতেছি। প্রথম, কুসুম সুপুঞ্জে একপ্রকার আণবস্পন্দন। পরে তার বেগে স্পন্দিত আকাশ, আকাশে তরঙ্গপরম্পরা। তার পরে রেটিনানামক চক্ষুর একটা পর্দায় বিপর্য্যস্তপ্রতিবিম্বরূপে ঐ তরঙ্গপরম্পরার সম্পাত। পরে আবার তার বেগে তৈজসস্নায়ুর স্পন্দন এবং মস্তিষ্কের কক্ষা বিশেষে সেই স্পন্দনের সংক্রমণ। শেষ, মস্তিষ্কের ঐ কক্ষায় কতকগুলি আণব বিকার। অণুতে আরম্ভ, অণুতে শেষ। আগাগোড়া মাঝামাঝি সব জড়। তার পর? তার পর, ফুলজ্ঞান। কিন্তু জ্ঞান আর জড় নহে। মস্তিষ্কের আণব বিকারকে বুদ্ধি বলিতে হয় বল, কিন্তু জ্ঞান বলিতে পার না। কঠোপনিষদ্ভাষ্যে আচার্য্যও বলিয়াছেন—

বুদ্ধির্ব্বুদ্ধিশব্দবাচ্যমধ্যবসায়াদ্যাত্মকং ভূতসূক্ষ্মম্।*

বুদ্ধি ভৌতিক। তাই কূটস্থদীপে আছে—

আভাসহীনয়া বুদ্ধ্যা জ্ঞাতত্বং নৈব জন্যতে।
তাদৃগ্‌বুদ্ধের্বিশেষঃ কো মৃদাদেঃ স্থাবিকারিণঃ॥†

জ্ঞান জড় নহে, চিদাভাস। কিন্তু জড় মস্তিষ্কের জড় পরিণাম হইতে এই অজড়

* ১।৩।১০।

† পঞ্চদশী, ৮।৮।

চিদ্রূপী জ্ঞানের জন্ম হইল কিরূপে? না বুঝিয়া হাক্‌লি টিণ্ডাল্ অবাক্ হইয়াছিলেন। সূত্রভাষ্যের টীকায় আনন্দগিরিও এক স্থানে * আশঙ্কা করিতেছেন—

অসংসর্গিত্বাদেব বিষয়বিশেষাসংসর্গে কুতস্তজ্জ্ঞানম্।

আত্মার সহিত যদি বিষয়বিশেষের সংসর্গ না ঘটে, তবে বিষয়বিশেষ প্রকাশিত হয় কিরূপে? শঙ্করাচার্য্যকৃত শ্রীদক্ষিণামূর্ত্তিস্তোত্রের † টীকায় স্বয়ম্প্রকাশযতির আশঙ্কা আরও পরিস্ফুট—

জড়স্য জগতঃ প্রত্যক্‌চৈতন্যেন সহ সংযোগাদ্যন্যতমসম্বন্ধাসম্ভবেন প্রতীচঃ সকাশাজ্জগজ্জ্ঞানং ন স্যাৎ।

প্রত্যগাত্মার সহিত জড় জগতের সংযোগ বা অন্য কোনও সম্বন্ধ সম্ভবপর নহে বলিয়া প্রত্যগাত্মায় জগৎপ্রকাশ সিদ্ধ হইয়া উঠে না। অধ্যাসভাষ্যে যুষ্মদস্মদের যে "ইতরেতরভাবানুপপত্তি" কথিত হইয়াছে, তারও এক অভিপ্রায় এই বোধ হয়।

কিন্তু এ সকল অনর্থক সংশয় কেন? ফুল যে আমি দেখিতেছি, তাহাতে তো আর সংশয় নাই। চিৎ অচিৎকে জানিতেছে, এ তো সিদ্ধ অপরোক্ষ সত্য। তবে আর চিদচিতে একটা অলঙ্ঘ্য ব্যবধান আছে বলি কিসে? জ্ঞানেই ত সব ব্যবধান লঙ্ঘিত হইতেছে। আর, এ যে আপনার রচিত জালে আপনি ধরা পড়িয়াছ। জড় তো জ্ঞানের কারণই নহে। যদি জড়ই জ্ঞানের কারণ হয়, তবে জিজ্ঞাসা করি, জড় আছে কি নাই? যদি নাই থাকে, তবে আর কারণ হইবে কে? আর যদি থাকে, তবে তার অস্তিত্বে প্রমাণ কি? ইহার একমাত্র উত্তর হইতে পারে—জড়কে জানিতেছি, অতএব জড় আছে। 'আছে'র অর্থই তাই বটে। জড়ের অস্তিত্বও তবে জ্ঞানের অপেক্ষা রাখে। অতএব জ্ঞানকালের পূর্ব্বকালেও—জ্ঞানছাড়াও—একটা শুদ্ধ জড় আছে, এমত বলিতে পার না। জড় তবে জ্ঞানের পূর্ব্ববর্ত্তী নহে। কিন্তু কারণকে কার্য্যের পূর্ব্ববর্ত্তী হওয়া চাই। অতএব জড় জ্ঞানের কারণ নহে। যা লইয়া কার্য্যকারণশৃঙ্খলা গাঁথিয়াছ, সে শৃঙ্খলায় তারে বাঁধিবে কিরূপে? পরলোকগত অধ্যক্ষ কেয়ার্ডের গ্রন্থে এইরূপ একটা উত্তর আছে। কিন্তু উত্তরটা প্রাচীন।

জ্ঞানব্যতিরেকে জড়ও নাই, অতএব জড় জ্ঞানের কারণ নহে। কিন্তু চক্ষু বুজিলে আর আমি ফুলটী দেখিতে পাই না। ফুলের স্মৃতি থাকিতে পারে, কিন্তু ফুলের প্রত্যক্ষ থাকে না। ফুল আর চক্ষুর অন্তরালপথে কোনও অস্বচ্ছ দ্রব্য থাকিলে, আমি চক্ষু মেলিয়াও ফুলটী দেখিতে পাই না। যার চক্ষে ছানি পড়িয়াছে বা অন্য কোনও কারণে যার চক্ষুরিন্দ্রিয় অশক্ত, এক কথায় যে অন্ধ, সে অব্যবধানে চক্ষু মেলিয়াও ফুলটী দেখিতে পায় না। পক্ষান্তরে, মনঃসংযুক্ত নির্দ্দোষ চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সহিত ফুলের সংযোগ ঘটিলে ফুলটী প্রত্যক্ষ হয়। এ বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগের তাৎপর্য্য কি বলিয়াছি, কুসুমাণুর স্পন্দনবিশেষ হইতে আরম্ভ করিয়া চরমে মস্তিষ্কের কক্ষাবিশেষে কতকগুলি আণব বিকার। এ সকলই জ্ঞানে আছে, জ্ঞানব্যতিরেকে ইহার কিছু নাই সত্য। কিন্তু এ সকলই যে জড় আমি-না, তাও আমি জ্ঞানেই

* ২।৩।১৮।

† এই মহাস্তোত্র মহীশূরে Bibliotheca Sanskrita নামক গ্রন্থাবলীতে প্রকাশিত হইয়াছে।

জানিতেছি। আরও জানিতেছি যে, এই জড়সামগ্রী থাকিলে আমার ফুলপ্রত্যক্ষ হয়, এই জড়সামগ্রী না থাকিলে আমার ফুলপ্রত্যক্ষ হয় না। যে অব্যভিচারী অন্বয়ব্যতিরেকজ্ঞান কার্য্যকারণসম্বন্ধগ্রহের নিয়ামক এখানেও তাহা বিদ্যমান। তবে জড় আমার ফুলপ্রত্যক্ষের কারণ নয় কেন? কার্য্যকারণভাব তো হেগেলের হুকুমে ফিরিবে না।

কেয়ার্ডের গ্রন্থে আমি ইহার উত্তর পাই নাই। কিন্তু কথাটা তাঁর মনেও জাগিয়া থাকিবে। নহিলে ঐরূপ জ্ঞানের একটা কিছু কারণ ও ইঙ্গিত করিবেন কেন? এদেশী বিচারে একটা তুষ্যতুদুর্জ্জনন্যায় আছে। তার অর্থ, "এ তো আচ্ছা নাছোড়বান্দা! নে, তবে নে!" অনিচ্ছায়ও কিছু ছাড়িতে হয়। কেয়ার্ডও বলেন, * যদি কোনও অর্থে এমত বলা যায় যে মস্তিষ্কপ্রভৃতি জীবিতদেহসংস্থান হইতে জ্ঞান অভিব্যক্ত হয়, তবে সে এইজন্য মাত্র যে আত্মচৈতন্যেই প্রথম যার স্ফুট বিকাশ দেখি, সেই স্বস্বরূপে পরাবৃত্তির অঙ্কুর ঐ দেহসংস্থানেও আছে। স্বস্বরূপে পরাবৃত্তি অর্থাৎ আমি-নাকে জানিয়া তার "বিধরণ" আমিতে ফিরিয়া আসা। কথাটা হেগেলের। বেদান্তীরা যাহাকে অহঙ্কার বা বিজ্ঞানময়কোশ বলেন, ইহা তার অসাধারণ লক্ষণ বটে। জীবিতদেহ সংস্থান বা প্রাণময়কোশেও ইহার অঙ্কুর আছে, কেয়ার্ডের ইঙ্গিতে তাই বোধ হয়। কিন্তু পাঠক দেখিবেন, এ ইঙ্গিতে উপস্থিতের উপকার নাই। আমার চৈতন্য আর আমার দেহসংস্থানের ঐ চিদঙ্কুর, এ দুই ভিন্ন না অভিন্ন? যদি ভিন্ন হয়, তবে আমার মস্তিষ্কের ফুলপ্রত্যক্ষে আমার ফুলপ্রত্যক্ষ হইবে কেন? তুমি সন্দেশ খাইলেই তো আমার সন্দেশ খাওয়া হয় না। আমি আর আমার মস্তিষ্কও এক নহে। এমনই একটা কল্পনার আর এক পিঠ্ দেখিয়া বাচস্পতিমিশ্র হাসিয়াছিলেন,

তথা চৈকস্মিন্দেহে বহবশ্চেতয়েরন্। ন চ বহূনাং চেতনানামন্যোন্যাভিপ্রায়ানুবিধানসম্ভব ইত্যেক-পাশনিবদ্ধা ইব বহবো বিহঙ্গমা বিরুদ্ধদিক্‌ক্রিয়াভি-মুখাঃ সমর্থা অপি ন হস্তমাত্রমপি দেশমতিপতিতুমুৎ-সহন্তে! (১)

অধিকন্তু, আমার মস্তিষ্কের চৈতন্যই বা জড় ফুলটাকে জানিবে কিরূপে? পক্ষান্তরে যদি আমার চৈতন্য ও আমার দেহসংস্থানের চৈতন্য অভিন্ন হয়, তাহাতেও সেই এক সমস্যাই ফিরিয়া আসে। যে মুহূর্ত্তে দেহসংস্থানে 'আমি' স্বস্বরূপে পরাবৃত্ত, সেই মুহূর্ত্তেই আমার দেহসংস্থানও 'আমি-না' জড় অচিৎ। জীবিতদেহসংস্থানই 'আমি', এমত বলিতে পার না। জীবিতদেহসংস্থান প্রাণময়কোশ, জীবন বা প্রাণ বলিতে নিঃশ্বাসপ্রশ্বাস রক্তসঞ্চলন লালাপিত্তঘর্ম্ম-মূত্রাদিরসোদ্‌গম স্নায়ুমণ্ডলের প্রতিক্রিয়া-সামর্থ্য প্রভৃতি বুঝি। এ সব আমার হইতে পারে, কিন্তু 'আমি' এ সব নহি। এ সমস্ত প্রমাণমাত্রসিদ্ধ, কিন্তু সকল প্রমাণের আশ্রয় 'আমি' স্বয়ংসিদ্ধ। আমি চেতন, এ সকল জড়। জড়চেতনের অর্থই তাই। জড় অন্যাধীনপ্রকাশ, চেতন স্বপ্রকাশ। এ প্রভেদটা পাঠক ভুলিবেন না। তাই পঞ্চকোশবিবেকে আছে—

পূর্ণো দেহে বলং যচ্ছন্নক্ষাণাং যঃ প্রবর্ত্তকঃ।
বায়ুঃ প্রাণময়ো নাসাবাত্মা চৈতন্যবর্জনাৎ। (২)

* An Introduction to the Philosophy of Religion, New Edition, pp. 109–110.

(১) ভামতী, ৩।৩।৫৪।

(২) পঞ্চদশী, ৩।৫।

প্রাণময়কোশ আত্মা নহে, কেননা তার চৈতন্য নাই। আবার সেই সংশয়, অচিৎ হইতে চিদ্রূপী জ্ঞানের জন্ম হইল কিরূপে?

প্রাণময় জড়ের মত প্রাণহীন জড়েও চৈতন্য কল্পনা করিয়া লাভ নাই।† ফুল চেতন বা স্বপ্রকাশ হইলেও আমি তাকে জানিতেছি কিরূপে? ফুলের চৈতন্য আর কিছু পিছন হইতে গুটি গুটি আসিয়া আমার চৈতন্যের চোক চাপিয়া ধরিয়া বলিবে না, "এই ফুল, আমি ফুল দেখিতেছি"! স্বয়ম্প্রকাশযতির কথা উদ্ধৃত করি—

কেচিত্তু বিষয়নিষ্ঠস্ফুরণেন ঘটাদিভানমিতি কথয়ন্তি। তদপি ন। বিষয়নিষ্ঠস্যাত্মনা সহ সম্বন্ধাভাবেনাহং জানামীতি সম্বন্ধপ্রত্যয়ানুপপত্তেঃ।

বিষয়স্থিত প্রকাশের সহিত আমার কোনও সংস্রব নাই বলিয়া, আমি জানিতেছি এইরূপ সম্বন্ধজ্ঞান সিদ্ধ হইয়া উঠে না। সন্দেশ খাওয়ার কথাটা এখানেও স্মরণ করিলে ক্ষতি নাই। ফলে প্রাণময় হউক আর প্রাণহীন হউক, যাহা বহিরিন্দ্রিয়গ্রাহ্য বা বহিরিন্দ্রিয়গ্রহণসাপেক্ষ, তাহা চিরদিনই জড়, চিরদিন জড়ই থাকিবে। কুসুমাণুতে চৈতন্যসত্তা আবিষ্কৃত হউক, তাহাতে কুসুমের রূপ গন্ধ স্পর্শ চেতন হইবে না। চৈতন্যের রূপ গন্ধ স্পর্শ নাই। চৈতন্য বহিরিন্দ্রিয়গ্রাহ্য বা বহিরিন্দ্রিয়গ্রহণসাপেক্ষ নয়। চৈতন্য প্রমেয় নয়। যার অনুগ্রহে নিখিলপ্রমেয়সিদ্ধি, সে আবার প্রমেয় হইবে কার? "বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াৎ।" রূপ গন্ধ স্পর্শও তাই চেতন নয়, জড়। কেননা তাহা বহিরিন্দ্রিয়গ্রাহ্য। কুসুমাণুতে চৈতন্য কল্পনা করিয়াও এ জড়গুলাকে তাড়াইতে পারিবে কই?

কথাটা তবে এইরূপ দাঁড়াইতেছে। আমি ফুলটা দেখিতেছি, চিৎ জড়কে জানিতেছে, ইহাতে আর সংশয় নাই। কিন্তু জানিতেছে বলিলেই সব ফুরাইল না। জানে কিরূপে? চিজ্জড়ে সংযোগাদি সম্বন্ধ ঘটিতে পারে না। জ্ঞাতৃজ্ঞেয়সম্বন্ধই বা প্রতিষ্ঠিত হয় কিরূপে? প্রত্যক্ষ চিন্ময়। কিন্তু দেখিয়াছি, যে কারণসামগ্রী তার উৎপত্তিতে আবশ্যক, যা ছাড়া তার উৎপত্তি অসম্ভব, তাহা জড়মাত্র। জ্ঞানব্যতিরেকে জড়ের অস্তিত্ব না থাকিলেও, জড়ের জড়ত্ব বা প্রত্যক্ষকারণত্ব তাহাতে উড়িয়া যায় না। চিজ্জড়ভেদ বা জড়ের প্রত্যক্ষকারণত্বও জ্ঞানেই আছে। এখন, জড় হইতে জড়ের উৎপত্তি বুঝা যায়। কুসুমাণুপুঞ্জের স্পন্দনবিশেষ হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে আকাশতরঙ্গ, রেটিনায় প্রতিবিম্ব, তৈজসস্নায়ুর স্পন্দন, মস্তিষ্কের কক্ষাবিশেষে আণব বিকার, এ সকল বুঝিতে পারি, কেন না এ সকলই জড়। কিন্তু জড় মস্তিষ্কের জড় পরিণাম হইতে অত্যন্তবিরুদ্ধ এই অজড় চিদ্রূপী প্রত্যক্ষের জন্ম হয় কিরূপে? দেকার্ৎ, গএলিঙ্ক্স্, মাল্‌ব্রাঁশ্ বা লাইব্‌নিট্‌সের ঈশ্বরনামক জবরদস্ত মিস্ত্রীটাকে ডাকিয়া আনিয়া চিজ্জড়ে একটা পেরেক মারিয়া লইলে সহজে গোল চুকিয়া যায়। জড় হইতে স্বভাবতঃই চিৎ

† আমি বলিতে বাধ্য, সূত্রভাষ্যের এক স্থানে—২।১।৬—আচার্য্যও সমস্ত জগতের চেতনতা মানিয়া লইতেছেন। সমস্ত জগৎই চেতন। তবে কোথাও চৈতন্য অভিব্যক্ত, কোথাও অভিব্যক্ত নয়, প্রভেদ এই। কথাটায় লাইব্‌নিট্‌সের Monadology মনে পড়ে। কিন্তু টীকাকারেরা বুঝাইয়াছেন, ঐ ভাষ্য অভ্যুপগমমাত্র। আর পরমসিদ্ধান্ত হইলেও, পাঠক দেখিবেন, তাহা প্রত্যক্ষের কারণরূপে উপস্থিত নয়।

জন্যে মানিলে গোলই থাকে না। আর তা না হইলে একটা সদুত্তর চাই। বেদান্তে কি উত্তর আছে, আর এক বারে দেখিব।

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র গুহ।

এম্‌-এ।

মধ্যশ্রেণীয় ব্রাহ্মণ। (২)

পণ্ডিত লালমোহন বিদ্যানিধি, তাঁহার স্বনাম-খ্যাত "সম্বন্ধ-নির্ণয়" নামক পুস্তকে বঙ্গদেশের প্রায় সর্ব্বপ্রকার ব্রাহ্মণ-গণের বিবরণ সন্নিবেশিত করিয়াছেন। সুতরাং মধ্যশ্রেণীয় ব্রাহ্মণ-গণের একটী বিবরণ উক্ত পুস্তকে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। বিদ্যানিধি-সংগৃহীত উক্ত বিবরণ কতদূর প্রামাণিক ও সমীচীন, তাহার আলোচনা করা যাইতেছে।

প্রথমতঃ। সম্বন্ধ-নির্ণয়কার মধ্যশ্রেণীয় ব্রাহ্মণ-গণের বাসস্থান নির্দ্দেশ করিতে গিয়া লিখিয়াছেন—"মেদিনীপুর, বাঁকুড়া ও তৎপ্রদেশের নিকটবর্ত্তী পশ্চিম দক্ষিণাঞ্চলে এই শ্রেণীর কতকগুলি লোক আছেন। তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলে পরিচয় পাওয়া যায় যে, তাঁহারা মধ্যশ্রেণী" ইত্যাদি। (১৩)

বর্ত্তমান সময়ে, কেবলমাত্র মেদিনীপুর জেলার প্রায় সর্ব্বত্রই মধ্যশ্রেণীয় ব্রাহ্মণ-গণের বাস দেখিতে পাওয়া যায়। যদিও বৈদ্যবাটী, কালীঘাট, কলিকাতা ও শ্রীরামপুর প্রভৃতি স্থানে, কতিপয় মধ্যশ্রেণীয় ব্রাহ্মণ, কেহ বা ২।৩ ও কেহ বা ৪।৫ পুরুষ, বাস করিতেছেন বটে; তথাপি তাঁহাদের মেদিনীপুর জেলাস্থ জাতি-বর্গ, অদ্যাপি তাঁহাদের মেদিনীপুর জেলাস্থ আদি বাসস্থানগ্রামে বাস করিতেছেন। মেদিনীপুর জেলা ব্যতীত "বাঁকুড়া ও তৎপ্রদেশের নিকটবর্ত্তী পশ্চিম ও দক্ষিণাঞ্চলে" মধ্যশ্রেণীর ব্রাহ্মণ-গণের বাস থাকিলে তাঁহাদের সহিত মেদিনীপুর জেলার বর্ত্তমান মধ্যশ্রেণীয় ব্রাহ্মণ-গণের, নিশ্চয়ই কুটুম্বিতাসূত্রে, অথবা অন্য কোন কারণে, সংস্রব থাকিত, সন্দেহ নাই। কিন্তু এ পর্য্যন্ত এই প্রকার কোন সংস্রব অথবা বাঁকুড়া অঞ্চলে মধ্যশ্রেণীয় ব্রাহ্মণগণের বাস সম্বন্ধে, মধ্যশ্রেণীয় ব্রাহ্মণ সমাজে কিছুমাত্র অবগত হওয়া যায় নাই। মেদিনীপুর জেলার বহির্ভাগে "মধ্যশ্রেণীয়" ব্রাহ্মণের নাম শ্রবণ করিলে অনেকেই বিস্মিত হইয়া থাকেন। সুতরাং মধ্যশ্রেণীয় ব্রাহ্মণগণের বাসস্থান নির্দ্দেশ করিতে গিয়া বিদ্যানিধি মহাশয় যে ভ্রান্ত মত প্রকাশ করিয়াছেন, তদ্বিষয়ে আর অনুমাত্র সন্দেহ নাই।

দ্বিতীয়তঃ। বিদ্যানিধি মহাশয় "মধ্যশ্রেণীয়" ব্রাহ্মণগণের পৃথক্ শ্রেণীবন্ধন কি কারণে ও কি প্রকারে হইয়াছিল, তাহা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, যথাঃ—"তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলে পরিচয় পাওয়া যায় যে, তাঁহারা মধ্যশ্রেণী অর্থাৎ রাঢ়ী, বারেন্দ্র, উৎকল ও সাতশতী প্রভৃতি বিপ্রগণ সঙ্গে দাক্ষিণাত্য বৈদিক ও পশ্চিমাদিগের এক সময়ে পরস্পর আদান প্রদান হয়। তৎকালে যে সকল ব্রাহ্মণ, এই প্রকার শ্রেণীবন্ধন অতিক্রম করিয়া, পরস্পর বিবাহ সূত্রে সম্বন্ধ

(১৩) সম্বন্ধ নির্ণয় দ্বিতীয় সংস্করণ পৃ৫৩।

করিতে পারে? যাহা হাড়ে হাড়ে মিশিয়াছে, তাহা কি আর ছাড়া যায়? এই শোভার বাহার কত দেখ দেখি!! সুরসিক দাশরথী রায় বাঁচিয়া থাকিলে হয়ত গাহিত—

নিশির শোভা শশী যেমন,
শশীর শোভা তারা।
ঐরাবতের ইন্দ্রসভা,
জরার শোভা মরা।
শিখের শোভা তরবারী,
পাঠান শোভা ছোরা।
সাহেব-শোভা সারমেয়,
কেল্লার শোভা গোরা।
নদের শোভা রাইকিশোরী,
ব্রজের শোভা শ্যাম।
ঢাকার শোভা "পাৎক্ষীর",
সরযুর শোভা শ্যাম।
অধ্যাপকের টিকি শোভা;
মেকি শোভা টাকশাল।
ফাঁকির শোভা বিজ্ঞাপনে,
বাকীর শোভা 'কাল।'
তাঁতীর শোভা তাঁতখানা,
দর্জ্জীর শোভা সুতো।
বাঙ্গালীর শোভা বেত্রাঘাতে,
জুতো আর গুঁতো।

এই জুতো আর গুঁতো যতদিন পর্য্যন্ত তোমাদের নিকটে মধু হইতে মধুরতর বলিয়া বিবেচিত হইতে থাকিবে, ততদিন "ভোজনং যত্র তত্র শয়নং হট্ট মন্দিরে," এবম্প্রকার দুর্ব্বিসহ দুরবস্থা হইতে তোমাদের পরিত্রাণ হইবে না, ইহা নিশ্চয়—নিশ্চয়—নিশ্চয়।

শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী।

মায়াবাদপরীক্ষা। (২)

জ্ঞানব্যতিরেকে কিছু নাই। জগতে যাহা কিছু 'আছে', সব জ্ঞানেই 'আছে'। জ্ঞানছাড়া কি না জ্ঞানে নাই অথচ 'আছে', এমত বস্তু অসম্ভব। এ সিদ্ধান্ত বেদান্তেরও মেরুদণ্ড। এ সিদ্ধান্তে যে দর্শন আসিয়া পৌঁছে নাই, সে তো দর্শনই নহে। এ দেশে কথাটা বহুসহস্র বৎসরের পরিচিত। হয়ত পৃথিবীতে এই দেশই কথাটা প্রথম শুনিয়াছিল। ঋগ্বেদের নাসদীয়সূক্তে আছে—

তস্মাদ্ধান্যন্ন পরঃ কিঞ্চনাস। (১)

তাঁহা হইতে পৃথক্ কিছুই হয় নাই। মোক্ষমূলর এই ঋকে অদ্বৈতবাদের আদিবীজ দেখিয়া গিয়াছেন। তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণেরও এক শ্রুতি এইরূপ—

ব্রহ্মন্ হ বিশ্বা ভূতানি। নাবীবান্তঃসমাহিতা। (২)

'ব্রহ্মন্' সপ্তম্যন্ত। নৌকার অভ্যন্তরে যেমন লোক থাকে, বিশ্ব জগৎ সেইরূপ ব্রহ্মে সমাহিত আছে।

মন্ত্রব্রাহ্মণে যাহা আভাসমাত্র, উপনিষদে তাহা পুনঃ পুনঃ পরিষ্কার। উপনিষদের অনেক শ্রুতি সীতানাথ বাবু তুলিয়া দেখাইয়াছেন। সে সকলের পুনরুদ্ধার নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু একটী শ্রুতি তিনি ভুলেন নাই। সে শ্রুতি বৃহদারণ্যকের—

ব্রহ্ম তং পরাদাদ্ যোঽন্যত্রাত্মনো ব্রহ্ম বেদ। ক্ষত্রং তং পরাদাদ্ যোঽন্যত্রাত্মনঃ ক্ষত্রং বেদ।......... সর্ব্বং তং পরাদাদ্ যোঽন্যত্রাত্মনঃ সর্ব্বং বেদ। (৩)

সূত্রভাষ্যে আচার্য্য এই শ্রুতি বুঝাইতেছেন—

(১) ১০।১২৯।২।

(২) ২।৮।৮।

(৩) ২।৪।৬।

যো হি ব্রহ্মক্ষত্রাদিকং জগদাত্মনোঽন্যত্র স্বাতন্ত্র্যেণ লব্ধসত্তাকং পশ্যতি তং মিথ্যাদর্শিনং তদেব মিথ্যাদৃষ্টং ব্রহ্মক্ষত্রাদিকং জগৎ পরাকরোতীতি ভেদদৃষ্টিমপোদ্যেদং সর্ব্বং যদয়মাত্মেতি সর্ব্বস্য বস্তুজাতস্যাঽঽত্মাব্যতিরেকমবতারয়তি। (১)

যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়াদিরূপী জগৎকে আত্মার সহিত সম্পর্কশূন্য স্বতন্ত্র ভাবে অবস্থিত দেখে, সেই মিথ্যাদর্শী ব্যক্তিকে ঐ প্রকার মিথ্যাদৃষ্ট জগৎ পুরুষার্থ হইতে ভ্রষ্ট করিয়া থাকে। এই রূপে ভেদদৃষ্টির নিন্দা করিয়া "এই সমস্ত যে, ইহা আত্মা" এই বাক্যে শ্রুতি আত্মা হইতে সকল বস্তুর অপৃথগ্‌ভাব দেখাইতেছেন। ব্রহ্মসূত্রের প্রথমাধ্যায়ে তৃতীয়পাদে সপ্তমাধিকরণে এই সিদ্ধান্তই প্রতিপাদিত হইয়াছে। সেখানে ভাষ্য আরও উজ্জ্বল—

সর্ব্বস্যৈবাস্য নামরূপক্রিয়াকারকফলজাতস্য যাঽভিব্যক্তিঃ সা ব্রহ্মজ্যোতিঃসত্তানিমিত্তা। যথা সূর্য্যজ্যোতিঃসত্তানিমিত্তা সর্ব্বস্য রূপজাতস্যাভিব্যক্তিস্তদ্বৎ।.. যদুপলভ্যতে তৎ সর্ব্বং ব্রহ্মণৈব জ্যোতিষোপলভ্যতে ব্রহ্ম তু নান্যেন জ্যোতিষোপলভ্যতে স্বয়ংজ্যোতিঃস্বরূপত্বাদ্ যেন সূর্য্যাদয়স্তস্মিন্ ভায়ুঃ। ব্রহ্ম হ্যন্যদ্ব্যনক্তি ন তু ব্রহ্মান্যেন ব্যজ্যতে। (২)

সূর্য্যের জ্যোতিঃসত্তায় যেমন সর্ব্ববিধ রূপের অভিব্যক্তি সাধিত হয়, ব্রহ্মের জ্যোতিঃসত্তায়ও তেমনই নামরূপাদিময় নিখিল জগৎ অভিব্যক্ত হইতেছে। যে কিছুর উপলব্ধি হয়, সে সমস্তই ব্রহ্মরূপ জ্যোতির দ্বারা উপলব্ধ হইয়া থাকে। কিন্তু ব্রহ্ম অন্য জ্যোতির দ্বারা উপলব্ধ হয়েন না যে সূর্য্যাদি তাঁহাকে প্রকাশিত করিবে। ব্রহ্ম স্বয়ংজ্যোতিঃস্বরূপ। ব্রহ্ম অন্যকে ব্যক্ত করেন, কিন্তু ব্রহ্ম অন্যের দ্বারা ব্যক্ত হয়েন না। একটা জড়ের উপমায় ভাষ্য কিছু আচ্ছন্ন। শ্রীদক্ষিণামূর্ত্তিস্তোত্রে পরিষ্কার—

যস্যৈব স্ফুরণং সদাত্মকমসৎকল্পার্থগং ভাসতে।

স্ফুরণ অর্থাৎ প্রকাশ। যাঁর সৎস্বরূপ প্রকাশেই অসৎকল্প জগৎ প্রকাশিত হইতেছে। অসৎকল্প, কেন না জ্ঞানসত্তাব্যতীত জগতের সত্তা অসিদ্ধ। ভাষ্যকারের প্রধান শিষ্য সুরেশ্বরাচার্য্য এই স্তোত্রেরও বার্ত্তিককার। বার্ত্তিকের নাম মানসোল্লাস। ইহা সুরেশ্বরকৃত পঞ্চবার্ত্তিকের অন্যতম। মানসোল্লাসে সুরেশ্বর খুলিয়া বলিয়াছেন—

আত্মসত্তৈব সত্তৈষাং ভাবানাং ন ততোঽধিকা।
তথৈব স্ফুরণং চৈষাং নাত্মস্ফুরণতোঽধিকম্ ॥ (৩)

ন ততোঽধিকা, অর্থাৎ আত্মসত্তাব্যতীত জগতের স্বতন্ত্র সত্তা নাই। ভাষ্যবার্ত্তিকের তাৎপর্য্য এই। ব্রহ্ম বা আত্মা জ্ঞানস্বরূপ। জগতের অভিব্যক্তি বা প্রকাশ এই জ্ঞানাধীন। জ্ঞান ছাড়া আবার প্রকাশ কি? আবার সত্তা প্রকাশ একই বস্তু। জ্ঞানে যাহা প্রকাশিত, তাই সৎ—তাই 'আছে'।

বুদ্ধির্হি নঃ প্রমাণং সদসতোর্যাথাত্ম্যাবগমে। (৪)

জ্ঞানই অস্তি নাস্তির কষ্টিপাথর। জগৎ 'আছে', কেন না জগৎ জ্ঞানে প্রকাশিত। সত্তা বা অস্তিত্বের আর কোনও অর্থ নাই।

জগৎ জ্ঞানাধীন। জ্ঞানসত্তাব্যতিরেকে স্বতন্ত্র কিছু নাই। যার সত্তাব্যতিরেকে অপর যার স্বতন্ত্র সত্তা নাই, সেই প্রথম বস্তুকে সেই দ্বিতীয় বস্তুর কারণ (৫) এবং

(১) ১।৪।১৯।

(২) ১।৩।২২।

(৩) ৩।৩।

(৪) কঠভাষ্য, ৬।১২।

(৫) ভাষ্যকার বলেন, উপাদানকারণ। "উপাদানকারণাব্যতিরেকাৎ কার্য্যস্য। নিমিত্তকারণাব্যতিরেকস্তু কার্য্যাস্য নাস্তি লোকে তক্ষঃ প্রাসাদব্যতিরেকদর্শনাৎ।" সূত্রভাষ্য, ১।৪।২৩। আমি ঐ লক্ষণে

সেই দ্বিতীয় বস্তুকে সেই প্রথম বস্তুর কার্য্য বলিয়া থাকি। মৃত্তিকাদি ছাড়া মৃন্ময় ঘট হয় না, তাই মৃত্তিকাদি মৃন্ময় ঘটের কারণ। জ্ঞান ছাড়াও জগৎ নাই। তাই জ্ঞান-স্বরূপ ব্রহ্মই জগতের কারণ। কারণসত্তা-ব্যতিরেকে কার্য্যের স্বতন্ত্র সত্তা নাই। আবার কার্য্যসত্তাব্যতিরেকেও কারণত্ব অসম্ভব। ঘটাদিরূপ বা জগদ্রূপ কার্য্য না থাকিলে মৃত্তিকাদি বা ব্রহ্মেরও কারণত্ব থাকে না। কার্য্য কারণ পরস্পরসাপেক্ষ। অতএব যখনই কোনও কিছুকে কারণ বলিয়া জানিয়াছি, তখনই আর একটা কিছু তার কার্য্যও আছে। কার্য্য হইতে পারে বা হইবে নহে, কার্য্য আছে। অন্যথা সে কিছুরও কারণত্ব থাকে না। (১) উৎপত্তির পূর্ব্বেও তাই কার্য্য সৎ অর্থাৎ আছে। ব্যক্ত রূপে নাই বটে, কিন্তু অব্যক্ত শক্তিরূপে আছে। (২) সে শক্তি কার্য্য হইতে ভিন্ন নয়। ভিন্ন হইলে কারণ অসিদ্ধই রহিয়া যায়, কেন না কারণত্ব কার্য্যসত্তাসাপেক্ষ। আবার, অভিন্নও নয়। কার্য্য ব্যক্ত, শক্তি অব্যক্ত। শক্তি প্রাচীন, ব্যক্ত কার্য্য তার পরভাবী। ভেদে-অভেদ। ভেদ থাকিলেই অভেদ ঘুচিয়া যায় না—

নচ বিশেষদর্শনমাত্রেণ বস্ত্বন্যত্বং ভবতি। নহি দেবদত্তঃ সংকোচিতহস্তপাদঃ প্রসারিতহস্তপাদশ্চ বিশেষেণ দৃশ্যমানোঽপি বস্ত্বন্যত্বং গচ্ছতি স এবেতি প্রত্যভিজ্ঞানাৎ। (৩)

পক্ষান্তরে, কার্য্যেরই রূপান্তর বলিয়া শক্তিও কারণসাপেক্ষ।

যথৈব হীদানীমপীদং কার্য্যং কারণাত্মনা সদেবং প্রাগুৎপত্তেরপীতি গম্যতে। ন হীদানীমপি কার্য্যং কারণাত্মানমন্তরেণ স্বতন্ত্রমেবাস্তি। (৪)

কার্য্যকালেও যেমন কারণসত্তাব্যতিরেকে কার্য্যের স্বতন্ত্র সত্তা নাই, কার্য্যাভিব্যক্তির পূর্ব্বেও তেমনই শক্তিরও স্বতন্ত্র সত্তা নাই। কারণত্ব থাকিলেই শক্তিও থাকে, না থাকিলে থাকে না। কারণত্বের উপ-লব্ধি হইলেই শক্তিরও উপলব্ধি হয়, না হইলে হয় না। অতএব কারণ হইতে শক্তি ভিন্ন নয়। (৫) আবার, অভিন্নও নয়। দেখিয়াছি, শক্তি হইতে কার্য্য ভিন্ন হইয়াও অভিন্ন। এখন শক্তিও যদি কারণ হইতে অভিন্ন হয়, তবে সুতরাং কার্য্যও কারণ হইতে অভিন্ন হইয়া দাঁড়ায়। তাহা ব্যবহার-বিরুদ্ধ—

ন হ্যসত্যতিশয়ে কার্য্যং কারণমিত্যবকল্পতে। (৬)

বিশেষ না থাকিলে এটা কার্য্য, ওটা কারণ এরূপ অনুভব হয় না। অতএব শক্তি কারণ হইতে অভিন্নও নয়। ভেদে-অভেদ। শক্তি কার্য্যেও তাই দেখিয়াছি। ফলে তবে এই দাঁড়াইল যে—

উপাদান নিমিত্ত দুইই বুঝাইতে চাই। ভাষ্যকারেরও এমত অভিপ্রায় নয় যে, রাজমিস্ত্রী ছাড়াও প্রাসাদ নির্ম্মিত হইতে পারে বা রাজমিস্ত্রীর সত্তাব্যতিরেকেও প্রাসাদের সত্তা সিদ্ধ হয়। তবে প্রাসাদ এবং তার উপাদান ইষ্টকাদি একই 'দেশে' ব্যাপ্ত, নিমিত্ত রাজমিস্ত্রী প্রভৃতি সেরূপ নয়। ভাষ্যে অব্যতিরেকের অর্থ তাই।

(১) দ্বয়াশ্রয়ত্বাৎ সম্বন্ধস্য। সূত্রভাষ্য, ২।২।১৭। সতোর্হি দ্বয়োঃ সম্বন্ধঃ সম্ভবতি ন সদসতোরসতোর্বা। ঐ, ২।১।১৮।

(২) Cf. T. H. Green, *Prolegomena to Ethics*, § 76.

(৩) সূত্রভাষ্য, ২।১।১৮।

(৪) ঐ, ২।১।৭।

(৫) বিমতং কারণানতিরিক্তং তদ্ভাবভাননিয়তভাবভানত্বাৎ তৎস্বরূপবৎ। আনন্দজ্ঞান, সূত্রভাষ্য-টীকা, ২।১।১৫।

(৬) সূত্রভাষ্য, ২।২।৪৫।

কারণস্যাত্মভূতা শক্তিঃ শক্তেশ্চাত্মভূতং কার্য্যম্। (১)

শক্তি কারণের আত্মভূত, কার্য্য শক্তির আত্মভূত। অতএব কার্য্যও কারণেরই আত্মভূত। ভাষ্যকার স্পষ্ট বলিতেছেন—

নহি কার্য্যকারণয়োর্ভেদ আশ্রিতাশ্রয়ভাবো বা বেদান্তবাদিভিরভ্যুপগম্যতে কারণস্যৈব সংস্থানমাত্রং কার্য্যমিত্যভ্যুপগমাৎ। (২)

কার্য্য কারণেরই সংস্থানমাত্র, কারণ হইতে ভিন্ন নয়। আবার, অভিন্নও নয়। অভিন্ন হইলে কার্য্য কারণে প্রভেদ দেখিব কেন? ভেদে-অভেদ। আত্মভূত বা সংস্থান-মাত্র, এ সকল কথারও ভঙ্গী সেই। আনন্দ-জ্ঞান ইঙ্গিত করিতেছেন—

রজ্জুরিব ভুজঙ্গস্য কারণমেব কার্য্যস্য তত্ত্বমতোঽনির্বাচ্যং কার্য্যরূপং ভিন্নমিব চাভিন্নমিব চ ভাতি।(৩)

সন্ন্যাসীরা অনেক ভয় দেখায়। রজ্জু-ভুজঙ্গে পাঠক ভয় পাইবেন না। কার্য্য কারণ হইতে ভিন্নও বটে, অভিন্নও বটে। এখন এইটুকুমাত্র বুঝিয়া রাখি। ব্রহ্ম ব্রহ্ম-শক্তি জগৎ পরস্পর ভিন্নও বটে, অভিন্নও বটে। বেদান্তেও Dialectic আছে।

জগৎ জ্ঞানাধীন। দেশ কালও তাই। জগৎ দেশকালেরই ফ্রেমে বাঁধা। কতকটা শুধু কালের, কতকটা দেশকাল দুয়ের, ফ্রেমে বাঁধা। এমনই ফ্রেমে বাঁধা জগচ্ছবি জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মে উদ্ভাসিত আছে। জ্ঞানব্যতিরেকে দেশ কালও নাই, জগৎও নাই। বিয়দধিকরণে ভাষ্যকার বলিয়াছেন—

এতেন দিক্কালমনঃপরমাণ্বাদীনাং কার্য্যত্বং ব্যাখ্যাতম্। (৪)

(১) ঐ, ২।১।১৮।

(২) ঐ, ২।২।১৭।

(৩) সূত্রভাষ্যটীকা, ২।১।১৮।

(৪) সূত্রভাষ্য, ২।৩।৭।

দেশ কালও কার্য্য, জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্ম কারণ। কারণসত্তাব্যতিরেকে কার্য্যের স্বতন্ত্র সত্তা নাই। কিন্তু যে জ্ঞানস্বরূপে দেশ কাল প্রকাশিত, তিনি স্বয়ং দেশকালাতীত। দেশেও নহেন, কালেও নহেন। বৃহদারণ্যকে আছে—

তদেতদ্‌ব্রহ্মাপূর্ব্বমনপরমনন্তরমবাহ্যময়মাত্মা ব্রহ্ম সর্ব্বানুভূঃ। (১)

এই ব্রহ্মস্বরূপে 'পূর্ব্ব' 'পশ্চিম' বা 'ভিতর' 'বাহির' নাই। ইনি আত্মা, সমস্ত পদার্থের অনুভাবক। অনুভাবক যাহা অনুভব করেন, তাহা আপনা হইতে পৃথক্ বলিয়াই অনুভব করিয়া থাকেন। অনুভব বা জ্ঞানের স্বভাবই এই। পূর্ব্ব পশ্চিম ভিতর বাহির প্রভৃতি দেশসম্বন্ধ যিনি অনুভব করেন, তিনিও জানেন, "এ সকল আমি নহি"। তিনি দেশাতীত। তিনি কালেরও অতীত। ভাষ্যকার বলেন—

অতীতানাগতবর্ত্তমানভাবেনান্যথা ভবত্যপি জ্ঞাতব্যে ন জ্ঞাতুরন্যথাভাবোঽস্তি সর্ব্বদা বর্ত্তমানস্বভাবত্বাৎ। (২)

জ্ঞেয় বস্তু কখনও অতীত, কখনও অনাগত, কখনও বা বর্ত্তমান। কিন্তু যিনি অতীত বা অনাগত বা বর্ত্তমান বলিয়া অনুভব করিতেছেন, তিনি জানেন, "এ সকল আমি নহি"। তিনি অতীতও না, অনাগতও না, বর্ত্তমানও না। তিনি ত্রিকালাতীত। অথবা তিনি সর্ব্বদাবর্ত্তমান। গ্রীন্ কেয়ার্ড্ প্রভৃতির গ্রন্থে কথাটা পুনঃ পুনঃ বুঝান আছে। সীতানাথ বাবু আবার বুঝাইয়াছেন।

জ্ঞান ছাড়া কিছু নাই। তবু এই বিশ্ব জগৎটা 'বাহিরে' আছে ভাবি! জ্ঞানের 'বাহিরে' কিছু নাই—

(১) ২।৫।১৯।

(২) সূত্রভাষ্য, ২।৩।৭।

অন্তর্মশ্মিন্নিমে লোকা অন্তর্বিশ্বমিদং জগৎ।
বহির্ব্মায়য়া ভাতি দর্পণে প্রতিবিম্বিতম্॥ (১)

এ মায়াটুকু সীতানাথ বাবুও স্বীকার করিয়াছেন।

কিন্তু "ন তু ব্রহ্মানোন ব্যজ্যতে," এই কথাটার আপত্তি হইতে পারে। জগৎ জ্ঞানাধীন, জ্ঞানপ্রকাশ্য, জ্ঞেয়। কিন্তু জ্ঞেয় হইলেই তার একজন জ্ঞাতাও আছে। 'ইহা' জানিতেছি, অর্থাৎ 'আমি' 'ইহা' জানিতেছি। অহম্ ছাড়া ইদম্ নাই—

অহমিত্যনুসন্ধাতা জানামীতি ন চেৎ স্ফুরেৎ।
কস্য কো বা প্রকাশেত জগচ্চ স্যাৎ সুষুপ্তবৎ॥(২)

'আমি' রূপে যদি জ্ঞাতা 'জানিতেছি' রূপে প্রকাশিত না হয়েন, তবে কার কাছে কি প্রকাশিত হইবে? ব্রহ্ম সেই জ্ঞাতা, জগৎ তাঁর জ্ঞেয়। কিন্তু এই জ্ঞাতৃজ্ঞান ছাড়া যেমন তন্নিরপেক্ষ জগৎ অসম্ভব, এই জ্ঞেয়জগৎ ছাড়াও তেমনই তন্নিরপেক্ষ ঐ জ্ঞাতৃজ্ঞান অসম্ভব। অহম্ ছাড়া ইদম্ নাই, আবার ইদম্ ছাড়াও অহম্ নাই। অতএব জগতের অভিব্যক্তি যদি ব্রহ্মসাপেক্ষ হয়, তবে ব্রহ্মস্বরূপের অভিব্যক্তিও জগৎসাপেক্ষ। কেন না, জগৎপ্রকাশকরূপেই ব্রহ্মস্বরূপের সিদ্ধি। (৩) উদ্ধৃত ভাষ্যে যে ব্রহ্মের কথা হইতেছে, তিনি জ্ঞেয়জ্ঞাতৃরূপদ্বৈতাতীত নির্গুণ ব্রহ্মও নহেন। নির্গুণ ব্রহ্ম জগদ্ব্যঞ্জকও হইতে পারেন না। অতএব ব্রহ্ম অন্যের দ্বারা ব্যক্ত হয়েন না, এ প্রতিজ্ঞা অমূলক।

জ্ঞেয় জ্ঞাতার এই পরস্পরাপেক্ষিতা ভাষ্যকারও না বুঝিয়াছিলেন, এমত নহে। সূত্রভাষ্যেই তার প্রমাণ আছে। বেদান্তমতে অপরব্রহ্ম বা ঈশ্বর নিত্য সর্ব্বজ্ঞ। কিন্তু সৃষ্টির পূর্ব্বে তো জ্ঞেয় কিছুই ছিল না। তবে তাঁর নিত্যজ্ঞান সিদ্ধ হয় কই? সৃষ্টির পূর্ব্বে জ্ঞেয় কিছু না থাকিলেও ঈশ্বর তখনও জ্ঞানময়, প্রথমে আচার্য্য এইরূপ একটু জবরদস্তী করিয়াছিলেন। কিন্তু অব্যবহিত পরেই স্বীকার করিতেছেন, নিত্য সর্ব্বজ্ঞ হইতে হইলে সৃষ্টির পূর্ব্বেও ঈশ্বরের জ্ঞেয় কিছু থাকা আবশ্যক।

কিং পুনস্তৎ কর্ম্ম যৎ প্রাগুৎপত্তেরীশ্বরজ্ঞানস্য বিষয়োভবতীতি। তত্ত্বান্যত্বাভ্যামনির্ব্বচনীয়ে নামরূপে অব্যাকৃতে ব্যাচিকীর্ষিতে ইতি ব্রূমঃ। (১)

সে জ্ঞেয় কি? না, জগদ্বীজভূত নামরূপ। যাহা এখনও ব্যাকৃত হয় নাই, কিন্তু ব্যাকৃত করিব বলিয়া ঈশ্বর ইচ্ছা করিয়াছেন। যাহা ঈশ্বর হইতে ভিন্নও নয়, অভিন্নও নয়, অনির্ব্বচনীয়। এই অনির্ব্বচনীয়ে আমার বড় প্রয়োজন আছে। কিন্তু সে কথা এখন থাক্। দেখিয়াছি, জ্ঞেয় জ্ঞাতার মত শক্তি শক্ত বা কার্য্য কারণও পরস্পরসাপেক্ষ। ভাষ্যকার বলেন—

পরমেশ্বরাধীনা ত্বিয়মস্মাভিঃ প্রাগবস্থা জগতোঽভ্যুপগম্যতে ন স্বতন্ত্রা। সা চাবশ্যাভ্যুপগন্তব্যা। অর্থবতী হি সা। ন হি তয়া বিনা পরমেশ্বরস্য স্রষ্টৃত্বং সিধ্যতি। শক্তিরহিতস্য তস্য প্রবৃত্ত্যনুপপত্তেঃ। (২)

'অবশ্য' শব্দটার প্রতি পাঠক মনো-

(১) মানসোল্লাস, ১।৮।

(২) ঐ, ৪।২।

(৩) T. H. Green, *Prolegomena*, §75 : "Apart from the unifying principle the manifold world would be nothing at all, and in its self-distinction from that world the unifying principle takes its character from it ; or, rather, it is in distinguishing itself from the world that it gives itself its character which therefore but for the world it would not have." Again, §76 : "There is nothing to qualify the determined world *as a whole* but that inner determination of all contained in it by mutual relation, which is due to the action of the unifying principle ; nor anything to qualify the unifying principle but this very action, with the self-distinction necessary to it."

(১) সূত্রভাষ্য ১।১।৫।

(২) ঐ, ১।৪।৩।

যোগ করিবেন। জগতের ঐ অব্যাকৃত-নামরূপাত্মক প্রাগবস্থা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। সে অবস্থা ঈশ্বরাধীন, সন্দেহ নাই। কেন না, অবস্থার অর্থ সত্তা। সত্তা জ্ঞানসাপেক্ষ। কিন্তু সৃষ্টির পূর্ব্বে জীবজ্ঞান অনভিব্যক্ত। সৃষ্টির অর্থই জীবজ্ঞানের প্রথম (১) অভিব্যক্তি, অথবা—একই কথা—জীবজ্ঞানে নামরূপের প্রথম অভিব্যক্তি। তারই নাম বেদান্তে নামরূপব্যাকরণ। সে শ্রুতি সকলেই জানেন—

অনেন জীবেনাঽঽত্মনাঽনুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণি। (২)

অতএব সৃষ্টির পূর্ব্বে অর্থাৎ জীবজ্ঞান অভিব্যক্ত হইবার পূর্ব্বে, জগৎ অথবা জগতের ঐ প্রাগবস্থা ঈশ্বরজ্ঞানেই ভাসমান ছিল। তাই উহা ঈশ্বরাধীন। পক্ষান্তরে, ঈশ্বরও ঐ প্রাগবস্থার অপেক্ষা রাখেন। তা ছাড়া তাঁর সর্ব্বজ্ঞত্ব অসিদ্ধ, দেখিয়াছি। তা ছাড়া তাঁর স্রষ্টৃত্বও অসিদ্ধ। সৃষ্টির অর্থ—কেবল ঈশ্বরজ্ঞানে ভাসমান নামরূপের জীবজ্ঞানেও অভিব্যক্তি। অতএব অব্যাকৃত নামরূপ না থাকিলে জীবজ্ঞানে ব্যাকৃত বা অভিব্যক্ত হইবে কি? এই অব্যাকৃত নামরূপই ঈশ্বরের সৃষ্টিশক্তি, ব্যাকৃত জগতের বীজ বা Potentiality. তদনন্যত্বসূত্রভাষ্যেও (৩) সেই কথা। এক অদ্বিতীয় স্বগতভেদশূন্য কূটস্থ ব্রহ্মই যদি অবশিষ্ট রহিল, তবে যে সকল শ্রুতি বা যে ব্রহ্মসূত্র ঈশ্বরকে জগতের উৎপত্তি স্থিতি এবং প্রলয়ের কারণ বলিয়া প্রতিপন্ন করিতেছে, তাদের দশা কি হইবে? ঈশিতব্য না থাকিলে ঈশ্বরত্ব থাকিবে কি লইয়া? অতএব ঐরূপ সিদ্ধান্ত শ্রুতিন্যায়বিরুদ্ধ। ভাষ্যকার বলেন—

ন। অবিদ্যাত্মকনামরূপবীজব্যাকরণাপেক্ষত্বাৎ সর্ব্বজ্ঞত্বস্য।

না, ইহাতে কোনও বিরোধ নাই। ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব নামরূপব্যাকরণসাপেক্ষ। তবে নামরূপ জিনিসটাই অবিদ্যার খেলা বটে। অবিদ্যার উল্লেখে প্রসঙ্গের হানি হয় নাই। যতদিন জগৎ বা ঈশ্বর মানিবে, ততদিন ঈশ্বর বা জগৎও মানিতে হইবে। এক ছাড়িয়া আর নাই। ভাষ্যকারের অভিপ্রায় এই। জ্ঞেয় জ্ঞাতা বা কার্য্য কারণের একে অন্যের অপেক্ষা রাখে। একের অভাবে অন্যের স্বরূপ অসিদ্ধ।

তবে "ন তু ব্রহ্মানোন ব্যজ্যতে," এ ভাষ্যের অর্থ কি? আনন্দজ্ঞান বলেন—

স্বপ্রকাশস্য প্রকাশ্যত্বাদর্শনাদশেষপ্রকাশকং ব্রহ্ম নাস্যপ্রকাশ্যমিত্যর্থঃ।

উহার অর্থ এই যে, স্বপ্রকাশ সূর্য্যাদি যেমন অন্য বিবিধ বস্তু প্রকাশিত করে কিন্তু নিজে অন্যের দ্বারা প্রকাশিত হয় না, নিখিলবস্তুপ্রকাশক ব্রহ্মও সেইরূপ অন্যের দ্বারা প্রকাশিত হইতে পারেন না। যাহা ভাঙ্গিয়াছি, এখন তাহা যুড়িয়া দেখাই। সর্ব্ব জগৎ জ্ঞেয়, সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্ম জ্ঞাতা। জ্ঞাতা ছাড়া জ্ঞেয় নাই, জ্ঞেয় ছাড়া জ্ঞাতা নাই। 'শুধু' জ্ঞেয়ও নাই, 'শুধু' জ্ঞাতাও নাই। আছে এক জ্ঞেয়-জ্ঞাতা। একই জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্ম এই নিত্য-সংশ্লিষ্ট-জ্ঞেয়জ্ঞাতৃমিথুন-রূপে প্রকাশিত আছেন। ইনিই হেগেলের Absolute, শঙ্করের সর্ব্বেশ্বর। সব তাঁর কুক্ষিস্থ—

(১) এরূপ 'প্রথম' অবশ্য অনেক আছে, কেন না সৃষ্টিপ্রবাহ অনাদি।

(২) ছান্দোগ্য, ৬। ৩। ২।

(৩) ২। ১। ১৪।

তিনি ছাড়া কিছু নাই। তবে আর অন্যে তাঁহাকে প্রকাশিত করিবে কিরূপে? 'অন্য' আছে কই? ব্রহ্ম স্বপ্রকাশশক্তি—ব্রহ্মই অন্যকে প্রকাশিত করেন। অন্যকে, কিনা জগৎকে। কিন্তু সেও তো 'অন্য' নয়। তাঁর সত্তা ছাড়া জগতের সত্তা নাই। স্বস্বরূপে জগৎ লইয়া তিনিই প্রকাশিত। এড্‌বার্ড্ কেয়ার্ড্ এক সুন্দর উপমা দিয়াছেন—

"But as it is the light which reveals both itself and the darkness, so it is self-consciousness through which we know both itself and all other things."(১)

ব্যবহারদশায় শঙ্করে আর হেগেলে আমি তো বড় একটা প্রভেদ দেখি না।

তুমি আমিও তিনি ছাড়া নহি। যে নিত্যসর্ব্বজ্ঞস্বরূপ জগদস্তিত্বে ভাসমান, তিনিই শরীরেন্দ্রিয়াদিসাধনাপেক্ষী হইয়া জীবরূপে অভিব্যক্ত হইতেছেন। ইহাই নামরূপব্যাকরণ। যে নামরূপাত্মক জগৎ ঈশ্বরজ্ঞানে নিত্য উদ্ভাসিত, জীবজ্ঞানে তাহারই অনিত্য অপূর্ণ স্ফুরণমাত্র। পরিমিতশক্তিসম্পন্ন ইন্দ্রিয়াদির অধীন বলিয়া জীবজ্ঞানে সমস্ত নামরূপ সর্ব্বদা প্রকাশিত নহে। কখন কিঞ্চিৎ প্রকাশিত হয় মাত্র। যেটুকু হয়, তাহাতে যে জ্ঞানস্বরূপ ভাসমান, তাহা পরমেশ্বরের জ্ঞানস্বরূপ হইতে ভিন্ন নয়। সেই একই জ্ঞেয়-জ্ঞাতা জীবজ্ঞানেও বিরাজিত। ভাষ্য শোন—

ন চ গিরিনদীসমুদ্রাদিষু নানাবিধেষু নামরূপেষনীশ্বরস্য জীবস্য ব্যাকরণসামর্থ্যমস্তি। যেষপি চাস্তি সামর্থ্যং তেষপি পরমেশ্বরায়ত্তমেব তৎ। ন চ জীবো নাম পরমেশ্বরাদত্যন্তভিন্নশ্চার ইব রাজ্ঞ আত্মনেতি বিশেষণাৎ। উপাধিমাত্রনিবন্ধনত্বাচ্চ জীবভাবস্য। তেন তৎকৃতমপি নামরূপব্যাকরণং পরমেশ্বরকৃতমেব ভবতি। (২)

জীব পরমেশ্বর হইতে অত্যন্ত ভিন্ন নয়। জীব শরীরেন্দ্রিয়প্রভৃতি উপাধির অধীন, প্রভেদ এইমাত্র। তাই জীবের নামরূপজ্ঞানও পরমেশ্বরেরই জ্ঞান। সীতানাথ বাবু সত্য বলিয়াছেন, বেদান্ত Absolute Idealism.

আবার তুমি আমি যতটুকুর খবর রাখি, গিরিনদীসমুদ্রাদিসঙ্কুল জগৎ তার চেয়ে অনেক বড়। তোমার আমার জ্ঞানে যতটুকু আছে, জগৎটা ততটুকুমাত্র, তার অতিরিক্ত কিছু নাই, এমত নহে। ততটুকুও তুমি আমি যতক্ষণ জানি, ততক্ষণই থাকে, তার আগেও ছিল না, বা পরেও থাকে না, এমতও নহে। জগৎটা তোমার আমার হুকুমে উঠে বসে না। অথচ জগৎ জ্ঞানাধীন। তাই বার্ত্তিককার বলিয়াছেন—

প্রাগূর্দ্ধং চ সতাং সত্বং বর্ত্তমানেঽপি ন স্বতঃ।
তস্মাদীশে স্থিতং সত্বং প্রাগূর্দ্ধ্বত্ববিবর্জ্জিতে ॥(১)

পূর্ব্বে হউক, পরে হউক, বা বর্ত্তমানে হউক, বস্তুর সত্তা স্বতঃসিদ্ধ নয়। সত্তা জ্ঞানাধীন। কিন্তু কোনও বস্তুবিষয়ে তোমার আমার জ্ঞান হয়ত পূর্ব্বে ছিল না, বা পরে থাকে না। সে বস্তুও কি তবে পূর্ব্বে ছিল না, বা পরে আর থাকে না? রুদ্ধদ্বার নির্জ্জন ঘরে বিছানার উপরে একখানা পুস্তক রাখিয়া ঘুমাইলাম। জাগিয়া দেখি, পুস্তকখানা তেমনই রহিয়াছে। মাঝামাঝি সময়টা কি পুস্তকখানা ছিল না? ছিল বই কি। যে জ্ঞানে 'পূর্ব্বে' বা 'পরে' নাই, যে জ্ঞান নিত্যবর্ত্তমান, সেই ঈশ্বরজ্ঞানেই নিখিল জগৎ চিরদিন অবস্থিত আছে। তোমার আমার জ্ঞানে তাহাই কখন কিঞ্চিৎ প্রকাশিত হয় মাত্র। বেদান্ত-

(১) *Hegel*, P. 147.
(২) ২।৪।২০।

(১) মানসোল্লাস, ৪।৩।

বাদ Subjective Gorgonization নহে।

জীবেশ্বরে এক প্রভেদ দেখিলাম। ঈশ্বর নিত্যবুদ্ধ, জীবের জ্ঞান শরীরেন্দ্রিয়াদি সাধনের অপেক্ষা রাখে। ভাষ্যে আছে—

সবিতৃপ্রকাশবদ্ ব্রহ্মণো জ্ঞানস্বরূপনিত্যত্বে জ্ঞান-সাধনাপেক্ষানুপপত্তেঃ। অপি চাবিদ্যাদিমতঃ সংসারিণঃ শরীরাদ্যপেক্ষা জ্ঞানোৎপত্তিঃ স্যান্ন জ্ঞানপ্রতিবন্ধকারণরহিতস্যেশ্বরস্য। (১)

জীবের জ্ঞান শরীরাদিসাপেক্ষ। পূর্ব্ব প্রবন্ধে তাই বুঝাইয়াছি। জ্ঞানই যে সকলকে গড়িয়া তুলিয়াছে, জ্ঞান ছাড়া যাদের সত্তা নাই, অতএব জ্ঞানই যাদের কারণ, সেই সকলই জীবে আবার জ্ঞানোৎপত্তিরই কারণ হইতেছে। কেন এমন হয়? গ্রীন্ বলেন, Equally unable to avoid asking and to answer. ভাষ্যকার বলেন, অবিদ্যায়। অবিদ্যা কি, আর এক বারে দেখিব।

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র গুহ। এম-এ.বি-এল

সন্ন্যাসী।

১

"কেন সখে, নবীন বয়সে
সাজিলে এ 'নিমাই' সন্ন্যাসী?
পুনঃ কি 'ভারতী' কেহ, করিয়া করুণা স্নেহ,
দিল দীক্ষা হরি-প্রেমে
হ'তে বনবাসী?

২

"তাই বুঝি ত্যজিয়া সুবেশ
পরিলে এ গৈরিক-বসন,
চন্দন চর্চ্চিত-অঙ্গে, বিভূতি মাখিলে রঙ্গে,
ধরিলে বৈরাগ্য বেশ
এত আয়োজন!

৩

"একি সখে, ঝরিছে নয়ন,
বহিছে বিষাক্ত ঘন শ্বাস,
শোকের নীরব ঝড়ে, হিয়া যেন ভেঙে পড়ে,
বসুধা ভরিয়া যেন
নিঠুর হতাশ!

৪

"কেন সখে, কি অভাব তব,
কি বেদনা হেন বিশ্বগ্রাসী?—
আছে তো সাধের গেহ, আছে সেথা প্রীতি স্নেহ,
রোগে সেবা, দুখে অশ্রু,
সুখ-ভরা হাসি!

৫

"তাই সাধি চল সখে ফিরে,
কত আঁখি আছে পথ চেয়ে!—
সেথা কত দীর্ঘ শ্বাস, বাড়াইছে হাহুতাশ,
কত অরুন্তুদ অশ্রু
পড়িতেছে বেয়ে!"

৬

"না না সখে, মিছা ডাক মোরে,
সংসারের আমি নাহি আর—
থাক্ সে সুখের ধাম, মুছিয়া আমারি নাম,
চাহি না আদর হাসি,
তপ্ত অশ্রু তার!

৭

"নাহি মোর কেশব ভারতী,
নহি আমি নিমাই সন্ন্যাসী,
হা মোর পাষাণ চিত্ত, আজি করি প্রায়শ্চিত্ত,
ফলিয়াছে কর্ম্মফল!
কহিব প্রকাশি।

(১) সূত্রভাষ্য, ১।১।৫।

শ্রীমতী রাধিকার কৃষ্ণ-বিরহ যেমন উন্মাদকর, সেই ভাবের অভিব্যক্তি গৌরাঙ্গ চন্দ্রে। প্রভু বলিয়াছেন—

যুগায়িতং নিমিষেণ চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতং।
শূন্যায়িতং জগৎ সর্ব্বং গোবিন্দ বিরহেন মে॥

গোবিন্দ-বিরহে আমার নিমিষ কাল যুগবৎ, চক্ষু বর্ষা কালীয় জলধরের ন্যায় এবং জগৎ শূন্য প্রতীয়মান হইতেছে। যে প্রেমে এইরূপ উন্মত্ত বিরহ-বিকার, তাহাতে কি আবিলতা থাকিতে পারে? চৈতন্য প্রভুতে রাধার ভাব কান্তি। সুতরাং এই রাগাত্মিকা ভক্তিই যে ভক্তিরাজ্যের সর্ব্বোচ্চ সিংহাসনে অধিষ্ঠিতা এবং ভক্তির চরমোৎকর্ষ, তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। ব্রজগোপীগণ এই পরম পবিত্র অন্তর্ভাবময়ী গরীয়সী ভক্তির অধিকারিণী। এই গোপীপ্রেম সম্যক্স্মরণ, মমত্বাতিশয়ান্বিত এবং সান্দ্র ভাবময়। এমন বিশুদ্ধতাতে পাপ কল্পনা কি অপরাধজনক নহে?

ব্যাসদেব ভক্তির উৎসরাশি পরিপূর্ণ মনোজ্ঞ কুসুমোদ্যান সদৃশ এই শ্রীমদ্ ভাগবত রচনা করিয়া নূন্যতা পরিহার পূর্ব্বক কৃতার্থম্মন্য হইলেন। মহাভারত এবং শ্রীমদ্ ভাগবতের রচনা দৃষ্টে একই লেখনী-প্রসূত বলিয়া মনে হয় না, সত্য, কিন্তু ব্যাসদেবও তো সামান্য মনুষ্য নহেন। শাস্ত্র মতে তিনিও নারায়ণের অংশকলাবতার। তাঁহাতে বিশেষত্ব আছে বলিয়াই তিনি জগৎপূজ্য। আমরা এহেন মহাশক্তিশালী ষড়ৈশ্বর্য্য-সম্পন্ন ঋষিপ্রবরের হস্ত হইতে শ্রীমদ্ভাগবত খানি কাড়িয়া লইয়া তদপেক্ষা বহুলাংশে হীনশক্তি বোপদেব গোস্বামীর করে অর্পণ করিতে সাহসী নহি।

মহাভারত ও শ্রীমদ্ভাগবত, দুইখানিই ভারতের অলঙ্কৃতিরূপা। এই মহা গ্রন্থের সম্যগালোচনা সাধারণ ব্যাপার নয়। মাদৃশ ব্যক্তির ক্ষুদ্র শক্তি লইয়া ঈদৃশ কার্য্যে অগ্রসর হওয়া ধৃষ্টতা। তবে এতদুভয় গ্রন্থের উদ্দেশ্যগত পার্থক্য প্রদর্শন করিতে যাহা কিঞ্চিৎ বর্ণন যোগ্য মনে করিয়াছি, তাহাই লিখিলাম।

কৃষ্ণায় বাসুদেবায় হরয়ে পরমাত্মনে।
প্রণত ক্লেশ নাশায় গোবিন্দায় নমোনমঃ।
ওঁ হরিঃ ওঁ হরিঃ ওঁ হরিঃ।

শ্রীজানকীনাথ গোস্বামী।

মুদীর দোকান।*

বাঙ্গালায় আজ কয়েক বৎসর ধরিয়া চিত্রকলা ওরফে ছবির মরশুম চলিতেছে। কিন্তু আমরা ভাবিতাম, বৃন্দাবনী সারঙ্গে ঝাঙ্কার ঢুকানো যেমন অসম্ভব, অন্ততঃ কতকগুলি বিদ্যায় ছবি ঢুকানোও তেমনই অসম্ভব হইবে। কবুল করিতেই যখন বসিয়াছি, তখন আর লজ্জা কি? আমরা আরও ভাবিতাম যে, ব্যুৎপত্তিবিদ্যাও সেই শ্রেণীর। ঋতেন্দ্র বাবু দেখাইয়াছেন, এ একটা সেকেলে সংস্কার। কিছু অসম্ভব নাই। এই পুস্তকেরও তো বিষয় বাঙ্গালাভাষায় প্রচলিত কতকগুলি শব্দের ব্যুৎপত্তি, তথাপি ইহার

---

* মুদীর দোকান (সচিত্র)। শ্রীঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। পুণ্যযন্ত্র। মূল্য ১৷৹ টাকা মাত্র। ১৩১৬ সাল।

পাতায় পাতায় কত রঙ্গের কত ছবি। এমন কি, এক পাতায় একখানা লুচি এবং আর এক পাতায় একখানা জিলিপির ছবি! কিন্তু কুসংস্কার নাকি মরিয়াও মরে না। লুচি জিলিপির ছবিতে ঐ দুই শব্দের ব্যুৎপত্তির কি সাহায্য হইয়াছে, খগেন্দ্র বাবুকে জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয়।

পুস্তকের আরম্ভেই 'সঁকড়ি' শব্দের ব্যুৎপত্তি। লেখক মনে করেন, 'সঁকড়ি' শব্দের মূল 'সঙ্কীর্ণ' শব্দ। তিনি বলেন, "ভাত ডাল প্রভৃতি আত্মীয়স্বজনরূপ সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে ব্যতীত যাহার তাহার সঙ্গে খাওয়া যায় না—নিষিদ্ধ, তাই উহার বেলায় সঁকড়ির ধূম পড়িয়া যায়, কিন্তু লুচি পিষ্টক প্রভৃতি সামগ্রী যাহা সকলের হাতে সকলের সঙ্গে বসিয়া খাওয়া যায় তাহাতে 'সঁকড়ি দোষ' স্পর্শ করে না।" নানা কারণে এ ব্যুৎপত্তি অগ্রাহ্য। 'সঙ্কীর্ণ' শব্দের ধ্বনিবিকারে সঁকড়ি হইতে পারে না, এমত বলিতেছি না। ধ্বনিবিকারধারা বিচিত্রপথগা। 'সঙ্কীর্ণ' হইতেও ক্রমে সংকিণ্ণ—সংকিণ—সংকিড়—সংকড়ি হওয়া অসম্ভব নহে। কিন্তু ইহাতেই সব ফুরাইল না। সংস্কৃতে সঙ্কীর্ণশব্দে সঁকড়ি বুঝায় না। ভোজনসম্বন্ধে লেখক যে ক্ষুদ্র গণ্ডী ও বৃহৎ গণ্ডী দেখাইতেছেন, সেরূপ বিভাগও সংস্কৃতে প্রসিদ্ধ নহে। ধর্ম্মশাস্ত্রোক্ত ভোজনসম্বন্ধী বিধিনিষেধসমূহের ফলে, ঐরূপ না হউক, ঐজাতীয় একটা বিভাগ আসে বটে। কিন্তু তাও শাস্ত্র নিঙ্গড়াইয়া বাহির করিতে হয়, শাস্ত্রবাক্যে কোথাও তাহা ব্যক্ত নহে। যাহা অব্যক্ত, অতএব অপ্রসিদ্ধ, তার বুনিয়াদে কোনও শব্দ প্রতিষ্ঠিত বা প্রচলিত হয় না। বিশেষতঃ আমরা যে অর্থে কোনও জাতি, সমষ্টি বা গণ্ডীকে সঙ্কীর্ণ বলিয়া থাকি, সংস্কৃতে সে অর্থে উহাকে সঙ্কীর্ণই বলে না। এদিকে আবার প্রাকৃতে বা সঁকড়িশব্দ জন্মিবার পূর্ব্বতন বাঙ্গালাভাষায়ও যে লেখকোক্ত ঐরূপ ক্ষুদ্র গণ্ডীকে সঙ্কীর্ণ বলা হইত, তাহারও কোনও প্রমাণ নাই।

তবে 'সঁকড়ি' কোথা হইতে আসিল? খণ্ডন যেমন সহজ, স্থাপন তেমন সহজ নহে। আমরা দুই একটা আন্দাজ করিতে পারি মাত্র। সংস্কৃত উপস্কৃত, এই দুই শব্দেরই অন্যতম অর্থ—পক্ব। পাণিনিসূত্র হইতে আরম্ভ করিয়া ইহার নজীরের অভাব নাই। মাগধীনামক প্রাকৃতে 'সংস্কৃত' শব্দ বিকৃত হইয়া 'সংকড়' বা 'সংখড়' হয়।* এই প্রাকৃত শব্দ হইতে আমাদের 'সঁকড়ি' আসিয়া থাকিবে। অগ্নিপক্ব দ্রব্যকেই সঁকড়ি বলা হয়। লেখকোক্ত "লুচি পিষ্টক"ও তাই। তবে বিনা জলসংযোগে লুচি বা পিষ্টক করা হইলে রঘুনন্দনধৃত এক কূর্ম্মপুরাণবচনের বলে তাহাকে বোধ হয় স্মার্ত্তেরা সঁকড়ি বলিবেন না।

অথবা, 'সঁকড়ি' শব্দ সংস্কৃত 'শকল' শব্দ হইতে আসিয়া থাকিবে। শকলশব্দের অর্থ খণ্ড, টুক্‌রা। কেবল উচ্ছিষ্ট অর্থাৎ ভুক্তাবশিষ্টকেই হয়ত আদৌ সঁকড়ি বলা হইত।† বাঙ্গালায় শকার ও সকারের ধ্বনিতে কোনও প্রভেদ নাই। লকার ডকারে পরিণত হইয়াছে। এ পরিণাম প্রসিদ্ধ। যেমন,

* বররুচি, প্রাকৃতপ্রকাশ, ১।২৭, ৩।২৯, ১১।১৫।

† জৈমিনীয়মীমাংসার তৃতীয়াধ্যায়ে অষ্টমপাদে বিংশাধিকরণে ভাষ্যকারধৃত এক তৈত্তিরীয়শ্রুতি এই—

পুরোডাশশকলমৈন্দ্রবায়বস্য পাত্রে নিদধাতি।

এখানে 'পুরোডাশশকল' শব্দের অর্থ পুরোডাশের অবশিষ্ট ভাগ।

তালী=তাড়ী। সকারের পরে অনুনাসিকটা অনর্থক। এমন অনর্থক অনুনাসিক বাঙ্গালায় অনেক আছে।

অথবা 'সঁকড়ি'র মূল—'সঙ্কর' শব্দ। ঝাঁট দিতে ঝাঁটার দ্বারা যে সব জঞ্জাল একত্র করা হয়, সংস্কৃতে তার নাম সঙ্কর এবং অবকর।‡ স্থানান্তরের জঞ্জালের মত রান্নাঘরেরও জঞ্জালকেই হয়ত আদৌ সঁকড়ি বলা হইত। লেখকোক্ত 'সঙ্কীর্ণ' শব্দ এই 'সঙ্কর'এরই ঘনিষ্ঠ জ্ঞাতি। দুইএরই এক প্রকৃতি—সংপূর্ব্বক কৃধাতু। সঙ্কীর্ণৌ নিচিতাশুদ্ধৌ। সঙ্কীর্ণশব্দেরও এক অর্থ—অশুদ্ধ, অর্থাৎ দ্রব্যান্তরের সহিত মিশ্রিত।

কিন্তু পুস্তকের প্রধান ব্যুৎপত্তিই 'মুদী' শব্দের ব্যুৎপত্তি। কেন না ইহারই উপর পুস্তকের নাম, মটো, মটোর ছোট টাইপ বড় টাইপ, সকলই নির্ভর করে। লেখক বলেন, "বৈদিক ঋষিরা......হর্ষদ্যোতক 'মুদ্' শব্দেই ব্রীহ্যাদি অন্নমাত্রকেই বুঝাইতেন। চাল, ডাল, গোধূম প্রভৃতি অন্ন বা ওষধির সাধারণ বৈদিক নাম 'মুদ্'।" পুনশ্চ, "বৈদিক ঋষিরা ধান্যাদি ওষধির হর্ষে প্রমুদিত হইয়াই ধান্যগোধূমাদি অন্নের নাম দিয়াছেন 'মুদঃ'। এই 'মুদঃ' বা অন্ন যাহার গৃহে বা যাহার পণ্যশালায় আছে সেই 'মুদী'।" মুদ্ আসিলে মুদীর আসিতে বিলম্ব হয় না বুঝি। কিন্তু ধান্যপ্রভৃতি ওষধির সাধারণ বৈদিকনাম যে মুদ্, তার প্রমাণ কি? লেখক বলেন, তার প্রমাণ প্রথম রাষ্ট্রভৃৎ। এখন, শুক্ল কৃষ্ণ উভয় যজুর্ব্বেদের মন্ত্রভাগে * রাষ্ট্রভৃৎ নামে ছয়টা মন্ত্র আছে। প্রথম রাষ্ট্রভৃৎ এইরূপ—

ঋতাষাড়্ ঋতধামাগ্নির্গন্ধর্ব্বস্তস্যৌষধয়োঽপ্সরসো মুদো নাম। স ন ইদং ব্রহ্ম ক্ষত্রং পাতু তস্মৈ স্বাহা বাট্ তাভ্যঃ স্বাহা॥

সমস্ত মন্ত্রে আমাদের প্রয়োজন নাই। যেটুকু দরকার তাহা এই—

তস্যৌষধয়োঽপ্সরসো মুদো নাম।

বাজসনেয়সংহিতার প্রসিদ্ধ ভাষ্যকার মহীধর ইহার এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন—

তস্যাগ্নের্গন্ধর্ব্বস্যৌষধয়ো ব্রীহ্যাদ্যা নাম নাম্না অপ্সরসঃ স্ত্রীত্বেন ভোগ্যাঃ। কীদৃশ্য ওষধয়ঃ মুদঃ মোদয়ন্তে জনা যাভিস্তা মুদঃ।†

ভাষ্যের বাঙ্গালা এই—

সেই অগ্নিগন্ধর্ব্বের ধান্যাদি ওষধি নামে অপ্সরোগণ স্ত্রীরূপে ভোগ্য। ওষধিগুলি কিরূপ? না, মুদ্। যাহাদিগের দ্বারা লোকে হর্ষ লাভ করে, তাহারা মুদ্।

মুদ্‌শব্দের এই অর্থ ভাষ্যকার শতপথব্রাহ্মণ হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। শতপথে এই মন্ত্রেরই ব্যাখ্যায় আছে—

ওষধয়ো বৈ মুদ ওষধীভির্হীদং সর্ব্বং মোদতে।‡

ওষধিরাই মুদ্। ওষধিদিগের দ্বারাই এই সকলে হর্ষ লাভ করে।

পাঠক দেখিবেন, মহীধর মন্ত্রস্থ 'নাম' এই পদের অন্বয় 'মুদঃ' এই পদের সহিত না করিয়া 'ওষধয়ঃ' এই পদের সহিত করিয়াছেন। অতএব মহীধরের মতে 'মুদঃ' এই পদটী 'ওষধয়ঃ' এই পদের বিশেষণমাত্র, মুদ্ ওষধি বা ওষধিবিশেষের নাম নহে। কিন্তু ভাষ্যেরই বা দোহাই দিই কেন? মুদ্ যদি

‡ সংমার্জ্জনী শোধনী স্যাৎ সঙ্করোঽবকরস্তথা ক্ষিপ্তে।

অমরকোশ, দ্বিতীয়কাণ্ড, পুরবর্গ।

* বাজসনেয়সংহিতা, ১৮।৩৮—৪৩। তৈত্তিরীয়সংহিতা, ৩।৪।৭।১—৬।

† বলা বাহুল্য, 'মুদঃ' প্রথমার বহুবচনান্ত। একবচনে মুৎ বা মুদ্। রমেন্দ্র বাবু কিন্তু পদটীকে একবচনান্তই ঠাওরাইয়াছেন। তার প্রমাণ, দ'এ হসন্ত চিহ্ন না দিয়া বার বার 'মুদ' লেখা এবং "মুদোঽন্নমস্যাস্তীতি মুদী" এই সংস্কৃতটুকু।

‡‡ শতপথব্রাহ্মণ, ৯।৪।১।৭।

ওষধিরই নামান্তর হইত, তবে পুনরায় ওষধিশব্দপ্রয়োগের কোনও প্রয়োজন ছিল না। প্রয়োজন না থাকিলেও প্রসঙ্গক্রমে ঋষি বলিয়া দিতেছেন যে ওষধির আর একটী নাম মুদ্, ইহাও সম্ভবপর নহে। মন্ত্রে ফুটনোট থাকে না। বিশেষতঃ, অন্য প্রমাণের অভাবে এক "মুদোনাম" দেখিয়াই এরূপ সম্ভাবনা স্বীকার করিতে পারি না। না পারিবার এক কারণ এই যে, নামশব্দ যেমন নাম বুঝাইতে, তেমনই আবার নিশ্চয়ার্থেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে এবং এখানেও হইতে বাধা নাই। শতপথব্রাহ্মণে যে ঐ "ওষধয়ো বৈ মুদঃ" আছে, উহাতেও এমত বুঝায় না যে ওষধির নাম মুদ্। 'বৈ' থাকিলেই নাম হয় না। শতপথের দ্বারদেশেই এই শ্রুতি—

মেধ্যা বা আপো মেধ্যো ভূত্বা ব্রতমুপায়ানি। *
জলই পূত। পূত হইয়া ব্রত আচরণ করি।

'বৈ' সন্ধিতে 'বা' হইয়াছে। মেধা জলের নাম নহে। আর একটা দৃষ্টান্ত দিই—

অগ্নির্বা এষ ধুর্য্যঃ। †
এই অগ্নিই ধুর্য্য।

ধুর্য্য, অর্থাৎ ধুরে অবস্থিত। গোরুর গাড়ীর গোরু দুইটার ঘাঁড়ের উপর যে একখণ্ড কাঠ বা বাঁশ চাপাইয়া দেওয়া হয়, তাহাকে যুগ এবং তাহার এক এক প্রান্তকে ধুর বলে। ধুর্য্য অগ্নির নাম নহে। মুদ্ও তেমনই ওষধির নাম নহে। মন্ত্রে "ওষধিদিগকে কেন মুদ্ বলা হইয়াছে, ওষধয়ো বৈ মুদঃ" ইত্যাদি ব্রাহ্মণ তাহারই ব্যাখ্যামাত্র। মুদ্ ওষধিবিশেষেরও নাম নহে। ঐ ব্রাহ্মণে এই প্রসঙ্গেই আবার আছে—

অগ্নিহ গন্ধর্ব্ব ওষধীভিরপ্সরোভির্মিথুনেন সহোচ্চক্রাম। ‡
অগ্নিগন্ধর্ব্ব মিথুনভূত ওষধিঅপ্সরোগণের সহিত উত্থিত হইয়াছিলেন।

এখানে মুদ্শব্দের উল্লেখ নাই। মন্ত্রে মুদ্নামক ওষধিবিশেষেরই কথা আছে, ব্রাহ্মণের যদি ইহাই অভিপ্রায় হইত, তবে এখানে মুদ্শব্দের উল্লেখ থাকিত। এই শতপথব্রাহ্মণই আবার ঐ মন্ত্রের প্রাচীনতম ব্যাখ্যা, পাঠক তাহা বিস্মৃত হইবেন না। ফলে এই দাঁড়াইতেছে যে, লেখকের "সাধারণ"বৈদিকনাম তো দূরের কথা,মুদ্ যে ওষধি বা ওষধিবিশেষের কথঞ্চিৎও বৈদিকনাম, এ মন্ত্রে তাও প্রমাণিত হয় না। অথচ এ মন্ত্র ছাড়া আর কোনও প্রমাণও তিনি দেন নাই। পক্ষান্তরে, নিঘণ্টুতে অন্ননামমধ্যে মুদ্শব্দ পঠিত হয় নাই। এমন যে বিস্তীর্ণ ঋগ্বেদসংহিতা, মোক্ষমূলরের গণনানুসারে তাহাতেও মুদ্শব্দ চারিবারমাত্র প্রযুক্ত হইয়াছে এবং কোনও বারেই তার অর্থ ওষধি বা অন্ন নহে। বেদ ছাড়িয়া লোকে নামিয়া দেখুন। লৌকিক সংস্কৃতেও কুত্রাপি মুদ্শব্দে ওষধি বা অন্ন বুঝায় না। বিশাল বৈদিকসাহিত্যের কোন্ এক কোণের কোণে কোথায় সেই একটা "মুদো নাম", আর কোথায় আমাদের 'মুদী'—মাঝে কত বহুবর্ষসহস্রব্যাপী অন্ধকার! মুদীর ব্যুৎপত্তি করিতে গিয়া এ কথাটা যিনি একবার ভাবিয়া দেখেন নাই, তাঁর পাণ্ডিত্যের প্রশংসা করিতে পারি না। Böehtlingk ও Rothএর জগদ্বিখ্যাত অভিধানে লিখিত আছে, বিষ্ণুপুরাণে (২।৮২) এক শ্রেণীর অপ্সরার নাম মুদ্। তাই যদি হয়, তবে মুদ্শব্দ কালে বরং অপ্সরারই নাম হইয়াছিল *, ধান্যাদি ওষধির নাম হয় নাই। শব্দের

* শথপথব্রাহ্মণ, ১।১।১।১।
† ঐ, ১।১।২।১০।
‡ ঐ, ৯।৪।১।৭।

* Böehtlingk ও Roth বিষ্ণুপুরাণের ঐ উক্তির সহিত এই প্রথম রাষ্ট্রভৃৎ মিলাইয়া দেখিতে বলেন। পুরাণোক্তির মূল যে এই যজুঃ, তাহাতে সন্দেহ নাই।

ইতিহাসে নাম আর বিশেষণে, বিশেষতঃ ঐরূপ কচিৎপ্রযুক্ত একটা বিশেষণে, অনেক প্রভেদ। লেখকও তাহা জানেন, নহিলে মুদ্‌কে নাম করিতে চাহিবেন কেন? নামে আর প্রৌঢ়িবাদেও অনেক প্রভেদ। শেক্সপীয়ারের "Frailty, thy name is woman" বা ঐতরেয়ব্রাহ্মণের "আত্মা বৈ পুত্রনামাসি" † প্রৌঢ়িবাদের উত্তম দৃষ্টান্ত। ঐ মন্ত্রেও যদি বড় জোর এইরূপই একটা প্রৌঢ়িবাদ থাকে, তাহাতেই বা লেখকের লাভ কি? শেক্সপীয়ারে ঐ বাক্য আছে বলিয়া শেক্সপীয়ারের সময়ে বা তার পরে ইংরেজীভাষায় woman শব্দে frailty অর্থ বুঝায় নাই। ঐতরেয়ে ঐ শ্রুতি আছে বলিয়াও ঐতরেয়ের কালে বা তার পরে সংস্কৃতভাষায় পুত্র শব্দে আত্মা অর্থ বুঝায় নাই। ওষধিদিগের নাম মুদ্, মন্ত্রের অর্থও যদি এইরূপই একটা প্রৌঢ়িবাদ হয়, তাহাতেও এমত সিদ্ধান্ত হইতে পারে না যে, যজুর্ব্বেদের কালে বা তার পরে সংস্কৃতে মুদ্-শব্দে ওষধি বুঝাইত। সে সিদ্ধান্ত করিতে হইলে অন্য প্রমাণ চাই। লেখক অন্য কোনও প্রমাণ দেন নাই, আমরাও অবগত নহি। সেরূপ প্রমাণ থাকিলে তো মুদ্ ওষধির নামই হইয়া পড়ে, প্রৌঢ়িবাদ উড়িয়া যায়। তেমন কোনও প্রমাণ আমরা অবগত নহি বলিয়াই তর্কচ্ছলে এখানে প্রৌঢ়িবাদও স্বীকার করিতেছি। পাঠক দেখিয়াছেন, শতপথব্রাহ্মণে বা মহীধরভাষ্যে এরূপ প্রৌঢ়িবাদও স্বীকৃত হয় নাই। কৌতুকের বিষয় এই যে, এ ব্যুৎপত্তিতে আমাদের এত মাথাব্যথা, কিন্তু ঋতেন্দ্র বাবুর মনে সংশয়ের একটু আঁচড়ও নাই। তিনি লিখিয়াছেন, "তাই বলিতেছিলাম 'মুদী' বলিলে আজকাল যেরূপ তুচ্ছভাব, অপদার্থ হেয়ভাব প্রাণে জাগ্রত করে, উহা প্রকৃতপক্ষে সেরূপ হেয় বা অবজ্ঞার আস্পদ নহে। আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষ ঋষিগণের প্রাণের চির-আনন্দ 'মুদী' নামে বিজড়িত।" সংশয়ে এমন অনর্গল হয় না। ইহার পরে যাহা থাকে, ঠিক তাই আছে। "অথচ পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে" ইত্যাদি ছয় পংক্তি! লেখকেরই অন্যতম প্রথিতনামা পিতৃব্য এ জিনিসটার একটা খাসা নাম দিয়াছিলেন। এখন ইহার নাম স্বদেশী। এরূপ স্বদেশীর এ পুস্তকে অভাব নাই।

ব্যুৎপত্তিবিদ্যায় সমালোচকের একটা সুখের অধিকার আছে। স্বয়ং মোক্ষমূলর এ অধিকার মঞ্জুর করিয়া গিয়াছেন। একটা ব্যুৎপত্তি তিরস্কার করিলাম বলিয়া তার বদলে আর একটা দিতে আমরা বাধ্য নহি। তবে সঁকাড়ির বেলায় একেবারে তিনটা আন্দাজই করিয়াছিলাম। এখানেও অন্ততঃ একটা করিতে পারি। আমরা যাহাকে 'মুদী' বলি, হিন্দীতে তাহাকে 'মোদী' বলা হয়। মোদী মুদী, একই শব্দের দুই রূপমাত্র। রূপ দেখিয়া বোধ হয়, 'মুদী' হইতে 'মোদী' রূপই প্রাচীন। তা হউক বা না হউক, সংস্কৃতে 'মোদক ইহার পণ্য' এই অর্থে 'মৌদকিক' শব্দ সিদ্ধ হয়। * প্রাকৃতে ঔকার নাই। প্রাকৃতে 'মৌদকিক' শব্দ বিকৃত হইয়া 'মোদইঅ' হয়। †

পুরাণকার "মুদো নাম" মন্ত্রোক্ত অপ্সরোগণেরই বিশেষণরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন।

† এ শ্রুতি কৌষীতকীদিগেরও আছে। কৌষীতকিব্রাহ্মণোপনিষৎ, ২।১১।

* তদস্য পণ্যম্॥ পাণিনি, ৪।৪।৫১। কাশিকায় বৃত্তিকার এই সূত্রের যে তিনটী দৃষ্টান্ত দিয়াছেন, তার একটী এই 'মৌদকিক'।

† প্রাকৃতে সংস্কৃতশব্দের মধ্যস্থিত অসংযুক্ত ককার ও

হিন্দী 'মোদী' এবং বাঙ্গালা 'মুদী' শব্দ এই 'মোদইঅ' হইতে আসিয়া থাকিবে। 'মৌদকিক' হইতে 'মোদী' ও 'মুদী' হওয়ার দৃষ্টান্ত, যেমন তৈলিক = তেল্লিঅ = তেলী = তিলী। মুদীর পূর্ব্বপুরুষেরা গোড়ায় মোদকই বেচিতেন বলিয়া আমাদের বড় সন্দেহ হয়। লেখকেরও ইহাতে পরিতাপের কারণ নাই। তাঁর "ঋষিগণের প্রাণের চির-আনন্দ" মোদকেও " বিজড়িত"।

মোদকের দাগ বাঙ্গালাভাষায় আরও আছে। আমাদের ময়রাও মোদকলাঞ্ছন। লেখকের মতে, 'ময়রা' শব্দ সংস্কৃত 'মোদককার' শব্দ হইতে আসিয়াছে। আমাদেরও তাই বোধ হয়। মোদককার = মোদঅআর = মোঅআর = মোআর = ময়রা। যেমন, গোপাল = গোআল = গয়লা। তাঁহার মতে, ময়রাদিগের 'ময়ান' শব্দও সংস্কৃত 'মোদন'শব্দেরই অপভ্রংশমাত্র। যেমন, বদন = বয়ান। দৃষ্টান্তটী নিখুঁত নয়, কিন্তু আমাদেরও তাই বিশ্বাস। তবে এখানেও লেখকের একটু ভ্রম আছে। যে মুদধাতু এই 'মোদন' শব্দের মূল, তার অর্থ হর্ষ নহে, সংসর্গ। সংসর্গ, অর্থাৎ মিশ্রণ। সংসর্গবাচী মুদধাতু চুরাদিগণে পঠিত হয়। ভট্টোজিদীক্ষিত ইহার দৃষ্টান্ত দিয়াছেন—

মোদয়তি সক্তূন্ ঘৃতেন।

ঘৃতের সহিত ছাতু মিশ্রিত করিতেছে।

দকারের লোপ হয়। বররুচি, প্রাকৃতপ্রকাশ, ২।২' কিন্তু সূত্রেই আছে,এ লোপ "প্রায়" হয়, অর্থাৎ সর্ব্বত্র হয় না। তাই 'মোদক' শব্দ প্রাকৃতে যেমন 'মোঅঅ' হইতে পারে, তেমনই আবার 'মোদঅ'ও হয়। যথা অভিজ্ঞানশকুন্তলের দ্বিতীয়াঙ্কে বিদূষকবাক্যে—

কিং মোদঅখণ্ডিআএ।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সংস্করণ, ৫০ পৃঃ।

মুদধাতুর পালা সাঙ্গ হয় নাই। লেখকের মতে 'ময়দান' 'ময়দা' ও "বাদাম পেস্তা কিস্মিস্ প্রভৃতি সুমিষ্ট ফল" বাচক 'মেওয়া' শব্দও মুদধাতু হইতে আসিয়াছে। ঐ-ধাতুৎপন্ন কোন্ সংস্কৃতশব্দটী হইতে ইহার কোন্টী আসিয়াছে, তিনি আমাদিগকে তাহাও বলিয়া দিয়াছেন। যথা 'মোদোত্থান' হইতে 'ময়দান', 'মোত্থ' হইতে 'ময়দা', এবং 'মোদক' হইতে 'মেওয়া'। 'মোদোত্থান' থিয়েটারে পাওয়া যাইতে পারে, সংস্কৃতে ঋতেন্দ্র বাবু এ রত্ন পাইলেন কোথায়? * 'মোত্থ' থিয়েটারেও দুর্লভ। শুনিলে লেখক লজ্জিত হইবেন যে, ময়দান ময়দা মেওয়া, এ তিনটাই পার্সী শব্দ। ইহাদের অতিবৃদ্ধপ্রপিতামহের সহিতও যে মুদধাতুর কোনও সম্বন্ধ ছিল, এমত বোধ হয় না। 'ময়দান' শব্দে পার্সীতে বুঝায় মাঠ—তরুশূন্য,লতাশূন্য, "মোদোদ্যান"এর গন্ধশূন্য, নিতান্তই মাঠ। কাঁচা, ডাঁশা, পাকা, সুমিষ্ট, কুমিষ্ট—ফলমাত্রেরই আবার সাধারণ পার্সীনাম 'মীবহ্'

* 'মোদোদ্যান' কেন, 'প্রমোদোদ্যান' 'প্রমোদকানন' বা 'প্রমোদবন'ও সংস্কৃতে নাই। এ সকল খাঁটি থিয়েটারী জিনিস। সংস্কৃতে 'প্রমদবন' শব্দই প্রসিদ্ধ। যেমন অভিজ্ঞানশকুন্তলের ষষ্ঠাঙ্কে কঞ্চুকিবাক্যে—

মহারাজ প্রত্যবেক্ষিতাঃ প্রমদবনভূময়ঃ।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সংস্করণ, ১৮৫ পৃঃ। তাঁহারই ধৃত হলায়ুধকোশে (২।৫৮) প্রমদবনের অর্থ এইরূপ বিবৃত আছে—

বিজ্ঞেয়ং প্রমদবনং নৃপস্য যন্মি-
ন্নন্তঃস্থৈঃ সহ রমতে পুরোপকণ্ঠে।

অমরকোশেও (দ্বিতীয়কাণ্ড, বনৌষধিবর্গ) তাই—

পুমানাক্রীড় উদ্যানং রাজ্ঞঃ সাধারণং বনম্।
স্যাদেতদেব প্রমদবনমন্তঃপুরোচিতম্।

'প্রমদবন' পারিভাষিক শব্দ। মদধাতুর অর্থও হর্ষ।

বা 'মেবহ্',বাঙ্গালায় সোজাসুজি'মেওয়া'।† 'ময়্দান্' ও 'মীবহ্' অতিবিশুদ্ধ এবং অতি-প্রসিদ্ধ পারসীকশব্দ। বিয়াহুল্বুঘাৎ নামক বিখ্যাত পারসীক অভিধানে 'ময়্দহ্' অর্থাৎ আমাদের 'ময়দা'ও পারসীকশব্দ বলিয়া গৃহীত হইয়াছে।

একটা ব্যুৎপত্তিতে লেখকের একটু সন্দেহ আছে দেখিয়া আমরা সুখী হইয়াছি। আমাদের বরফ পার্সীশব্দ—পার্সীতে 'বর্ফ্'। লেখক বলেন, সংস্কৃত বৃষধাতু হইতে ইহার আসা "সম্ভব"। বৃষ্টি হয় বলিয়াই উহাকে বরফ বলা "সম্ভব"। 'বরষ' শব্দের যকার"খুব সম্ভব" ফকারে পরিণত হইয়াছে। লেখ-কের এ সন্দেহে আমরা সুখী হইয়াছি। এত "সম্ভব"একত্র এ পুস্তকে আর কোথাও নাই। কিন্তু তাঁহার এ সিদ্ধান্তটী অমূলক। কেন না যে একটীমাত্র দৃষ্টান্তের উপর তিনি এ সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন, তাহা ভ্রমাত্মক। সে দৃষ্টান্ত এই। তিনি বলেন, "সংস্কৃত গ্রাস শব্দ ……পারস্য ভাষায় 'গ্রেফ্‌ত্'…… হইয়াছে।" বৃষধাতুর ষকার দন্ত্য নহে,মূর্দ্ধন্য। সে আপত্তি ছাড়িয়া দিই। 'গ্রাস' শব্দের দন্ত্য সকারও 'গিরিফ্‌তহ্' বা 'গেরেফ্‌তহ্' শব্দের ফকারে পরিণত হয় নাই। গ্রসু গ্লসু অদনে। সংস্কৃত গ্রসধাতুর অর্থ ভক্ষণ। পারসীক 'গিরিফ্‌তহ্' বা 'গেরেফ্‌তহ্' শব্দের অর্থ 'গৃহীত'। গিরিফ বা গেরেফ্ ধাতুই ঐ শব্দের মূল। যে পহ্লবী ভাষা নব্যপারসীকের জননী, তাহাতে ঐ ধাতুর রূপ ছিল—গ্রফ্। পহ্লবী আবার প্রাচীন-পারসীকের দুহিতা। এতকাল যে ভাষাকে সকলে জেন্দ্ বলিত, কিন্তু নব্য জর্ম্মান পণ্ডি-তেরা এখন যার যথার্থ নাম করিয়াছেন আবস্তিক, সেও এই প্রাচীনপারসীকেরই সহোদরা। প্রাচীনপারসীক এবং আবস্তিক ভাষায় ঐ ধাতুরই রূপ ছিল—গ্রব্।* আমাদের বেদের ভাষায় গ্রহণার্থক গ্রহ্-ধাতুরও এক রূপ ছিল—গ্রভ্।† 'গ্রব্' ও 'গ্রভ্' একই ধাতুর বিভিন্ন রূপ। গ্রসধাতুর সহিত ইহাদের কাহারও কোন সম্পর্ক নাই। এ পথই নয়। পার্সী'বর্ফ্'শব্দের মূল পহ্লবী 'বফ্‌র্', তার মূল আবার আবস্তিক 'বফ্র' শব্দ।‡ কাউস্‌জী 'অদ্‌ল্‌জী কাঙ্গার জেন্দ্-গুজরাতী-ইংরেজী অভিধানে 'বফ্র' শব্দ আবস্তিক বপধাতু হইতে উৎপন্ন বলিয়া লিখিত আছে। আবস্তিক বপধাতু ও সংস্কৃত বপধাতু, দুইএর একই অর্থ—ছড়ানো। আকাশ হইতে ছড়াইয়া পড়ে বলিয়া, কাঙ্গার মতে, আবস্তিকে হিমানীর নাম 'বফ্র' হইয়াছিল।¶

বরফসম্বন্ধে লেখক ঐ পর্য্যন্ত লিখিয়া বিরত হইলে আমরা আরও সুখী হইতাম। কিন্তু সে সুখে আমরা বঞ্চিত হইয়াছি। লেখক বলেন, বৃষধাতুমূলক হইলেও বরফ কালক্রমে "অনেকটা সংহতিবাচক শব্দ"

† জমাট ক্ষীরের ডেলাকে যে 'মেওয়া' বলা হয়, তাহা সম্ভবতঃ 'মোদক' শব্দেরই অপভ্রংশ।

* Paul Horn, Grundriss der Neupersischen Etymologie, s, v. *giriften.*

† হৃগ্রহোর্ভশ্ছন্দসি হস্য। পাণিনি, ৮।২।৩২, বার্ত্তিক।

‡ Horn, s. v. *berf.*

¶ Horn 'বফ্র' পর্য্যন্তই দেখাইয়াছেন, বপধাতুর উল্লেখ করেন নাই। আবস্তিক 'বফ্র' শব্দের অনুরূপ সংস্কৃত 'বপ্র' শব্দে হিমানী বুঝায় না। তবে অভিধান-চিন্তামণিকার হেমচন্দ্রের মতে বপ্রশব্দের এক অর্থ 'রেণু'। "বপ্রঃ প্রাকাররোধসোঃ। ক্ষেত্রে তাতে চয়ে রেণৌ।" রেণুবাচী বপ্রশব্দের সহিত কি 'বফ্র'র কোনও সম্বন্ধ আছে ?

হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যেমন কুম্ভীর বরফ, মালাইর বরফ, বরফী। এদিকে লাটিন Brevis, ফরাসী Bref, এবং ইংরেজী Brief শব্দের অর্থও "সংহত বা সংক্ষিপ্ত"। বরফ এবং এই সকল শব্দের ধ্বনিতে যেমন সাদৃশ্য, অর্থেও আবার তেমনই। "দুই হিসাবেই ...... এতটা সৌসাদৃশ্য ... যে, উহাদিগকে মূলে একজাতীয় বলিয়া স্পষ্টই চিনিতে পারা যায়।" এবার আর "সম্ভব" নহে, একেবারে "স্পষ্টই"! কথাটা কিন্তু যারপরনাই অস্পষ্ট। Bref এবং Brief শব্দ Brevis শব্দেরই অপভ্রংশ। Brevis শব্দের অর্থ 'সংহত' কি না, সে বিচার এখানে তুলিব না—তুলিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু খ্রীষ্টজন্মের ন্যূনকল্পে দুইশত বৎসর পূর্ব্বেও লাটিনে ঐ শব্দ বিদ্যমান ছিল। ঈরানে তখন 'বফ্র' শব্দই প্রচলিত। বলিয়াছি, 'বফ্র' শব্দের অর্থ হিমানী। হিমানী সঙ্ঘাতগুণবিশিষ্টা বটে। কিন্তু সঙ্ঘাতগুণবিশিষ্ট আর কোনও দ্রব্য যে 'বফ্র' শব্দে বুঝাইত, এমত কোনও প্রমাণ নাই। সঙ্ঘাতগুণবিশিষ্টা বলিয়াই যে হিমানীর নাম 'বফ্র' হইয়াছিল, তারও কোনও প্রমাণ নাই। পক্ষান্তরে, কাঙ্গার ব্যুৎপত্তি দেখাইয়াছি। বপধাতুর অর্থ সঙ্ঘাত নহে, বরং তার বিপরীত। লেখক নিজেও তো বৃষধাতু হইতে বরফের ব্যুৎপত্তি করিতে চাহেন। বৃষধাতুর অর্থও সঙ্ঘাত নহে, বরং তার বিপরীত। তবে আর ঐ সকল শব্দ "মূলে এক জাতীয়" হয় কিরূপে?

ইংরেজী শব্দের ব্যুৎপত্তি এ বাঙ্গালা পুস্তকে অনেক আছে। আর একটা এই। লেখক বলেন, "য়ুরোপ ও আসিয়া ভূখণ্ডের অধিকাংশ ভাষায় ধান্যের নামগুলি সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন দেখা যায়। ভারতের বৈদিক শব্দই দেশবিদেশের চালের নাম সরবরাহ করিয়াছে। বৈদিক ব্রীহি শব্দের 'ব' লুপ্ত হইয়া 'হ' 'স'তে পরিণত হইয়া ঈষৎ পরিবর্ত্তিত আকারে ইংরাজীতে 'রাইস', ফরাসী ও জর্ম্মন ভাষায় 'রিস', লাটিন ও গ্রীক ভাষায় 'অরিসা' হইয়াছে।" 'ব' যদি এত সহজে লুপ্ত বা 'হ' যদি এত সহজে 'স' তে পরিণত হইত, তবে ব্যুৎপত্তিবিদ্যাও সহজ হইত, সন্দেহ নাই। কিন্তু Rice শব্দ, সরাসর তো অসম্ভব, পরম্পরাক্রমেও যে সংস্কৃত 'ব্রীহি' শব্দ হইতেই আসিয়াছে, তারও কোনও প্রমাণ নাই। Skeat এর মতে ইংরেজী Rice শব্দের মূল—প্রাচীন ফরাসি ris। তার মূল—ইতালিয়ান riso। তার মূল—লাটিন oryza। তার মূল আবার গ্রীক oryza। তার মূল এক প্রাচীনপারসীক শব্দ, যাহা wrijzey, wrijey এবং wrijza'h রূপে এখনও পুশ্‌তুভাষায় বিদ্যমান আছে। * লুপ্তপ্রায় প্রাচীনপারসীকভাষার ছোট বড় যে বিশ পঁচিশটা টুক্‌রা এপর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হইয়াছে, এতদনুরূপ কোনও শব্দ আমরা তার মধ্যে খুঁজিয়া পাই নাই। ইহাতেই কিছু এমত বুঝায় না যে, ঐরূপ কোনও শব্দ ঐ ভাষায় ছিল না। প্রত্যক্ষ পুশ্‌তু ফেলিয়া ঐ গ্রীক-শব্দের প্রাচীনপারসীক মূল অনুমান করিবার এক কারণ অবশ্য ঐতিহাসিক—শত শত বৎসরের মহাদ্বন্দ্বে যবনপারসীকের দীর্ঘ সংস্পর্শ। পারসীকভূমি ইউফ্রেটীস্‌তটেই যবন

* W. W. Skeat, *A Concise Etymological Dictionary of the English Language*, New Edition, s. v. Rice. নব্যপারসীক 'বিরিঞ্জ্' শব্দের ব্যুৎপত্তিপ্রসঙ্গে Horn ও ঐ পুশ্‌তুশব্দের উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু উহার প্রাচীনপারসীক মূল অনুমান করেন নাই।

আবার প্রথম ধানের চাষ দেখিয়া থাকিবে।† যাহা হউক, আবস্তিকে উহার অনুরূপ শব্দ—'বৃঞ্জ' ‡। তার অর্থও ধান অথবা চাউল। তণ্ডুলবাচী নব্যপারসীক 'বিরিঞ্জ' শব্দ এই আবস্তিক শব্দ হইতে আসিয়াছে, বোধ হয়। এখন ঐ পুশ্‌তু বা প্রাচীনপারসীক 'ব্রীজে', ঐ আবস্তিক 'বৃঞ্জ', এবং আমাদের সংস্কৃত 'ব্রীহি' শব্দ যে পরস্পরসদৃশ শব্দ, তাহাতে সন্দেহ নাই। সম্ভবতঃ ইহারা পরস্পরসম্পর্কবিশিষ্টও বটে। বড় জোর, ঐপর্য্যন্ত বলা যায়। বর্ত্তমানে অনুমানের পরিধি ঐ। সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ। তার পর সব অন্ধকার। 'ব্রীজে' যে 'ব্রীহি' হইতে আসিয়াছিল, তার প্রমাণ নাই।

কথাটা নূতন নহে। শতবর্ষ পূর্ব্বে ভাষাবিদ্যার শৈশবে এ কথাটা ইউরোপেই একবার উঠিয়াছিল। গ্রীক লাটিন হইতে সংস্কৃত, না সংস্কৃত হইতে গ্রীক লাটিন? এ দুই কল্পের কোনও কল্পেরই প্রমাণ নাই। নৈয়ায়িকেরা বলেন, বিনিগমনাবিরহ। পক্ষান্তরে ইহাও আবার অসম্ভব নহে যে, সংস্কৃত গ্রীক লাটিন, এ সকল প্রধান ভাষাই মূলপ্রকৃতিরূপা আর এক চিরবিলুপ্তা পুরাতনী ভাষা হইতে যুগযুগান্তরবাহিনী পৃথক্‌পৃথক্‌ ধারায় নিঃসৃতা হইয়াছিল। গ্রীক লাটিন হইতে আবস্তিক, পুশ্‌তু বা প্রাচীনপারসীক সংস্কৃতের অন্তরতর বটে। কিন্তু আধুনিক ভাষাবিদ্যার এ চরম সিদ্ধান্ত ভারত ঈরানীয় ভাষাগণেও তেমনই প্রযোজ্য। সকল কথা খুলিয়া বলিবার এ স্থান নয়, পাঠক আকরে দেখিতে পাইবেন। পণ্ডিতেরা যেখানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন, আমাদেরও সেখানে একবার দাঁড়ানো ভাল।

ইংরেজী Rice এর তো অবস্থা এই। এখন, আমাদের বাঙ্গালা 'চাউল' শব্দটা কোথা হইতে আসিল? শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের মতে, সংস্কৃত 'তণ্ডুল' শব্দ হইতে। 'তণ্ডুল' হইতে 'চাঁডুল', তাহা হইতে 'তাউল', তাহা হইতে 'চাউল'।* খগেন্দ্র বাবুর কিন্তু এ ব্যুৎপত্তি "অত্যন্ত কষ্টকল্পিত বলিয়া মনে হয়"। তিনি বলেন, "'তণ্ডুল' হইতে অত করিয়া 'চাল' শব্দ আসা সম্ভব নহে। 'তণ্ডুল' সংস্কৃত বৈদিক শব্দ আর 'চাল' আধুনিক বাঙ্গলা শব্দ।" কথাটা মুদীর সময়ে ভুলিয়া গিয়াছিলেন। যাহা হউক, খগেন্দ্র বাবুর মতে "চালিয়া লওয়া হইতে বাঙ্গলা 'চাল' এর উৎপত্তি.........যাহা চালনী বা কুলায় চালিয়া লওয়া হয় অর্থাৎ তুষবর্জ্জিত করা হয় তাহাই 'চাল'।"

এ উত্তর ব্যুৎপত্তিতেই আমাদের একটু

† খ্রীষ্টপূর্ব্ব ৩৩১ অব্দের নিদাঘে আলেকজণ্ডর-বাহিনী ইউফ্রেটীস্ পার হয়। এ পুরাণ কথা সকলেই জানেন। তখন ইউফ্রেটীস্‌প্রদেশে ধানের চাষ হইত। *Encyclopædia Britannica*, Ninth Edition, s. v. Rice. তার মূল আবার উদ্ভিদ্বিদ্যাবিশারদ ফরাসী আচার্য্য Alphonse de Candolle এর Origin of Cultivated Plants নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ।

‡ Horn, s. v. *birinj.* মার্কিন অধ্যাপক Schuyler এর অবস্তাশব্দানুক্রমণীতে আমরা এই 'বৃঞ্জ' শব্দ পাই নাই।

* আবশ্যক হইলে বারান্তরে বিষয়টা সবিস্তর আলোচনা করিব। কুতূহলী পাঠক Watt's *Dictionary of the Economic Products of India*, Vol. V, pp. 512-519 দেখিবেন। ৫১৮র পাতায় Sir Charles Lyall এর উক্তিতে একটা ভ্রম আছে। সংস্কৃত 'সহস্র' 'হিম' ও 'হৃদয়' শব্দের তিনি যে প্রাচীনপারসীক প্রতিরূপ দেখাইয়াছেন, তাহা বস্তুতঃ প্রাচীনপারসীক নহে, আবস্তিক। এ ভ্রমে তাঁর মূলসিদ্ধান্তের হানি হয় নাই।

* সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ৪র্থ ভাগ, ৪র্থ সংখ্যা, সন ১৩০৪ চৈত্র।

একটু আপত্তি আছে। দ্বিজেন্দ্র বাবুর সিদ্ধান্তে "অত করিয়া…আসা" বলিয়া ঋতেন্দ্র বাবু যে ভয় পাইয়াছেন, আমাদের সে ভয় নাই। আমাদের সংশয়ের কারণ এই যে, সংস্কৃত এবং তদুৎপন্ন ভাষাসমূহে তকারের চকারে পরিণামের একটীমাত্র দৃষ্টান্ত আছে—সংস্কৃত 'তিষ্ঠতি' প্রাকৃতে 'চিট্‌ঠদি'বা 'চিট্‌ঠই' হয়—আর দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত নাই। * ঋতেন্দ্র বাবুর ব্যুৎপত্তিতে আমাদের আপত্তি এই যে, বাঙ্গালায় যেমন 'চাল' শব্দ আছে, তেমনই আবার 'চাউল' শব্দও আছে। বাঙ্গালা 'চাউল' এর অনুরূপ হিন্দীশব্দ—'চাঁবল' বা 'চাবল'। একই শব্দের চার রূপ। এখন এ চারের মধ্যে বয়সে বড় কে, ঋতেন্দ্র বাবু তাহা নির্ণয় করেন নাই। যদি 'চাঁবল' 'চাবল' বা'চাউল'ই জ্যেষ্ঠ হয়, তবে কিন্তু রাহুগ্রস্ত শশধরের মত ঋতেন্দ্র বাবুর সিদ্ধান্তও মলিন হইয়া পড়ে। কেন না চালিয়া লওয়া হইতে 'চাল' যেমন চক্ষের নিমেষে বাহির হয়, 'চাঁবল' 'চাবল' বা'চাউল'তেমন হয় না।

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র গুহ। এম্-এ,বি-এল্।

একই ব্যাস কি মহাভারত ও ভাগবতের রচয়িতা ?

১৩১৭ সন পৌষের নব্যভারতে শ্রীযুক্ত জানকীনাথ গোস্বামী মহাশয় প্রশ্ন তুলিয়া মীমাংসা করিয়াছেন—মহাভারত ও ভাগবতের রচয়িতা একই ব্যক্তি। আমরা এই মত স্বীকার করি না। সুতরাং এ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই খানেই লিপিবদ্ধ করিলাম।

মহাভারত ও ভাগবতের ভাষা ও রচনা প্রণালী এত ভিন্ন মার্গাবলম্বী যে,উভয় গ্রন্থকে এক ব্যক্তির রচনা বলা সাধারণ বুদ্ধির পক্ষে নিতান্তই কষ্ট-কল্পনা হইয়া দাঁড়ায়। সুতরাং অসাধারণ বুদ্ধির আশ্রয় লইতে হয়। কাজেই গোস্বামী মহাশয় বলিতে বাধ্য হইয়াছেন—ব্যাস যখন বিষ্ণুর অবতার, তখন তাঁহার পক্ষে এরূপ বিসদৃশ রচনা অসম্ভব নহে। ব্যাসদেব ছাড়া এরূপ গ্রন্থ আর কাহারও নহে! বাবু ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় তাঁহার গীতার ভূমিকায় একই ব্যাস সমগ্র মহাভারতের রচয়িতা,ইহা প্রমাণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া দেখিতে পাইয়াছেন যে, প্রথম সংস্করণ ও চতুর্থ সংস্করণের মধ্যে ব্যবধান অনেক। তাহা হইলে ব্যাসকে বাঁচিতে হয় অন্ততঃ ২৯৮ বৎসর। সুতরাং ক্ষিতীন্দ্র বাবু আমাদের সাধারণ বুদ্ধিকে চুকথা শুনাইয়া দিয়া বলিয়াছেন যে, একজন ঋষির পক্ষে এতদিন বাঁচিয়া থাকা অসম্ভব নহে। বরং সেকালের লোকে এরূপ বাঁচিত। ঐতিহাসিক তত্ত্ব নিরূপণে এইরূপ যুক্তি যে নিতান্ত অসার ও অর্থহীন, আমাদিগের সে জ্ঞান নাই বলিয়াই দেশের ইতিহাস নাই এবং ঐতিহাসিক জন্মে না। যাহা হউক, আমি দেখাইতে চেষ্টা করিব, ভাগবত ও মহাভারতের বর্ণিত ঘটনাবলির মধ্যে এমন কিছু আভ্যন্তরীন প্রমাণ আছে কিনা, যাহাতে সহজেই বুঝিতে পারা যাইবে, উক্ত উভয় গ্রন্থ একজনের রচিত নহে।

১। ভাগগতে কথিত আছে যে, রাজা পরীক্ষিৎ সাত দিনের মধ্যে তক্ষক দংশনে মৃত্যু-

* Louis H. Gray, *Indo-Iranian Phonology*, § 223

এবার সম্মিলনের বিবরণী পত্রিকাদিতে তেমন দেখিতে পাইলাম না—তাই সাধারণ ভাবে কোনও মন্তব্য প্রকাশ করিতে পারা গেল না। "প্রতিনিধি" * সংখ্যা নাকি মাত্র ১৫০ হইয়াছিল—তাহা হইলে বাস্তবিকই বড় কম। ময়মনসিংহে যেরূপ গুল্‌জার হইয়াছিল, ঢাকায় তদপেক্ষাও অধিক হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু কেবল সময় সংক্ষেপ বা বন্ধের অভাবই যে অল্পতার কারণ, এমন নহে—রেল্‌ ভাড়ার বৃদ্ধি ও রিটার্ণ টিকিট বা কন্‌সেশনের অভাবও একটা বিশিষ্ট কারণ। কলেজগুলি বন্ধ থাকিলেও যাঁহারা আসিতেন—সেই অধ্যাপকবৃন্দ প্রায়শঃ পরীক্ষার কাগজ নিয়া ব্যস্ত ছিলেন। বিশেষতঃ, সালতামামি হালখাতার সময়ে কেহ কেহ আসিতে অসুবিধা বোধ করিয়া থাকিতে পারেন। সব দিক্‌ বিবেচনা করিয়া দেখিলে বড়দিনের ছুটিই সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত সময়—কংগ্রেস্‌-যাত্রী দুই চারিজন ভিন্ন অন্য সকলের পক্ষেই তাহা সুবিধাজনক। তার পর ইষ্টারের ছুটি; কিন্তু তখন অধ্যাপকেরা পরীক্ষার কাগজ পান—এদিকে প্রবিন্‌সিয়েল্‌ কন্‌ফারেন্‌স্‌ ইত্যাদিও থাকে।

আগামী অধিবেশন মুঙ্গেরে হইবার কথা। উচিত ছিল, তথায় তার করিয়া সংবাদ আনিয়া তাহা প্রচার করা। বোধ হয় তাহা হয় নাই। যাহা হউক, সংবাদ জানিবার জন্য আমরা উদ্‌গ্রীব থাকিলাম। মুঙ্গেরে সম্মিলন বড়দিনে না হইলে গরম বাড়িলে অসুবিধা হইবে। ভাগলপুরে সরস্বতী পূজার সময়ে সম্মিলন হইয়াছিল—তাহাতেও যেন কিঞ্চিৎ অসুবিধাই ভোগ করিতে হইয়াছিল। মুঙ্গেরেও সুতরাং শীত থাকিতেই সম্মিলনের অধিবেশন হওয়া উচিত।

শ্রীপদ্মনাথ দেবশর্ম্মা।

"এষা"র নামকরণ। (১)

শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার বড়াল মহাশয়ের নূতনতম কাব্যের নাম, "এষা"। বহুদিন হইল ইহার দ্বিতীয় সংস্করণও প্রকাশিত হইয়াছে। কবির পরলোকগতা পত্নী এ কাব্যের আলম্বন। মৃত্যুর আজ কত বৎসর পরেও কবি যাঁহাকে অন্বেষণ করিতেছেন, তিনিই এষা। শব্দটা বিশুদ্ধ। সংস্কৃতে ইষধাতুর এক অর্থ, ইচ্ছা বা অন্বেষণ। তার পরে কর্ম্ম বুঝাইতে 'অ'—পাণিনির কৃত্রিম তন্ত্রে ঘঞ্‌। দুই মিলিয়া, এষ। তার পরে আবার স্ত্রী বুঝাইতে 'আ'—পাণিনির টাপ্‌। তিনে মিলিয়া, এষা। যে নারী অন্বেষণের বিষয়, তিনিই এষা। ইষ্টা এষা, একই কথা। অর্থে বৈচিত্র্য নাই। অথবা যেটুকু ছিল, তাও বুঝি আমার হাতে রহিল না। কিন্তু শব্দটি বড় মধুর। বেদে না থাকিলেও বেদশব্দেরই মত লাগে বটে। তারই মত লঘু, ক্ষিপ্র, বলিষ্ঠ। তেমনই নগ্ন, তেমনই

* 'ভারতবর্ষ'-সম্পাদক মহাশয় 'ডেলিগেট' মনে করিয়া এই "প্রতিনিধি" শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। আমার বোধ হয় 'অভ্যাগত' বা 'আমন্ত্রিত' এইরূপ শব্দই সুষ্ঠু প্রযোজ্য—কেন না, যাঁহারা আইসেন, তাঁহাদের প্রায় সকলেই নিমন্ত্রণ পাইয়াই আসেন—কোনও সভাসমিতি কর্ত্তৃক 'প্রতিনিধি' নির্ব্বাচিত হইয়া কদাচিৎ কেহ আইসেন।

তীক্ষ্ণ। তেমনই সন্ধ্যালোকবৎ অস্পষ্ট—সরস্বতীর যুগান্তসন্ধ্যা! অস্পষ্ট, অপরিচিত, অথচ কত স্মৃতির উদ্বোধন!

কিন্তু বেদস্তুতিতে আমি আসল কথা ভুলিয়া যাইতেছি। এই কাব্যের প্রথম সংস্করণে নামকরণ নামে শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের লিখিত এক ভূমিকা ছিল। তাহাতে তিনি সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে, অন্বেষণযোগ্য বা স্মরণ-যোগ্য বা বাঞ্ছনীয় অর্থে এষ ও এষা শব্দ বেদে প্রযুক্ত আছে। শুধু বেদে নয়, বৈদিকী হইতে পৈশাচী পর্য্যন্ত অনেক ভাষায়ই নাকি আছে। দ্বিতীয় সংস্করণে অক্ষয় বাবু সে ভূমিকাটা ছাপান নাই, কিন্তু তারই সার-সঙ্কলনচ্ছলে সে সিদ্ধান্তটা ছাপাইয়াছেন। সিদ্ধান্ত আসিলে ভূমিকাও তার সঙ্গে সঙ্গে আসে। অতএব এখনও সে ভূমিকার সমা-লোচনা অনুচিত বা অসঙ্গত নয়।

অন্বেষণযোগ্য বা স্মরণযোগ্য বা বাঞ্ছনীয় অর্থে যে এষ ও এষা শব্দ বেদে আছে, অমূল্য বাবুর মতে তার এক প্রমাণ এই—

(১) যুবং হ ঘর্ম্মং মধুমন্তমত্রয়েঽ-
পো ন ক্ষোদোঽবৃণীতমেষে।

ঋগ্বেদসংহিতা, ১।১৮০।৪।

ঋকের আধখানাকে অর্দ্ধর্চ্চ বলে। এও তাই। দুই অশ্বী ঋকের দেবতা, পুরাণে যাঁহারা অশ্বিনীকুমার নামে প্রসিদ্ধ। পরে আমি আশ্বিনী ঋক্ বলিয়া এই অর্দ্ধর্চ্চেরই উল্লেখ করিব।

বেদভাষ্যকার সায়ণাচার্য্যের মতে, এ ঋকে এক আখ্যায়িকা আছে। প্রত্যেক যাগই পর পর অনুষ্ঠেয় কতকগুলি অবান্তর কর্ম্মের সমষ্টিমাত্র। সে সব কর্ম্মকে সেই সেই যাগের অঙ্গ বলা হয়। অগ্নিষ্টোমপ্রভৃতি সোমযাগেরও অনেক অঙ্গ। যথা দীক্ষণীয়া, প্রায়ণীয়া, সোমক্রয়, আতিথ্য, প্রবর্গ্য, উপসদ্ ইত্যাদি। প্রবর্গ্যে মহাবীরনামক এক মৃন্ময় পাত্রে সদ্যোদুগ্ধ দুধ তপ্ত করিয়া অশ্বিদ্বয়ের উদ্দেশে তার হোম করিতে হয়। এই গরম দুধই প্রবর্গ্যের হবিঃ। তারই নাম ঘর্ম্ম। (১) রাক্ষসেরা নাকি একদা অত্রিকে এই তপ্ত ঘর্ম্মের মধ্যে ফেলিয়া দিয়া-ছিল, বিপন্ন মুনির স্তবে তুষ্ট হইয়া অশ্বীরা তাঁহাকে রক্ষা করেন। অথবা রাক্ষসেরা অত্রিকে একেবারে আগুনের মধ্যেই ফেলিয়া দিয়াছিল, অশ্বীরা তাঁহাকে বাঁচাইয়াছিলেন, এরূপও আখ্যায়িকা আছে। ঘর্ম্মশব্দে ঋগ্বেদে দীপ্ত অগ্নিও বুঝায় বটে।

এখন, সায়ণের মতে এখানে "এষে", চতুর্থ্যন্ত, "অত্রয়ে"র বিশেষণ। অর্থ—"সৌখ্যমিচ্ছতে", সুখেচ্ছুর জন্য। সুস্পষ্ট। ভাষ্যকার ভাবে জুড়িয়া দিয়াছেন। ইচ্ছা-র্থক ইষধাতুর পরে কর্ত্তরি বাচ্যে বিচ্ প্রত্যয় (২) করিয়া ষকারান্ত এষ্‌শব্দ। তার অর্থ,

(১) ঐতরেয়ব্রাহ্মণ, ১।২২।৬,১০। আশ্বলায়ন-শ্রৌতসূত্র, ৪।৭। 'ঘর্ম্ম' ঐ মৃন্ময় পাত্রেরও নামান্তর। ঐ. ব্রা. ১।২২।১৪।

(২) পাণিনি, ৩।২।৭৫। বলা বাহুল্য, পাণিনি-কল্পিত ক্বিন্ ক্বিপ্ ণ্বি ণ্বিন্ বিচ্ বিট্, ইহার কোনও প্রত্যয়ই বাস্তব প্রত্যয় নহে। বিচ্ ও ক্বিপ্‌এর মধ্যে এক প্রভেদ এই যে, প্রথমে ধাতুর গুণ হয়, দ্বিতীয়ে হয় না। এ প্রভেদের দৃষ্টান্ত, লৌকিক সংস্কৃতে কেন, বেদেও বিরল বটে। একটা, বোধ হয়, হিংসার্থক রিষধাতু হইতে রেষ্‌শব্দ, প্রথমার একবচন 'রেট্'; বাজসনেয়িসংহিতা, মাধ্যন্দিনী শাখা, ৬।১৮। বেন্‌ফাইর মতে (Benfey, *Vollstaendige Grammatik der Sanskritsprache*, s. 366), ১।৬৪।৩ ঋকের অভোগ্‌ঘন্‌শব্দে অভোজ্‌শব্দের উত্তরপদ 'ভোজ্'ও এই বিচ্‌প্রত্যয়ান্ত ভুজধাতু জাত। কিন্তু সায়ণমতে

শ্রী অক্ষয় কুমার কয়াল প্রণীত — "এষা" গীতি কাব্যের নামকরণ।

বৈদিক যুগের প্রথমাংশে আমরা 'এষঃ' ও 'এষা' পদের প্রয়োগ দেখিতে পাই। এই উভয় শব্দই 'ইষ্' ধাতু নিষ্পন্ন, অর্থ – 'অন্বেষণযোগ্য', 'স্মরণযোগ্য', 'বাঞ্ছনীয়'।

"যুবং হ ঘর্মং মধুমন্তমত্রয়েহপো ন ক্ষোদোহবৃণীতমেষে"

— ঋগ্বেদ ১।১৮০।৪

অতঃপর যখন এই একান্ত বাঞ্ছনীয় স্মরণযোগ্য ব্যক্তিকে — তাহার উপলব্ধি করিবার জন্য আর্য্য ঋষিগণ বদ্ধপরিকর হইন, যখন বহু দেবতার মধ্যে লোকে খুঁজিয়া একেশ্বরবাদের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তখন তাহারা দেবতাদিগের মধ্যে বিষ্ণুকেই 'এষঃ' নামে অভিহিত করেন।

"মরুত এবয়াব্নো বিষ্ণোরেষস্য প্রভৃথে হবামহে"

— ঋক্ ২।৩৪।১১

মহাভারতেরও একস্থানে বিষ্ণু অর্থে 'এষ' শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে;

"বিচক্রমে পৃথিবীমেষ এতাং ক্ষেত্রায় বিষ্ণুর্মনুষে দশস্যন্ভর্তুরেষ"

— মহাভারত ১, ৮৩৯৯

তারপর আমরা নিঘণ্টু, নিরুক্ত, মুদ্গল ও সায়ণভাষ্যে 'স্মরণযোগ্য' অর্থে 'এষঃ' ও 'এষা'র প্রয়োগ বহুবার পাইয়াছি; যথা ঋক্ প্রাঃ: ৪,৭; শতপথ ব্রাঃ: ২।৪।২।৪; নিরুক্ত ৫,২; অথর্বপ্রা ১,৬৭; ইত্যাদি।

প্রাকৃতের মধ্যে 'চক্কী' ও 'পৈশাচী' রীতির কোন কোন স্থানে 'স্মরণযোগ্য' অর্থে কেবল 'এষা'রই প্রয়োগ আছে, —

"হেমেসাতুঃ পিউচ্ছুতি" — প্রভৃতি।

'প্রাকৃতলক্ষ্মীনামমালা'য় ও 'স্মরণযোগ্য' অর্থে 'এষা'র উল্লেখ আছে।

ফলতঃ বাঙ্গালায় 'এষা' শব্দের এই প্রথম প্রচার হইলেও সংস্কৃত ও প্রাকৃতের অনুসরণে ইহার প্রয়োগ নিতান্ত সুষ্ঠু এবং 'In memoriam' অপেক্ষা গভীর ভাব-দ্যোতক হইয়াছে।

১৩১৯ বঙ্গাব্দ,
২৪শে শ্রাবণ।

শ্রীঅমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ।

যে ইচ্ছা করে, ইচ্ছু। প্রথমার একবচনে 'এট্', চতুর্থীর একবচনে 'এষে', সপ্তমীর বহুবচনে 'এট্‌সু'। এ সকল ব্যাকরণের উৎপাত এ প্রবন্ধে পাঠককে বার বার একটু সহ্য করিতে হইবে। "অপো ন ক্ষোদঃ", একটা উপমা। সায়ণ তার দুই ব্যাখ্যা দিয়াছেন। "অবৃণীতম্", এ আখ্যাতেরও ভাষ্যে দ্বিবিধ ব্যাখ্যা আছে। সে সকলের বিচার এখানে নিষ্প্রয়োজন। সায়ণমতে এ অর্দ্ধর্চ্চের এক অনুবাদ এই হয়—

অত্রি ইচ্ছা করায় তাঁহার জন্য তোমরা দুই জনেই দীপ্ত অগ্নিকে শীতল জলের মত মধুময় করিয়া দিয়াছিলে।

পক্ষান্তরে, Böhtlingk ও Roth এর সঙ্কলিত সংস্কৃতাভিধানের (১) মতে, "এষে" সপ্তম্যন্ত। অর্থ—ইচ্ছায়, ইচ্ছানুসারে। ভাবঘঞ্‌নিষ্পন্ন অকারান্ত এষশব্দ। তার অর্থ, ইচ্ছা। সপ্তমীর একবচনে 'এষে'। এ মতে অনুবাদ এই—

অত্রির জন্য (তাঁহার) ইচ্ছানুসারে তোমরা দুই জনেই মধুময় তপ্ত দ্রব্য জল-হিল্লোলের মত করিয়া দিয়াছিলে।

ঋগ্বেদের অভিধানকার এবং অনুবাদক গ্রাস্মান্‌ও এই মতাবলম্বী। (১) পাশ্চাত্য বৈয়াকরণাগ্রণী হুইট্‌নিও তাই বলিয়া বোধ হয়। (২) হুইট্‌নিশিষ্য ল্যান্‌ম্যান্ স্পষ্টই তাই। (৩)

পাঠক দেখিবেন, "এষে"র এই দুই ব্যাখ্যার তাৎপর্য্যে কোনও প্রভেদ নাই। কিন্তু BR এর ব্যাখ্যায় 'তাঁহার', অর্থাৎ অত্রির, এইরূপ একটা পদের অধ্যাহার না করিলে বাক্যার্থে "এষে"র অন্বয় অসম্ভব হইয়া পড়ে। তা ছাড়াও, ব্যাকরণের হিসাবে, ভাষ্যকারের ব্যাখ্যাই আদরণীয়।

বেদার্থের নির্ণয়ে বেদের স্বর অনেক সময়েই বড় সহায়। তিনটা পরস্পরবিভিন্ন পদার্থের এক নাম হইয়া এখানে একটু গোল বাধাইতেছে। সংস্কৃতে অকারাদি স্বরবর্ণের নামও স্বর, উদাত্তাদি স্বরের নামও স্বর, আবার ষড়্‌জাদি সুরের নামও স্বর। অথচ অকারাদি ধর্ম্মী, উদাত্তাদি বা ষড়্‌জাদি তার ধর্ম্মমাত্র। প্রাচীন পরিভাষার এ গোল প্রাণিনিকেও মিটাইতে হইয়াছিল। অষ্টাধ্যায়ীতে তাই স্বরশব্দে শুধু উদাত্তাদিই বুঝায়,

সে শব্দ ণিজন্ত ভুজ অর্থাৎ ভোজিধাতুর পরে ক্বিপ্-যোগে নিষ্পন্ন। তাহাতে আর গুণের প্রয়োজন হয় না। পদপাঠের অনুরোধেই প্রকৃত ঋকের ভাষ্যে এষ্‌শব্দটাকে বিজন্ত বলিতে হয়। কেন না, ৬।২১।৮ ঋকে "এষ্টৌ"র পদপাঠে যেরূপ "আঽইষ্টৌ" আছে, এখানে "এষে"র পদপাঠে সেরূপ 'আঽইষে' নাই, "এষে"ই আছে। নহিলে আঙ্‌পূর্ব্বক ইষধাতুর পরে ক্বিপ্ করিয়াও ঐ শব্দ সিদ্ধ হইতে পারে। মহাভাষ্যকারও সর্ব্বত্র পদপাঠ মানেন নাই। "অবগ্রহেঽপি ন লক্ষণেন পদকারা অনুবর্ত্ত্যাঃ পদকারৈর্নাম লক্ষণমনুবর্ত্ত্যম্। যথালক্ষণং পদং কর্ত্তব্যম্।" পা. ৮।২।১৬, ভাষ্য। যে প্রসঙ্গে পতঞ্জলি কথাটা তুলিয়াছেন, সেখানে কিন্তু পদকারের অবগ্রহই সমীচীন। কোনও পদে প্রাতিপদিক বা প্রাতিপদিকগুলি পৃথক্ করিয়া প্রদর্শনের নাম অবগ্রহ। পদপাঠে তাই করা হয়।

(১) এই মহাগ্রন্থই 'সেণ্ট পীটর্স্‌বর্গ অভিধান'* (৭ খণ্ডে সমাপ্ত, ১৮৫৫-১৮৭৫) নামে জগদ্বিখ্যাত। পরে আমি সংক্ষেপে B.R. বলিয়া ইহার উল্লেখ করিব। অমূল্য বাবু তাঁহার মন্ত্র, ব্রাহ্মণ, নিরুক্ত ও মহাভারতের প্রমাণ ইহা হইতেই গ্রহণ করিয়াছিলেন।

(১) Grassmann, *Woerterbuch zum Rig-Veda*, s. v. 2. এষ।

(২) Whitney, *The Roots, Verb-forms, and Primary Derivatives of the Sanskrit Language*, s. r. 1 ইষ।

(৩) Lanman, *On Noun-inflection in the Veda*, p. 380.

*Sanskrit-Wörterbuch in Kürzerer Fassung Bearbeitet von Otto Böhtlingk. (St. Petersburg, [illegible]). Von Otto Böhtlingk und R. Roth, Sanskrit-Wörterbuch (St. Petersburg, 1855-1875).

আর কিছু বুঝায় না। বেদের স্বর বলিতে আমিও এখানে উদাত্তাদি স্বরের কথাই বলিতেছি। অকারাদিকে এ প্রবন্ধে আমি স্বরবর্ণ, এবং ষড়্‌জাদিকে সুর বলিয়া উল্লেখ করিব।

সকল ভাষায়ই বহুতর শব্দ তার একটা বা একাধিক নির্দ্দিষ্ট স্বরবর্ণের উপর একটু বেশী জোর দিয়া উচ্চারণ করিতে হয়। শব্দোচ্চারণে এই প্রযত্নাধিক্যকে আধুনিক ইউরোপীয় ভাষায় Accent বা Tone বলে। পৃ: ১৪৭ গীতসূত্রসার প্রণেতা বাঙ্গালায় তাহাকে প্রস্বন বলিয়াছেন। সংস্কৃতে তারই নাম, স্বর। ভারত-ইউরোপীয় ভাষাগণে এই স্বর দুই রূপে দেখিতে পাওয়া যায়। অনেক ভাষায়ই শব্দের স্বরযুক্ত বা প্রস্বনিত ও স্বরহীন বা অপ্রস্বনিত স্বরবর্ণের মধ্যে সুরের কোনও প্রভেদ নাই, দুইই এক সুরে উচ্চারিত হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে, ঐ ভাষাগণের কয়েকটা ভাষায় শব্দের প্রস্বনিত স্বরবর্ণ অপ্রস্বনিতের চেয়ে উচ্চতর সুরে উচ্চারিত হয় বা হইত। যেমন অপ্রস্বনিতের সুর যদি সা হয়, তবে প্রস্বনিতের সুর রে গা বা আর কোনও উঁচু সুর হওয়া চাই। তাই সে ভাষাগুলি শুনিতে গানের মত লাগে। যথা প্রাচীন সংস্কৃত, প্রাচীন গ্রীক্, আধুনিক ভাষার মধ্যে সুইডিশ্ ও লিথুআনিআন্। অতএব এ দুই রূপের প্রথমকে অপ্রগীত, দ্বিতীয়কে প্রগীত স্বর বলা যাইতে পারে।

বেদের স্বরও তবে প্রগীত স্বর। ঋগ্বেদে সে স্বর মোটামুটি ত্রিবিধ। অনুদাত্ত, উদাত্ত ও স্বরিত। এই সব স্বরযুক্ত স্বরবর্ণও যথাক্রমে এই সব নামেই পরিচিত—অনুদাত্ত, উদাত্ত, স্বরিত। অনুদাত্তের চেয়ে উদাত্তের সুর উঁচু। ঋগ্বেদে আবার উদাত্তের চেয়ে স্বরিতের প্রথম আধ মাত্রার অথবা একেবারে সমস্ত প্রথমার্দ্ধের সুর উঁচু, শেষাংশের সুর উদাত্তেরই মত। (১) উদাত্ত এবং স্বরিতেই প্রস্বন, অনুদাত্তে বস্তুতঃ প্রস্বন নাই। অপ্রস্বনিত স্বরবর্ণই অনুদাত্ত। কিন্তু তার উচ্চারণেও বাগিন্দ্রিয়ের একটু না একটু প্রযত্ন আবশ্যক। ভারতীয় এবং যবন আচার্য্যেরা অনুদাত্তকেও তাই স্বরমধ্যে পরিগণিত করিয়াছিলেন। বিশেষতঃ, অনুদাত্তই উদাত্ত এবং স্বরিতের মান। যেমন খড়্‌জের ওজনে রেখাব গান্ধার প্রভৃতির ওজন হয়, তেমনই অনুদাত্তের ওজনেই উদাত্ত এবং স্বরিতের তীব্রতা নিরূপিত হইয়া থাকে।

প্রাতিশাখ্যের জটিল পরিভাষা ছাড়িয়া দিলে, স্বরিতও মোটামুটি দ্বিবিধ। স্বতন্ত্র ও পরতন্ত্র। অল্পসংখ্যক শব্দ স্বভাবতঃই সর্ব্বানুদাত্ত, অর্থাৎ তাহাদের সকল স্বরবর্ণ অনুদাত্ত। অনেক শব্দ আবার স্বভাবতঃ সর্ব্বানুদাত্ত নয়, কিন্তু অবস্থানবিশেষে তাই হয়। কতকগুলি শব্দ দ্ব্যুদাত্ত, তাহাদের দুইটা নির্দ্দিষ্ট স্বরবর্ণ উদাত্ত। অন্ততঃ একটা শব্দ ত্র্যুদাত্ত, তার তিনটা স্বরবর্ণই তাই। কিন্তু অধিকাংশ শব্দেই একটামাত্র স্বরবর্ণ উদাত্ত থাকে। সেরূপ স্বরবর্ণ শব্দের প্রথম স্বরবর্ণ হইলে শব্দটাকে আদ্যুদাত্ত, মধ্যে কোনও স্বরবর্ণ হইলে মধ্যোদাত্ত, এবং অন্ত্য স্বরবর্ণ হইলে অন্তোদাত্ত বলা হয়। শব্দ বলিতে এখানে ধাতু, প্রত্যয়, প্রাতিপদিক, পদ, সবই ধরিতেছি। শব্দের যে বা যে যে স্বরবর্ণ উদাত্ত, তদ্ব্যতীত আর সকল স্বরবর্ণই অনুদাত্ত হইয়া থাকে। (২) কিন্তু একই শব্দের অনুদাত্ত হউক বা

(১) ঋক্‌প্রাতিশাখ্য, ৩।২-৩।

(২) পা. ৬,১,১৫৮।

* বাঙ্গালা সঙ্গীত গ্রন্থ। কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রনীত। এই গ্রন্থখানিতে হিন্দু সঙ্গীতের সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। [illegible] শাস্ত্র সম্বন্ধে অনেক মৌলিকত্বও ইহাতে লক্ষিত হয়। ইহাতে অনেকগুলি হিন্দি ও বাঙ্গালা গান ইং রাজি স্বরলিপি যোগে সন্নিবেশিত হইয়াছে। কতকগুলি গান বাঙ্গালা স্বরলিপি [illegible]

পরশব্দের অনুদাত্ত হউক, উদাত্তের ঠিক্ পরের অনুদাত্তটা অনুদাত্ত না থাকিয়া স্বরিত হয়, যদি না আবার তার পরের স্বরবর্ণ উদাত্ত বা স্বতন্ত্রস্বরিত হয়। অনুদাত্তের পরের স্বরবর্ণ উদাত্ত বা স্বতন্ত্রস্বরিত হইলে উদাত্তের পরেও সে অনুদাত্ত স্বরিত হয় না, অনুদাত্তই থাকিয়া যায়। নিত্য উদাত্তের পরস্থিত ঐ স্বরিতকেই পাশ্চাত্যেরা পরতন্ত্র বলিয়া থাকেন। কেন না, পূর্ব্বে উদাত্তের সদ্ভাব এবং পরে উদাত্ত ও স্বতন্ত্রস্বরিতের অসদ্ভাব, এ দুয়ের উপর ইহার উৎপত্তি নির্ভর করে। আর একপ্রকার স্বরিত আছে, যাহা স্বতঃস্বরিত, ঐরূপ কোনও নিমিত্তের অপেক্ষা রাখে না। যেমন, স্বর্শব্দের অকার বা কন্যাশব্দের আকার। তার পূর্ব্বে উদাত্ত কিংবা পরে উদাত্ত বা স্বতন্ত্রস্বরিত থাক্ আর নাই থাক্, সে স্বরিত স্বরিতই থাকে, কোনও অবস্থায় তার রূপান্তর হয় না। এই স্বরিতই পাশ্চাত্যদিগের স্বতন্ত্র স্বরিত। তাহা শব্দের প্রথম স্বরবর্ণে থাকিলে শব্দটাকে আদিস্বরিত, মধ্যের কোনও স্বরবর্ণে থাকিলে মধ্যস্বরিত, এবং অন্ত্য স্বরবর্ণে থাকিলে অন্তস্বরিত বলা হয়। এ সকল শব্দেও যে স্বরবর্ণটী স্বতন্ত্রস্বরিত, তা ছাড়া আর সব স্বরবর্ণই অনুদাত্ত হয়। (১) কিন্তু তিন বা তিনের অধিক স্বরবর্ণ বিশিষ্ট অন্তস্বরিত শব্দের অব্যবহিত পূর্ব্বে অন্তোদাত্ত শব্দ থাকিলে, অথবা তিনের অধিক স্বরবর্ণ বিশিষ্ট যে মধ্যস্বরিত শব্দের স্বতন্ত্রস্বরিতটা তার দ্বিতীয় স্বরবর্ণের পরে থাকে, তার অব্যবহিত পূর্ব্বে অন্তোদাত্ত শব্দ থাকিলে, সে অন্তস্বরিত বা মধ্যস্বরিতের প্রথম স্বরবর্ণটা অনুদাত্ত না হইয়া পূর্ব্বোক্ত নিয়মে পরতন্ত্রস্বরিত হইয়া থাকে। আদিস্বরিত বা অন্য কোনও মধ্যস্বরিত বা অন্তস্বরিতেও তাহা হইবার সম্ভাবনা নাই। অতএব একই শব্দে স্বতন্ত্র ও পরতন্ত্র উভয়বিধ স্বরিত থাকিতে পারে। কিন্তু ঋগ্বেদের কোনও শব্দে, বোধ হয়, একাধিক স্বতন্ত্র বা একাধিক পরতন্ত্র স্বরিত নাই। উদাত্ত ও স্বতন্ত্রস্বরিতও একত্র কোনও শব্দে দেখিতে পাই না।

স্বতন্ত্র ও পরতন্ত্র উভয়বিধ স্বরিতের পরস্থিত অনুদাত্ত বা অনুদাত্তসমূহও উদাত্তের সুরে উচ্চারিত হয়। (১) এরূপ অনুদাত্তের নাম প্রাতিশাখ্যে প্রচয়, পাণিনিতে একশ্রুতি। (২) কিন্তু ঐরূপ অনুদাত্তের পরে অথবা ঐরূপ অনুদাত্ত সমূহের অন্ত্য অনুদাত্তটার পরে উদাত্ত বা স্বতন্ত্রস্বরিত থাকিলে আর সে অনুদাত্ত বা সে অন্ত্য অনুদাত্তটা প্রচয় হয় না, অনুদাত্তই থাকিয়া যায়। অবস্থানবিশেষে স্বতন্ত্রস্বরিতের উচ্চারণেও একটু ব্যতিক্রম ঘটে। পরে উদাত্ত বা স্বতন্ত্রস্বরিত থাকিলে পূর্ব্বস্থিত স্বতন্ত্রস্বরিতের শেষাংশ উদাত্তবৎ উচ্চারিত না হইয়া একপ্রকার কম্পিত সুরে অনুদাত্তবৎ উচ্চারিত হয়। তার নাম, কম্প। (৩) ঋগ্বেদে স্বরসন্নিবেশ এইরূপ।

---

(১) পা. ৬।১।১৫৮।

(১) ঋ. প্রা. ৩।১১।

(২) পা. ১।২।৩৩, ৩৯। মহাভাষ্যমতে একশ্রুতি উদাত্তও নয়, অনুদাত্তও নয়, দুয়ের মাঝামাঝি। স্বর-বিষয়ে বৈদিক ও বৈয়াকরণ সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন অনেক বিরোধ আছে। বৈদিকদিগেরও নানা শাখায় নানা সম্প্রদায়। প্রাতিশাখ্য নামটাই তার প্রমাণ। শৌনকীয় ঋক্প্রাতিশাখ্য বহ্বৃচদিগের শাকল শাখার গ্রন্থ। ঋগ্বেদ আমার আলোচ্য বলিয়া এখানে আমি তারই অনুসরণ করিতেছি।

(৩) ঋ. প্রা. ৩।৩, উবটভাষ্য।

"এষে"র ভাষ্যোক্ত ব্যাখ্যাই আদরণীয় কেন, এখন সে কথাটা বুঝাইতে পারি। মন্ত্রে সে পদ অন্তোদাত্ত। সায়ণের ব্যাখ্যায় তাই হয়। ষকারান্ত এষ্ শব্দ আদ্যুদাত্ত। (১) আবার প্রত্যয় আদ্যুদাত্ত হইলেও (২) প্রথমাদি সকল সুপ্‌বিভক্তিই অনুদাত্ত। (৩) কিন্তু সপ্তমীবহুবচনের বিভক্তি 'সু' পরে থাকিলে যে সকল শব্দে একটীমাত্র স্বরবর্ণ থাকে, তাহাদের পরে তৃতীয়া হইতে সপ্তমী পর্য্যন্ত বিভক্তিগুলি উদাত্ত হয়। (৪) এষ্ শব্দ ঠিক্ এইরূপই শব্দ। তার সপ্তমী বহুবচনের রূপ দেখাইয়াছি—'এট্‌সু'। 'সু'র পূর্ব্ববর্ত্তী শব্দে একটীমাত্র স্বরবর্ণই আছে। তাই এষ্ শব্দের পরে চতুর্থী উদাত্ত, এবং "এষে" এই পদ অন্তোদাত্ত। (১)

কিন্তু BRএর ব্যাখ্যায় তাহা হয় না। ঘঞ্‌নিষ্পন্ন অকারান্ত এষশব্দ আদ্যুদাত্ত। (২) অতএব তার সপ্তমীর একবচন 'এষে'ও তাই। (৩) সংস্কৃতের পাশ্চাত্য ব্যাকরণকারদিগের মধ্যে অনেকেই অবশ্য পাণিনির কৃত্রিম তন্ত্র গ্রহণ করেন নাই। তাঁহারা ঐ প্রত্যয়কে ঘঞ্ না বলিয়া 'অ'ই বলেন। শুধু ঘঞ্ কেন, ঘঞর্থে বিহিত পাণিনির অচ্ ও অপ্ প্রত্যয়কেও ইহারা 'অ'ই বলিয়া থাকেন। হুইট্‌নিও দেখাইয়াছেন, ভাবে এই সকল 'অ'প্রত্যয়নিষ্পন্ন শব্দ অন্তোদাত্ত নহে, আদ্যুদাত্ত। (৪) কিন্তু এ নিয়মের

---

(১) পা. ৬।১।১৬২। ধাতুর অন্ত অর্থাৎ অন্ত্য স্বরবর্ণ উদাত্ত। এষ্ শব্দে প্রত্যয়ের কিছু নাই, সমস্তই ধাতু। তাই শব্দটা অন্তোদাত্ত। কিন্তু একটামাত্র স্বরবর্ণই যখন আছে, তখন শব্দটাকে আদ্যুদাত্তও বলা যায়। একের আদিও সে, অন্তও সে।

(২) পা. ৩।১।৩।

(৩) ঐ, ৩।১।৪। প্রথমার একবচনের বিভক্তি 'স্'এ অবশ্য স্বরপ্রসঙ্গই নাই। কেন না বলিয়াছি, স্বর স্বরবর্ণেরই ধর্ম্ম, ব্যঞ্জনের ধর্ম্ম নহে।

(৪) পা. ৬।১।১৬৮। এটী অতি পুরাতন স্বর, ভারত-ইউরোপীয় মূলভাষা হইতে আসিয়া থাকিবে। কেন না, একস্বরবর্ণবিশিষ্ট গ্রীক্ নামশব্দের রূপেও স্বর-সংস্থান ঠিক্ এইরূপ। সংস্কৃতে আবার কতকগুলি শব্দের পরে ঐ সকল বিভক্তি ছাড়া দ্বিতীয়াবহুবচনের বিভক্তিও উদাত্ত হয়। পা. ৬।১।১৭০-১৭৪। কিন্তু এ দুই নিয়মেরই ব্যভিচার আছে। কতকগুলি পাণিনি নিজেই দেখাইয়া গিয়াছেন, ৬।১।১৮২-১৮৪। আর কতকগুলি বেন্‌ফাই (s 760) এবং হুইট্‌নি (*Sanskrit Grammar*, 4th Edition, ss. 361, 371, 372, 390) বেদ হইতে দেখাইয়াছেন। সূত্র-বার্ত্তিকে অবিহিত এই সকল ব্যভিচারের জন্যই মহা-ভাষ্যকার বেদে অনেকবিধ ব্যত্যয়ের মধ্যে স্বরব্যত্যয়ও স্বীকার করিয়াছেন। পা. ৩।১।৮৫, ভাষ্য।

(১) যেখানে প্রকৃতি প্রত্যয় উভয়তেই উদাত্ত বা স্বতন্ত্রস্বরিত থাকে, সেখানে প্রকৃতিস্বরটা যায়, প্রত্যয়স্বরই পদ বা প্রাতিপদিকের স্বর হয়। "সিদ্ধং তু প্রকৃতিস্বরবলীয়স্ত্বাৎ প্রত্যয়স্বরভাবঃ।" পা. ৬।১।১৫৮, বার্ত্তিক। তাই "এষে" মধ্যোদাত্তও নয়, আদ্যুদাত্তও নয়, অন্তোদাত্ত।

(২) পা. ৬।১।১৯৭। যে প্রত্যয়ের 'ঞ্' বা 'ন্' ইৎ, তদন্ত শব্দ আদ্যুদাত্ত হয়। পাণিনীয়েরা ইহাকে ঞিৎস্বর বা নিৎস্বর বলেন।

(৩) এষশব্দের একারটা উদাত্ত, অতএব পূর্ব্বোক্ত নিয়মে অন্ত্য অকারটা পরতন্ত্রস্বরিত। সপ্তমীর ইকারটা সুপ্ বলিয়া অনুদাত্ত। সন্ধিতে স্বরিতের সহিত অনুদাত্ত মিলিয়া স্বরিত হয়। ঋ. প্রা. ৩।৬ ; পা. ১।১।৫০। তাই 'এষে'র অন্ত্য একারটাও পরতন্ত্র-স্বরিত, এবং পদটা আদ্যুদাত্ত।

(৪) *Sanskrit Grammar*, s. 1148. পরেও হুইট্‌নির প্রসঙ্গে সর্ব্বত্র এই গ্রন্থ হইতেই প্রমাণ লইয়াছি। কথিত নিয়মের বহু ব্যভিচার আছে স্বীকার করিয়া তিনি তার দৃষ্টান্ত দিয়াছেন—শম, শব, স্মর। তিনই অন্তোদাত্ত, এবং তিনই নাকি ভাবনিষ্পন্ন। হুইট্‌নির পূর্ব্বে কৌষীতকিব্রাহ্মণের আদিপ্রকাশক লিণ্ড্‌নের ও তাঁহার বৈদিককৃত্তদ্ধিতবিষয়ক গ্রন্থে

ব্যভিচার আছে। বিশ্বরূপা স্বৈরিণীকে এক শৃঙ্খলে বাঁধিবে কিরূপে? নানাকে এক করিতে গিয়া হুইট্‌নিও তাহা লক্ষ্য করিয়াছিলেন। পাণিনিকে বর্‌ ত্তরুক্‌ করিবার প্রয়াস কোথাও বড় সফল হইতে দেখি নাই। এখানেও তাই। স্বরাদিবিষয়ে পদে পদে ব্যভিচার আছে বলিয়াই পাণিনি এই সকল আচার্য্যের মত ভাববিহিত সকল 'অ'কে একই নামে নির্দ্দেশ না করিয়া একটার অচ্‌, একটার অপ্‌, এবং আর একটার ঘঞ্‌, এই কৃত্রিম নাম দিয়াছিলেন। তাঁহাতে যে ব্যভিচার উঠিয়া গিয়াছে, এমত নহে। কিন্তু স্বরব্যবস্থা পরিষ্কার হইয়াছে। ভাব ও কর্ত্তৃভিন্ন কারক বুঝাইতে ইবর্ণান্ত ধাতুর পরে অচ্‌ (১), উবর্ণান্ত ও ঋবর্ণান্ত ধাতুর পরে অপ্‌ (২), এবং অন্য সকল ধাতুর পরে ঘঞ্‌ (৩) হয়। অনুবন্ধগুলি ফেলিয়া দিলে তিনেরই এক 'অ' অবশিষ্ট থাকে বটে। কিন্তু ঐ সকল অনুবন্ধের সঙ্কেতেই স্বরে এই ভেদ হয় যে, অজন্ত শব্দ চিৎস্বরে অন্তোদাত্ত (৪), অবন্ত শব্দে ধাতুর অন্ত উদাত্ত ও প্রত্যয়ের অকার পিৎ বলিয়া অনুদাত্ত (১), এবং ঘঞন্ত শব্দ ঞিৎস্বরে আদ্যুদাত্ত (২) হয়। ঘঞন্ত শব্দ আদ্যুদাত্ত, এ নিয়মেরও ব্যভিচার আছে। এক ব্যভিচার পাণিনির ৬।১।১৫৯ সূত্রের বিষয়। আর এক ব্যভিচার ৬।১।২১৬ সূত্রের। এ দুই সূত্র এষশব্দে প্রযোজ্য নহে। আর এক ব্যভিচার এই—

উঞ্ছাদীনাং চ।

পা. ৬।১।১৬০।

উঞ্ছ প্রভৃতি শব্দের অন্ত উদাত্ত হয়। কিন্তু পাণিনীয় গণপাঠে উঞ্ছাদিগণে এষশব্দ পঠিত হয় না। গণপাঠে ঐ গণ আকৃতিগণ (৩) বলিয়াও নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। মহাভাষ্যে বা কৈয়টে এই উঞ্ছাদিসূত্রের ব্যাখ্যা নাই। কিন্তু কৈয়ট হইতেও প্রাচীন যে কাশিকাবৃত্তি, তাহাতে সব গণেরই বিবরণ এবং তন্মধ্যে যেটী যেটী আকৃতিগণ তাহারও উল্লেখ আছে। তাহাতেও বৃত্তিকার উঞ্ছাদিকে আকৃতিগণ বলেন নাই। কাশিকার টীকা পদমঞ্জরীতে হরদত্তও ঐ গণের সেরূপ ব্যাখ্যা করেন নাই। সিদ্ধান্তকৌমুদীতেও ভট্টোজিদীক্ষিত এই উঞ্ছাদিরই পাল্‌টে গণ বৃষাদিকে (৪) আকৃতিগণ বলিয়াছেন, কিন্তু ইহাকে বলেন নাই। তবে অন্যত্র দীক্ষিতের এক উক্তি প্রণিধানযোগ্য বটে। বৃষাদিসূত্রে (৪) সিদ্ধান্তকৌমুদীর স্বকৃত ব্যাখ্যা প্রৌঢ়মনোরমায় তিনি বলিয়াছেন—

(Lindner, *Altindische Nominalbildung*, p. 31) শব্দ তিনটার উল্লেখ করিয়াছেন। স্মরশব্দও যে ভাবনিষ্পন্ন, এ ব্যুৎপত্তি ইঁহারা B.R.এ পাইয়াছিলেন।

(১) পা. ৩।৩।৫৬। লিণ্ড্‌নের্‌ ও হুইট্‌নির উদাহৃত 'জয়' এই সূত্রানুসারেই অজন্ত। 'জব'ও এই সূত্রেরই এক বার্ত্তিকবলে তাই। যথাক্রমে জি ও জু ধাতুর পরে অচ্‌।

(২) পা. ৩।৩.৫৭। ভাববাচী হইলে 'স্মর'ও এই সূত্রানুসারে, স্মৃধাতুর পরে অপ্‌ করিয়া নিষ্পন্ন।

(৩) পা. ৩।৩।১৮,১৯।

(৪) ঐ, ৬।১।১৬৩। যে প্রত্যয়ের চকার ইৎ, সেই প্রত্যয়ই চিৎ। অচ্‌ও তাই। সেইরূপ অপ্‌ পিৎ এবং ঘঞ্‌ ঞিৎ। চিৎপ্রত্যয়ান্ত শব্দ অন্তোদাত্ত হয়। পাণিনীয়েরা ইহাকে চিৎস্বর বলেন। অতএব 'জয়' ও 'জব' চিৎস্বরে অন্তোদাত্ত।

(১) পা. ৬।১।১৬২, ৩।১।৪। অতএব ভাববাচী 'স্মর'ও আদ্যুদাত্ত হওয়া উচিত।

(২) পা. ৬।১।১৯৭।

(৩) যে গণে পঠিত শব্দ ছাড়া যথাপ্রয়োগ তৎসদৃশ অন্য শব্দও অন্তর্ভূত হইতে পারে, তার নাম আকৃতিগণ।

(৪) পা. ৬।১।২০৩। বৃষাদি আদ্যুদাত্ত।

এবং চাষিচিত্রলক্ষণস্থাদ্যুদাত্তস্থ বৃষাদিত্বং গ্রামাদিত্বং বা বোধ্যম্। অন্তোদাত্তস্থ উঞ্ছাদিত্বং ঘৃতাদিত্বং চেতি দিক্। ইহার অর্থ এই। যে সকল আদ্যুদাত্ত শব্দের আদ্যুদাত্ত হইবার জন্য কোনও বিধি নাই, সে সকল শব্দ পাণিনির বৃষাদি বা ফিট্‌সূত্রোক্ত গ্রামাদি (১) গণের, এবং যে সকল অন্তোদাত্ত শব্দের অন্তোদাত্ত হইবার জন্য কোনও বিধি নাই, সে সকল শব্দ পাণিনির উঞ্ছাদি বা ফিট্‌সূত্রোক্ত ঘৃতাদি (২) গণের অন্তর্ভূত ধরিয়া লইতে হইবে। ইহাতে উঞ্ছাদিকেও আকৃতিগণ বলা হইতেছে, সন্দেহ নাই। কিন্তু কথাটা বুঝিতে যেন ভুল না হয়। কোনও শব্দে ঐরূপ ব্যবস্থা করিতে হইলে আদৌ স্থির হওয়া চাই যে, সে শব্দ আদ্যুদাত্ত বা অন্তোদাত্ত। তা স্থির হইলে পরে যদি জিজ্ঞাস্য হয়, কেন সে শব্দ আদ্যুদাত্ত বা অন্তোদাত্ত (৩), তখন তারই উত্তরে আর কোনও শাস্ত্র না পাইলে পাণিনীয়েরা ঐ ব্যবস্থার আশ্রয় লইতে পারেন। (৪) কিন্তু এখানে "এষে" এই পদে যে অন্তোদাত্ত এষশব্দ আছে, তাহারই নিশ্চয় নাই। এখানেও যদি এমন হইত যে, ঐ পদ ঐ শব্দেরই রূপ, আর কিছুর রূপ হওয়া সম্ভবপর নয়, তবে ঐ মনোরমার বলে শব্দটাকেও উঞ্ছাদি বা ঘৃতাদি গণে পূরিতে পারিতে। কিন্তু "এষে" যে ঐ অকারান্ত এষশব্দ ছাড়া আর কিছুর রূপ হইতে পারে না, এমত নহে। পাঠক বেদভাষ্য স্মরণ করিবেন। সে ভাষ্যও অসঙ্গত বা অপ্রামাণিক নয়। পক্ষান্তরে, অসন্দিগ্ধ প্রয়োগ না পাইলে ঘঞন্ত শব্দের প্রসিদ্ধ স্বরনিয়মের ব্যভিচার স্বীকার করা অনুচিত। (১)

---

(১) ফিট্‌সূত্র, ৩৮। গ্রামাদিও আদ্যুদাত্ত।

(২) ফি. সূ., ২১। ঘৃতাদি অন্তোদাত্ত।

(৩) বলা বাহুল্য, এ 'কেন'র বস্তুতঃ কোনও উত্তর নাই। আদ্যুদাত্ত বা অন্তোদাত্ত উচ্চারিত হইত বলিয়াই আদ্যুদাত্ত বা অন্তোদাত্ত।

(৪) B.R.এর অনুসারে লিস্তনের ও হুইট্‌নির উদাহৃত 'স্মর'ও যদি ভাবনিষ্পন্ন অথচ অন্তোদাত্তই হয়, তবে তাহাও অগত্যা এইরূপে উঞ্ছাদির অন্তর্ভুক্ত বুঝিতে হইবে। স্মরশব্দ ঋগ্বেদে নাই, অথর্ব্ববেদে আছে। অ. বে. ৬।১৩০।১-৩, ৬।১৩২।১, B.R. ভাষ্যকারের মতে সেখানে উহার অর্থ, কন্দর্প। ঐ ৬।১৩০।১ ও ৩ মন্ত্র দেখিয়া আমার বোধ হয়, কন্দর্পবাচী স্মরশব্দ কর্ত্তৃরি-বাচোই নিষ্পন্ন। স্মরতীতি স্মরঃ। পচাদ্যচ্। পা. ৩।১।১৩৪। চিৎস্বরে অন্তোদাত্ত। ভাববাচী স্মরশব্দ ছান্দোগ্যোপনিষদে (৭।১৩।১) আছে। কিন্তু ছান্দোগ্যে ত্রৈস্বর্য্য নাই। অতএব সেখানে উহা আদ্যুদাত্ত না অন্তোদাত্ত, তাও নির্ণয় করিবার উপায় নাই।

(১) গ্রাস্মানের মতে, ইষধাতুৎপন্ন ভাববাচী অথচ অন্তোদাত্ত অকারান্ত এষশব্দ আরও দুই ঋকে আছে। যথা—

প্র বো মৈ বন্ধ্বেষে।

৫।৫২।১৬।

শ্রবস্যেষ ঋষীণাম্।

৫।৬৬।৪।

এ মতটার জন্য B.R. দায়ী নহেন। "বন্ধ্বেষে" ও "শ্রবএষে" যথাক্রমে অকারান্ত 'বন্ধ্বেষ' ও 'শ্রবএষ' শব্দের সপ্তমীর একবচন। শব্দ পদ, দুইই অন্তোদাত্ত বটে। ইউরোপীয় মুনিরও মতিভ্রম হয়। এখানে শুধু 'এষ' নাই, 'বন্ধ্বেষ' ও 'শ্রবএষ'ই আছে। এষ-শব্দের অর্থ এখানে ইচ্ছা বা অন্বেষণ। 'বন্ধু' ও 'শ্রবস্' শব্দের সহিত 'এষ' শব্দের সমাসে যথাক্রমে 'বন্ধ্বেষ' ও 'শ্রবএষ'। ষষ্ঠীতৎপুরুষ সমাস। কর্ম্মে ষষ্ঠী বা শেষে ষষ্ঠী। প্রথম পক্ষেও শব্দ দুইটা অন্তোদাত্ত। পা. ৬।২।১৪৪। দ্বিতীয় পক্ষেও [illegible] ৬।১। ২৩। এ যে সমাসের স্বর, [illegible] আদ্যুদাত্ত হউক আর অন্তোদাত্ত হউক, সমাসে 'বন্ধ্বেষ' ও 'শ্রবএষ' অন্তোদাত্তই হইবে। অতএব এ দুই শব্দ অন্তোদাত্ত 'এষ'র প্রমাণ হইতে পারে না। [illegible]

অতএব মনোরমার বচনেও BR.এর ব্যাখ্যা সমর্থিত হয় না। কিন্তু ঐ ব্যাখ্যায় সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান আপত্তি এই যে, B.R. ও গ্রাস্মানেরই মতে নিম্নোদ্ধৃত পাঁচ ঋকেও ভাবনিষ্পন্ন ইষধাতূৎপন্ন অকারান্ত এষশব্দ সপ্তমীর একবচনে প্রযুক্ত আছে—

প্র বো রয়িং যুক্তাশ্বং ভরধ্বং
রায় এষেঽবসে দধীত ধীঃ।
৫।৪১।৫।

বনস্পতীরোষধী রায় এষে।
৫।৪১।৮।

গব্যামেষে।
১০।৪৮।৯।

এষে রথানাম্।
৫।৩৩।৩, ৫।৮৬।৪।

অথচ ইহার সর্ব্বত্রই ঐ শব্দ আদ্যুদাত্ত। আপত্তিটা BR.ও অনুভব করিয়াছিলেন। একই শব্দ, একই পদ। প্রথম তিনটা ঋক্ ধরিলে আবার ইহাদের মতে প্রায় একই অর্থ। তবে প্রকৃত ঋকেই বা ঐ শব্দ অন্তোদাত্ত হইবে কেন? BR.এর ব্যাখ্যা অশ্রদ্ধেয়। (১)

উদ্ধৃত ঋক্‌গুলির মধ্যে ঐ "গব্যামেষে"র ভাষ্যে পরে আমার বড় প্রয়োজন আছে। তার পূর্ব্বোদ্ধৃত দুই ঋকে "রায় এষে"র ব্যাখ্যায় সায়ণ একবার লিখিয়াছেন—

রায়ো ধনানি গবাশ্বাদিলক্ষণান্যেষে প্রাপ্তুম্।

আর একবারে তাঁরই অনুবাদ—

রায় এষে ধনানি প্রাপ্তুম্।

এ ভাষ্য একটু কষ্টকল্পিত হইলেও অসম্ভব নয়। দুই মন্ত্রেই "রায়ঃ" অন্তোদাত্ত। রৈশব্দ ষষ্ঠীর একবচনেও 'রায়ঃ', দ্বিতীয়ার বহুবচনেও 'রায়ঃ'। উভয়ত্র তাহা অন্তোদাত্ত। (১) পাশ্চাত্ত্যেরা ইহার প্রথম পক্ষ, ভাষ্যকার ইহার দ্বিতীয় পক্ষ গ্রহণ করিয়াছেন। ভাষ্যকারের মতে "রায়ঃ" দ্বিতীয়ান্ত কর্ম্মপদ, "এষে"র কর্ম্ম। 'এষে' ও গত্যর্থক অতএব প্রাপ্ত্যর্থক ইধাতুর পরে তুমর্থে বৈদিক সেন্‌প্রত্যয় (২) করিয়া নিষ্পন্ন। তাহাতে নিৎস্বরে ঐ পদ আদ্যুদাত্ত। (৩) সব দিক্ বজায় রহিল। "গব্যামেষে"র স্থলেও যদি সায়ণ ঐরূপ একটা দ্বিতীয়ান্ত পদ

ঋগ্বেদটীকায় অলদেনবের্ক ও তাহা স্বীকার করিয়াছেন —Oldenberg, *Ṛgveda*, Textkritische und exegetische Noten (Berlin, 1909-1912), I.180.4. অমূল্যবাবুর ধৃত বক্ষ্যমাণ শতপথশ্রুতির 'ঈষে' শব্দও এই সমাস্বরেই অন্তোদাত্ত। তাই BR. আদ্যুদাত্ত এষশব্দের প্রকরণেই সে শব্দটারও ব্যাখ্যা দিয়াছেন। কিন্তু 'ঈষে'র কথা পরে বলিতেছি।

(১) স্বরবাত্যয় হয় বলিয়া অলদেনবের্ক ও এ ব্যাখ্যায় সন্দিহান। ১।১৮০।৪ ঋকের টীকা। তিনিও "এষে"কে সপ্তম্যন্ত এবং অকারান্ত এষশব্দেরই রূপ বলিতে চান। তবে তাঁর মতে ঐ শব্দ ইচ্ছার্থক ইষধাতু হইতে না হইয়া আঙ্‌পূর্ব্বক গত্যর্থক ঈষধাতু হইতে ভাবঘঞ্‌যোগে নিষ্পন্ন হওয়াই সম্ভব। তাহাতে শব্দটা অন্তোদাত্ত হয় বটে। পা. ৬।২।১৪৪। কিন্তু এ ব্যুৎপত্তি পদপাঠবিরুদ্ধ। বলিয়াছি, পদপাঠেও "এষে"ই আছে—'আঽইষে'ও নাই, 'আঽঈষে'ও নাই। তা ছাড়া, ঐ ব্যুৎপত্তি ধরিয়া তিনি যে দুই ব্যাখ্যার প্রস্তাব করিয়াছেন, BR.এর ব্যাখ্যাবৎ সে দুই ব্যাখ্যাতেও অন্বয়ক্লেশ থাকিয়া যায়। ভাববাচ্য ধরিলেই তাহা থাকিবে। পদপাঠই যদি লঙ্ঘন করি, তবে আঙ্‌পূর্ব্বক ঈষধাতুর পরে কর্ত্তরি বাচ্যে ক্বিপ্‌প্রত্যয়-যোগে ষকারান্ত এষ্‌শব্দ মানিলেই তো হয়। তারও চতুর্থীর একবচন 'এষে', 'অত্রয়'র বিশেষণ। এ ব্যাখ্যায় যেমন স্বর বাহাল থাকে, তেমনই অন্বয়ও সহজ হয়। ঋগ্বেদে 'আ-ঈষ'র এক অর্থ—উপাগত হওয়া, শরণাগত হওয়া, প্রার্থনা করা। ঋ. ১।১৮৬।৪, ৫।৪১।৭, ৫।৪৯।১। এখানে সেই অর্থই গ্রহণীয়। আর যে একটা অর্থ অলদেনবের্ক দেখাইয়াছেন, তার যথেষ্ট প্রমাণ নাই।

(১) পা. ৬।১।১৭১।

(২) ঐ, ৩।৪।৯।

(৩) ঐ, ৬।১।১৯৭।

খাড়া করিতে পারিতেন, তবে আর কোনও গোল ছিল না। কিন্তু 'গবাম্' দ্বিতীয়ান্ত নয়, ষষ্ঠ্যন্ত। 'এষে'ও এ ব্যাখ্যায় একারান্ত-কৃৎপ্রত্যয়নিষ্পন্ন বলিয়া অব্যয়। (১) তার যোগে কর্ম্মে ষষ্ঠী হয় না। (২) অতএব অন্য ব্যাখ্যা চাই। সায়ণ প্রথম বলিলেন—

গবামেষেঽন্বেষণায়।

'অন্বেষণায়' এই চতুর্থ্যন্ত প্রতিশব্দ দেখিয়া বুঝি, এখানে তিনি 'এষে'কে চতুর্থ্যন্তই ধরিতেছেন। সেই বিচ্‌প্রত্যয়নিষ্পন্ন ষকারান্ত এষ্‌ শব্দ, চতুর্থীর একবচনে সেই 'এষে'। প্রভেদ এইমাত্র যে, এখানে ভাবে বিচ্‌। কিন্তু তাহাতে স্বরে ভেদ হয় না। পাঠক দেখিয়াছেন, এ ব্যুৎপত্তিতে 'এষে' অন্তোদাত্ত হইয়া পড়ে। অথচ এখানে মন্ত্রে তাহা আদ্যুদাত্ত। কথাটা মনে পড়িতেই যেন ভাষ্যকার আবার লিখিয়াছেন—

যদ্বা গবামেষ এষণে।

'এষে এষণে' সন্ধিতে 'এষ এষণে'। এ ব্যাখ্যায় আর আপত্তি নাই। এখানে প্রতিশব্দ 'এষণে' সপ্তম্যন্ত, অতএব 'এষে'ও তাই। ভাবঘঞ্‌নিষ্পন্ন অকারান্ত এষশব্দ, সপ্তমীর একবচনে 'এষে'। সে শব্দ, সে পদ আদ্যুদাত্ত বটে।

এক প্রশ্ন হইতে পারে। ঐ প্রথম ব্যাখ্যা যদি সায়ণ ভ্রান্তই বুঝিয়াছিলেন, ভাষ্যে তবে সেটাও রাখিলেন কেন? তাও ভ্রমেই হইয়াছে। অথবা ইহার কারণ এই হইতে পারে যে, ব্যাকরণের সকল বিধিই বেদে বিকল্পে হয়, পাণিনীয় তন্ত্রে এইরূপ এক পরিভাষা আছে। (৩) পাণিনির সূত্র বা কাত্যায়নের বার্ত্তিকে ইহার উল্লেখ নাই। এ পরিভাষা মহাভাষ্যকারের সৃষ্টি। (১) কেন ইহা করিতে হইয়াছিল, পূর্ব্বে এক ফুট্‌নোটে তার ইঙ্গিত করিয়াছি। এই পরিভাষাই হয়ত সায়ণের মনে ছিল। বলা বাহুল্য, ইহাতে ঐ চতুর্থ্যন্ত 'এষে'রও আদ্যুদাত্ত হইতে বাধা হয় না। কিন্তু BRএর সমালোচনাপ্রসঙ্গে, মনোরমার ব্যাখ্যায় যাহা বলিয়া আসিলাম, এখানেও সেই কথা। সাধারণ স্বরেই যদি ঐ পদের সমীচীন ব্যুৎপত্তি হয়, তবে ঐ পরিভাষার দোহাই দিয়া একটা অসাধারণ স্বর স্বীকার করা অন্যায়। কেন না, একস্বরবর্ণবিশিষ্ট শব্দের রূপে যে স্বরনিয়ম দেখাইয়াছি, তাহা যেমন অনাদি, তেমনই সুপ্রতিষ্ঠিত। যে কয়েকটা স্থলে পাণিনি বা পাশ্চাত্ত্যেরা তার ব্যভিচার লক্ষ্য করিয়াছেন, সেখানে সে সকল শব্দ একস্বরবর্ণবিশিষ্ট ছাড়া আর কিছু হওয়া সম্ভবপর নহে। অন্য ব্যুৎপত্তি নাই, তাই অগত্যা ব্যভিচার মানিতে হইয়াছে। কিন্তু এখানে 'এষে'র অন্য উৎকৃষ্ট ব্যুৎপত্তি আছে। তাহাতে ঘঞন্ত শব্দের সাধারণ স্বরই বজায় থাকে, ব্যভিচার মানিতে হয় না। অতএব এ অবস্থায় 'এষে'কে একস্বরবর্ণবিশিষ্ট শব্দের রূপ ধরিয়া তাহাতে স্বরব্যত্যয় স্বীকার করা অন্যায়। প্রাচীনেরা বলিতেন কল্পনাগৌরব, আমি অন্যায় বলিলাম। সায়ণেরও যে এই মত, তাহাতে সন্দেহ নাই। নহিলে তিনি ঐ প্রথম ব্যাখ্যা প্রত্যাখ্যান করিবেন কেন? সংস্কৃতগ্রন্থকারদের এ একটা চিরন্তন প্রথা যে, যেখানে তাঁহারা একাধিক মত বিন্যস্ত করেন, সেখানে প্রায় শেষটারই তাঁহারা পক্ষপাতী। পরে পাঠক দেখিতে পাইবেন,

(১) ঐ, ১।১।৩৯।

(২) পাণিনি, ২।৩।৬৯।

(৩) পরিভাষাপাঠ, পরিভাষা ৩৬ ; পরিভাষেন্দুশেখর, প. ৩৫।

(১) পাণিনি ১।৪।৯ ও ৩।১।৮৫ সূত্রের ভাষ্য।

সায়ণের আত্মবিস্মৃতি সর্ব্বত্র এমন ক্ষণস্থায়িনী নয়।

আমি স্বীকার করিতে বাধ্য যে, যে প্রসঙ্গে আমি এখন নিযুক্ত, তাহাতে এই স্বরবিচারের কোনও প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু এ বিচার পরে আমাকে করিতেই হইত। তাই অবকাশ পাইয়া এখানেই তাহা করিয়া রাখিলাম। প্রকৃত বিষয়ের উপসংহার করি। আশ্বিনী ঋকে অমূল্য বাবুর ঈপ্সিত এষ বা এষা শব্দ নাই। দেশী মতেও না, বিলাতী মতেও না। B.Rএর ব্যাখ্যায় অন্বয় কিছু ক্লিষ্ট হয় মাত্র। কিন্তু অমূল্য বাবুর ব্যাখ্যা মানিলে ঐ ঋকে এষশব্দ অনন্বিতই থাকিয়া যায়!

অমূল্য বাবুর দ্বিতীয় প্রমাণ এই—

স্তোমো বো অদ্য মরুত এষয়া্যো- (২)
বিষ্ণোরেষস্য প্রভৃথে হবামহে।

ঋ. ২।৩৪।১১।

এটাও অর্দ্ধর্চ্চ। ঋকের দেবতা, মরুদ্গণ। অতএব ঋক্‌টাকে মারুতী বলা যায়। ঋগ্বেদে ইহার অনুরূপ আর দুইটী মন্ত্র আছে, অমূল্য বাবু তাহা ধরেন নাই। সে দুই মন্ত্র এই—

অস্য দেবস্য মীল্‌হুষো বয়া
বিষ্ণোরেষস্য প্রভৃথে হবির্ভিঃ।

৭।৪০।।

বিষ্ণোরেষস্য মীলহুষাম্।

৮।২০।৩

এ ঋক্‌গুলির অনুবাদ নিষ্প্রয়োজন। তিন মন্ত্রেই অকারান্ত এষশব্দ, বিষ্ণুর বিশেষণ: বেদভাষ্যমতে ইহার সর্ব্বত্র ঐ শব্দের অর্থ— এষণীয়, প্রার্থনীয়, প্রাপনীয়। অতএব এ মতে ঐ শব্দ ইচ্ছার্থক ইষধাতুর পরে কর্ম্মণি বাচ্যে ঘঞ্‌প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন। (১) যাঁহাকে ইচ্ছা করা হয়, তিনি এষ। B.Rএর মতে শব্দটার অর্থ—গন্তা, গতিশীল। গত্যর্থক এষধাতুর (১) পরে কর্ত্তরি বাচ্যে 'অ' প্রত্যয় (২)—পাণিনির অচ্, যাহাকে পচাদ্যচ্ (৩) বলি। যিনি গমন করেন, তিনি এষ। এখানেও গ্রাস্মান্ B.Rএর অনুবর্ত্তী। লিণ্ডনেরও তাই বলিয়া বোধ হয়। (৪) হুইট্‌নিও তাই। (৫) মোক্ষমূলরও তাই। (৬) অল্‌দেন্‌বের্ক্‌ও তাই। (৭)

অতএব এ তিন ঋকে সায়ণ অমূল্য বাবুর সমর্থন করিতেছেন। কিন্তু যে কারণে আশ্বিনী ঋকে B.Rএর ব্যাখ্যা অশ্রদ্ধেয় বলিয়াছিলাম, এখানেও ঠিক সেই কারণে

(১) পাণিনি, ৩।৩।১৯।

(১) এষৃ প্রেষৃ গতৌ। ভ্বাদি, আত্মনেপদী। পাশ্চাত্যদের মতে, বেদে ইহা পরস্মৈপদী। কিন্তু আমাদের আচার্য্যেরা বেদের সে সকল স্থলে পরস্মৈপদী এষধাতু স্বীকার না করিয়া আঙ্‌পূর্ব্বক ঈষধাতুর রূপ ধরেন। যথা, "রক্ষ এষৎ"। ঋ. ১০, ৮৯, ১৪। পদপাঠ—আঃঈষৎ। ঈষধাতুরও এক অর্থ, গতি। ভ্বাদি, পরস্মৈপদী। কিন্তু ঋগ্বেদে প্রায় সর্ব্বত্রই আত্মনেপদী। উদ্ধৃত তিন মন্ত্রের পদপাঠে 'এষস্য'ই আছে, 'আঃঈষস্য' নাই। অতএব তদনুরোধে B.R. এর মত এষধাতু হইতেই এষশব্দের ব্যুৎপত্তি করা ভাল। নহিলে আঙ্‌পূর্ব্বক ঈষধাতুর পরে কর্ত্তরি বাচ্যে কপ্রত্যয় করিয়াও ঐ শব্দ সিদ্ধ হইতে পারে। পাণিনি, ৩।১।১৩৫। তাও অন্তোদাত্ত। ঐ, ৬।২।১৪৪। ঋগ্বেদে এষধাতুর অন্য প্রয়োগ নাই দেখিয়া অল্‌দেন্‌বের্ক্ এই ব্যুৎপত্তিরই পক্ষপাতী।

(২) Whitney, s. 1148, 1b, c.

(৩) পাণিনি, ৩। ১৩৪। পচাদি আকৃতিগণ।

(৪) P. 29.

(৫) s. 1148, 1c.

(৬) *Vedic Hymns*, Part I (Sacred Books of the East, Vol. XXXII), P. 306, Note to RV. II, 34, 11.

(৭) ১।১৮০।৪ ঋকের টীকা। ব্যুৎপত্তিবিষয়ে যে একটু মতভেদ আছে, তাহা দেখাইয়াছি।

সায়ণের ব্যাখ্যা অশ্রদ্ধেয়। উদ্ধৃত তিন মন্ত্রেই এষশব্দ অন্তোদাত্ত। কিন্তু ঘঞন্ত এষশব্দ অন্তোদাত্ত নয়, আদ্যুদাত্ত। কথাটা "গবামেষে"র ভাষ্যকারের ভুলিয়া যাওয়া উচিত হয় নাই। অথচ এখানেও সায়ণকে ঘঞই বলিতে হইবে, কেন না, ঐ শব্দে ঐ অর্থে ইষধাতুর পরে ঘঞ্ ছাড়া আর কোনও প্রত্যয় হইতে পারে না। উঞ্ছাদি বা ঘৃতাদির আশ্রয়ও অসম্ভব। কেন না এখানে এষশব্দের আর এক ব্যুৎপত্তি আছে, যাহাতে ঋগর্থ সমঞ্জস হয়, অথচ সাধারণ স্বরবিধি অব্যাহত থাকে, ব্যভিচার মানিতে হয় না। বিকল্পপরিভাষাও সেই কারণেই অপ্রযোজ্য। সকল কথা খুলিয়া বলিয়াছি, এখানে আর আবৃত্তি করিব না। ইহারই জন্য আমি পাঠককে বিরক্ত করিয়া ঐ দীর্ঘ স্বরবিচারের অবতারণা করিয়াছিলাম।

আর যে ব্যুৎপত্তি আছে বলিলাম, তাও দেখাইয়াছি। BRএর ব্যুৎপত্তিতে এষশব্দ অন্তোদাত্তই হয়। হুইট্‌নি দেখাইয়াছেন, কর্ত্তরি বাচ্যে 'অ'প্রত্যয়নিষ্পন্ন শব্দসমূহ অন্তোদাত্ত। (১) পাণিনিমতেও পচাদ্য-জন্ত এষশব্দ চিৎস্বরে অন্তোদাত্ত বটে। অর্থাংশেও BRএর ব্যাখ্যা উপাদেয়। বিষ্ণুর গতিশীলতা বেদে প্রসিদ্ধ। ঋগ্বেদের কোথাও তিনি 'উরুক্রম' (১), কোথাও 'উরুগায়' (২), কোথাও বা 'এবয়া' (৩), কোথাও 'এবযাবন্' (৪)। এ সকল বিশেষণের অর্থই গতিশীল। "ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে", সে বৈষ্ণবী ঋক্ (৫) অনেক ব্রাহ্মণেরই কণ্ঠস্থ। বিষ্ণুর এ বিক্রমণশ্রুতি আরও অনেক ঋকে আছে। (৬) তারও অর্থ, গতি। এখানেই

(১) s. 1148, 1c, d. এ নিয়মেরও অবশ্য ব্যভিচার আছে। হুইট্‌নি তার দৃষ্টান্ত দিয়াছেন—শ্রব, মোঘ; স্তব। তিনই নাকি কর্ত্তৃবাচক, অথচ আদ্যুদাত্ত। লিণ্ড্‌নের এ তিনটা ছাড়া আরও কয়েকটা দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। কিন্তু হুইট্‌নির প্রদর্শিত ব্যভিচারত্রয় বস্তুতঃ ঋগ্বেদে নাই। অকারান্ত শ্রবশব্দই সে বেদে নাই, যজুর্ব্বেদে আছে। বা. সংহি. ১৬।৩৪; ১৮।১। সেখানেও তাহা অন্তোদাত্ত। ঋ. ১০।১৬০।১—বা. সংহি. ১২।১০৬ মন্ত্রে যে 'শ্রবঃ' আছে, তাহা উণাদির অসুন্‌প্রত্যয়নিষ্পন্ন সকারান্ত শ্রবস্‌শব্দের রূপ। সে শব্দ নিৎস্বরে আদ্যুদাত্ত। প্রাতিশাখ্যে তার স্বরসিদ্ধির জন্য এক পৃথক্ সূত্রও আছে। বাজসনেয়িপ্রা. ২।৩৩। মোঘশব্দ ঋগ্বেদে পাঁচ বার পাওয়া যায়। চারি বারেই (৭।১০৪।৮, ১৫; ১০।৫৫।৬; ১০।১১৭।৬) তাহা আদ্যুদাত্ত বটে, কিন্তু সে চারি বারে তাহা কর্ত্তৃবাচী নয়। সে সকল স্থলে শব্দটার অর্থ—নিরর্থক, মিথ্যা। সে অর্থে অমরটীকায় ভানুজি-দীক্ষিত মোঘশব্দকে অধিকরণঘঞন্তনিষ্পন্ন বলিয়াছেন। মুহ্যন্ত্যস্মিন্নিতি মোঘম্। ঘঞন্ত বলিয়াই আদ্যুদাত্ত, ব্যভিচার নাই। যে একটা ঋকে মোঘশব্দ অন্তোদাত্ত আছে (১০।৬৫।১), সেখানে আমার বোধ হয় তাহা কর্ত্তৃবাচীও বটে। মোহয়তীতি মোঘম্; মোহিত: মূর্চ্ছিত, স্তম্ভিত করে—তাই মোঘ। ণিজন্ত মুহধাতুর পরে পচাদ্যচ্। স্তবশব্দও ঋগ্বেদে একবারমাত্রই (৯।৯৫।২) আছে। কিন্তু সেখানে তাহা কর্ত্তৃবাচী নয়, ভাববাচী। অতএব পাণিনির অপ্ প্রত্যয়ান্ত, অতএব আদ্যুদাত্ত, ব্যভিচার নাই। বলিয়াছি, পাণিনিমতে অবিহিত-লক্ষণ সকল আদ্যুদাত্ত শব্দই বৃষাদির অন্তর্গত বুঝিতে হইবে।

(১) ১।৯০।৯, ১।১৫৪।৫, ৩।৫৪।১৪, ৫।৮৭।৪, ৭।৯৯।৬, ৮।৭৭।১০।

(২) ১।১৫৪।১,৩,৬; ২।১।৩, ৪।৩।৭, ৭।১০০।১, ৮।২৯।৭। সায়ণ উরুগায়শব্দের অনেক ব্যাখ্যা দিয়াছেন। গতিশীলতাও তার একটা।

(৩) ১।১৫৬।১।

(৪) ১।৯০।৫, ৭।১০০।২।

(৫) ১।২২।১৭।

(৬) ১।২২।১৬,১৮; ১।১৫৪।১,২; ১।১৫৫।৪, ৫; ৪।১৮।১১; ৭।১০০।৩,৪; ৮।৯।১২; ৮।১২।২৭; ৮।২৯।৭; ৮।৫২।৩ (বালখিল্য); ৮।১০০।১২;

বা সে অর্থ ছাড়িয়া একটা আকস্মিক অর্থ স্বীকার করিব কেন?

আশ্বিনী ঋক্ উদ্ধৃত করিয়া অমূল্য বাবু লিখিয়াছিলেন, "অতঃপর যখন এই একান্ত বাঞ্ছনীয় স্মরণযোগ্য ব্যক্তি কে—তাহা উপলব্ধি করিবার জন্য আর্য্য ঋষিগণ বদ্ধপরিকর হ'ন, যখন বহু দেবতার মধ্যে দৌকে খুঁজিয়া একেশ্বরবাদের প্রতিষ্ঠা করিতেছিলেন, তখন তাঁহারা দেবতাদিগের মধ্যে বিষ্ণুকেই 'এষঃ' নামে অভিহিত করেন।" এই বলিয়া তিনি তাঁহার দ্বিতীয় প্রমাণ ঐ মারুতী ঋক্ উদ্ধৃত করেন। কিন্তু ঐ "অতঃপর"—কিসের পর? অবশ্য আশ্বিনী ঋকের রচনার পর। কিন্তু আশ্বিনীর পরে মারুতী রচিত হইয়াছিল, তার প্রমাণ কি? ঋগ্বেদসংহিতার অন্তিম মণ্ডলের অধিকাংশই নাকি বয়সে সকল মণ্ডলের কনিষ্ঠ বটে। কিন্তু তাই কিছু আর দ্বিতীয় মণ্ডলটাও প্রথম হইতে অর্ব্বাচীন হয় না। "এই একান্ত বাঞ্ছনীয় স্মরণযোগ্য ব্যক্তি"—কোন "একান্ত বাঞ্ছনীয় স্মরণযোগ্য ব্যক্তি"? পাঠক দেখিয়াছেন, এ সব বাঞ্ছনীয় ব্যক্তি আশ্বিনী ঋকে নাই। অতএব বদ্ধপরিকর হইবার কথাটাও মিথ্যা। "দৌ"টা দিব বা দ্যো ছাড়া আর কিছু নয়। তার প্রথমার একবচনও "দৌ" নহে, "দ্যোঃ"। এ ঐকেশ্বরবাদের ইতিহাসটার মর্ম্ম এই বোধ হয় যে, মন্ত্রের ঋষিরা সকালে বিষ্ণুকেই একেশ্বর বা পরমেশ্বর মানিয়াছিলেন, তাই সব দেবতা ফেলিয়া তাঁহাকেই বাঞ্ছনীয় বা স্মরণযোগ্য বলিয়া গিয়াছেন। এষশব্দে বাঞ্ছনীয় বুঝিতে বাধা কি, দেখাইয়াছি। ঋগ্বেদসংহিতায় যদি বিষ্ণু একেশ্বর বা পরমেশ্বরই হইতেন, তবে অন্ততঃ সে মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিবারও একটা প্রয়োজন থাকিয়া যাইত। কিন্তু বিষ্ণুর সে ঐকেশ্বর্য্য বা পারমেশ্বর্য্য নাই। ঋগ্বেদে দেবতাগণমধ্যে যদি কোনও দেবতার যথার্থ প্রাধান্য থাকে, তবে তাহা ইন্দ্র এবং অগ্নির। বিষ্ণুর সে প্রাধান্য নাই। (১) ঋগ্বেদের ব্রাহ্মণে বিষ্ণুপ্রাধান্য-প্রতিপাদিনী দুই একটা অস্ফুট শ্রুতি আছে বটে (২), কিন্তু মন্ত্রে নাই। মন্ত্রে স্থানে স্থানে যে প্রাধান্যের আভাস আছে, সেরূপ আভাস, ইন্দ্রাগ্নির তো কথা নাই, অনেক গৌণ দেবতার সম্বন্ধেও দেখিতে পাই। তাই মোক্ষমূলর ঋগ্বেদের ঈশ্বরবাদকে Monotheism না বলিয়া একটা নূতন নামে নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণের কথা বলিতেছিলাম, কিন্তু ব্রাহ্মণেও একই শ্বাসে শুনিতে পাই—

অগ্নির্বৈ সর্ব্বা দেবতা বিষ্ণুঃ সর্ব্বা দেবতাঃ। (৩)

অগ্নিই সকল দেবতা, বিষ্ণু সকল দেবতা।

অতএব ব্রাহ্মণেও বিষ্ণু একেশ্বর নহেন। যে ঐতরেয়ের আরম্ভেই বিষ্ণুর মহিমোদ্‌ঘোষ, তাহাতেই আবার এ শ্রুতিও আছে—

বিষ্ণুর্বৈ দেবানাং দ্বারপঃ স এবাস্মা এতদ্দ্বারং বিবৃণোতি। (৪)

বিষ্ণুই দেবতাদিগের দ্বারপাল। তিনিই ইহাকে এই দ্বার খুলিয়া দেন।

যিনি দ্বারপালমাত্র, তিনি অবশ্য গৃহস্বামিগণ হইতে নিকৃষ্ট।

একটা কঠিন সূক্তে আর একটা এষশব্দ আছে। অমূল্য বাবু তাহা ধরেন নাই। সে ১০ মণ্ডলের ১০২ সূক্তের ১২ ঋকে। ক্রমশঃ।

শ্রী অবিনাশচন্দ্র গুহ। এম্-এ, বি-এল্

১০।১৫।৯ ব্রাহ্মণে ইহারই প্রতিধ্বনি। ঐ ব্রাহ্মণ ১।৩।৪ যজুর্ব্বেদেও এ শ্রুতি প্রসিদ্ধ। বা. সংহি. ১।২; ২।২৫, ৫।৩৮ ও ৪১, ইত্যাদি।

(১) Macdonell, *Vedic Mythology* (Buehler's *Grundriss*, Strassburg, 1897), S. 17.

(২) ঐতরেয়ব্রাহ্মণ, ১।১।১; কৌষীতকিব্রা. ৭।১।

(৩) ঐ. ব্রা. ১।১।৪।

(৪) ঐ ১।৩০।১৯।

ঢাকা সাহিত্য-সম্মিলন।

(প্রতিবাদ)

বিগত বৈশাখ সংখ্যায় "নব্যভারতে" শ্রীযুক্ত রোহিণীকুমার গোস্বামী নামক জনৈক লেখক ঢাকায় সাহিত্য-সম্মিলন সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। প্রবন্ধটীর প্রতি ছত্রে লেখক যেরূপ ব্যক্তিগত বিদ্বেষ ও সঙ্কীর্ণতার পরিচয় দিয়াছেন তাহাতে উহার প্রতিবাদ করিয়া ওরূপ প্রবন্ধকে সম্মানিত করিবার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু পাছে উহা পাঠ করিয়া কাহারও মনে কোনরূপ ভুল ধারণা বদ্ধমূল হয়, এই আশঙ্কায় সংক্ষেপে দু'চারিটী কথা বলা সঙ্গত মনে করিলাম।

কত বাধা বিঘ্নের মধ্য দিয়া যে এবার ঢাকার সাহিত্যিকগণ মাত্র এক পক্ষকাল সময়ের মধ্যে সম্মিলনের আয়োজন করিতে পারিয়াছিলেন, তাহা সকলেই অবগত আছেন। তিন চার মাস পূর্ব্ব হইতে আয়োজন আরম্ভ হইলেও যে মহাযজ্ঞ সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর হইয়া উঠে না, একপক্ষ সময়ের মধ্যে যে ঢাকার উদ্যোক্তাগণ উহা সম্ভবপর করিয়া তুলিয়াছিলেন, সেজন্য বিদেশাগত প্রতিনিধি-বর্গের অজস্র প্রশংসাবাদ তাঁহারা লাভ করিয়াছেন। সময়ের অল্পতা নিবন্ধন অনেক ত্রুটী বিচ্যুতি ঘটিয়াছিল, সেজন্য তাঁহারা করযোড়ে সকলের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছিলেন। দর্শক ও প্রতিনিধিগণ উদারতার সহিত এবারকার সম্মিলনের সকল ত্রুটী মার্জ্জনা করিয়াছেন। সুতরাং "নব্যভারতে"র পৃষ্ঠায় অকস্মাৎ এতখানি উষ্মার পরিচয় পাইয়া ঢাকার সাহিত্যিকগণ স্বভাবতঃই বিস্মিত ও দুঃখিত হইয়াছেন।

রোহিণীবাবু প্রারম্ভেই ঢাকার সাহিত্য পরিষদ ও সাহিত্য সমাজ নামক সভা দুইটীর তুলনায় সমালোচনা করিয়াছেন। রোহিণী-বাবু লোকটী কে, আমরা জানিনা, ঢাকার সাহিত্যিক ব্যাপারে এতটা অনুসন্ধিৎসু হইবার তাঁহার কোনও নিগূঢ় কারণ আছে কি না, তাহাও আমরা অবগত নাহি। পূর্ব্ববঙ্গ সাহিত্য-সমাজ যে ব্যক্তিগত নিন্দাপ্রশংসার বহু ঊর্দ্ধে অবস্থিত, এ সম্বন্ধে একটা স্পষ্ট ধারণা থাকিলে রোহিণী বাবু এতটা চিত্ত-বিকার প্রকাশ করা নিশ্চয়ই অমার্জ্জনীয় ধৃষ্টতা বলিয়া মনে করিতেন। যে সভা ঢাকার প্রাচীনতম সাহিত্যিক অনুষ্ঠান, সাহিত্য-সম্রাট কালীপ্রসন্ন যাহার প্রতিষ্ঠাতা, যে সভা হইতে ঢাকার বর্ত্তমান সাহিত্যিক আবহাওয়ার সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার সম্বন্ধে একজন অজ্ঞাতনামা লেখক কি মত প্রকাশ করিলেন, তাহা অবশ্য অনায়াসেই উপেক্ষা করা যাইতে পারে, কিন্তু একটী বিশিষ্ট মাসিকের পৃষ্ঠায় ছাপার অক্ষরে উহা প্রকাশের অধিকার প্রদান করা কতদূর শোভন হইয়াছে, তাহা সম্পাদক মহাশয়ই বলিতে পারেন। রোহিণীকুমার লিখিয়াছেন, "আমরা কাহারও নিন্দা করিব না ; আমরা ভিন্ন জেলাবাসী এবং সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ।" ঠিক কথা! তাঁহার প্রবন্ধটীর প্রতি ছত্র যেরূপ অসংযত নিন্দা ও পক্ষপাতিত্বে বিষাক্ত, তাহাতে এ সাফাইটী বড়ই শ্রুতিমধুর হইয়াছে! ভিন্ন জেলার কথা লইয়া এতটা শিরঃপীড়ার পরিচয় প্রদান করিতে কে

আপনার, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহার উপরেও আমরা সকলি সকলের। এ সাধনা না থাকিলে সিদ্ধিলাভ হয় না। আমরা কি রোগে শোকে, অনাহারে অর্থাভাবে মরিবই? নীরবে যেমন মরিতেছি, তেমনি মরিব? ইহা হইতে পারে না। আমাদের মধ্যে অন্য বিষয়ে যতই মারামারি কাটাকাটি থাকুক, আমরা সকলে মিলিয়া একাগ্রচিত্তে গ্রাম-জননীর সেবা করিতে থাকিলে, গ্রামে সুখ শান্তি আসিবেই। যথাসাধ্য রুগ্নের সেবা ও ক্ষুধিতের মুখে অন্ন দিবার ব্যবস্থা করিতেই হইবে। মনে রাখিবেন, কলিযুগে দান পরম ধর্ম্ম বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকিলেও কেবল দানের দ্বারা এত দুঃখ মোচন করিবার সাধ্য কাহারও নাই। বিষম সমস্যা, কি করা যায়? সমাজের ধন বৃদ্ধি না করিতে পারিলে, গ্রাম-জননীর বা দেশের সেবা হয় না। জননীর দশ সন্তান দশটী টাকা আনিলে অনেক হইতে পারে। কিন্তু যদি তাহার পরিবর্ত্তে আটটী সন্তান অলস ভাবে বসিয়া থাকে, এবং পূর্ব্ব গৌরবের বা ভদ্রতার বড়াই করিয়া দিন কাটায়, তবে তাহার অবশিষ্ট দুই পুত্র কি করিতে পারে? এরূপ হইলে দুঃখ বাড়িবেই ত। একবার তাকাইয়া দেখুন, আমরা কত কত লোকের উপার্জ্জন করিবার ইচ্ছা হইতে দিতেছি না। অলসের সংখ্যা, সাধ্য থাকিলেও উপার্জ্জনে অনিচ্ছুক ব্যক্তির সংখ্যা, দিন দিন বাড়াইয়া তুলিতেছি। মনে করিতেছি, কতই পুণ্য করিতেছি! যাহাতে অলসের সংখ্যা বাড়ে, উপার্জ্জনে বিরত ব্যক্তির সংখ্যা বাড়ে, অর্থাভাবে সমাজে দুঃখ দৈন্যে ছাইয়া যায়, তাহা যদি পুণ্য কার্য্য হইল, তবে পাপ কাহাকে বলিবেন? যে শ্রেণীর লোক এইরূপে অন্যের কষ্টে উপার্জ্জিত অর্থ ধ্বংস করিয়া পেট মোটা করিয়া বসিয়া আছে, এবং সমাজের চাঁই বলিয়া গৌরব করিতেছে, তাহারা কিন্তু বংশ বৃদ্ধি করিতে বিরত হয় নাই। একটী অলস ব্যক্তি আর দশটী সমাজের ঘাড়ে চাপাইতে ছাড়িতেছে না; ইহারা সমাজের কি ভীষণ অনিষ্ট করিতেছে! আপনারা বুঝিয়াছেন যে, আমি এই অসংখ্য ভিখারীদের কথাই বলিতেছি। ভদ্র অভদ্র উভয় শ্রেণীর ভিখারীর কথা বলিতেছি। বাঙ্গালায় প্রায় দুই কোটী পুরুষ, ইহাদের মধ্যে যদি এক কোটী উপার্জ্জন-বিরত ব্যক্তি থাকে, তবে হিসাব করুন, প্রত্যেকের মাসিক উপার্জ্জন ৫৲ টাকা ধরিলে বঙ্গদেশের আরও পাঁচ কোটী টাকা বৃদ্ধি হয় কি না? ইহাতে দেশের অন্নাভাব, বস্ত্রাভাব এবং অস্বাস্থ্য সম্পূর্ণ অথবা অংশতঃ দূর করা যায় কি না? আমরা সর্ব্বদাই কাঁদি, অপরে আমাদের ধন রত্ন লুটিয়া লইতেছে, এবং তাই আমরা হত-দরিদ্র হইয়াছি। এ কথা কতক পরিমাণে ঠিক হইলেও ইহা একমাত্র কারণ নহে। আপনারা দেখিলেন, আমরা একটী সামাজিক কুপ্রথা পরিবর্ত্তন করিতে পারিলে, পাঁচ জনে বসিয়া একজনের অর্থ ধ্বংস করা নিবৃত্ত করিতে পারিলে, এবং যাহার সন্তান সন্ততি প্রতিপালন করিবার ক্ষমতা নাই, তাহাকে কৌলীন্যের খাতিরে বিবাহিত না করিলে, মাসে মাসে কত কোটী টাকা আয় বৃদ্ধি করিতে পারি। ভাবিয়া সেদিকে কি কেহই দেখিব না? অলস জড়ভাবে আর কতদিন থাকিব? সন্তানসন্ততিগণকে উদ্যোগশীল, চেষ্টাপরায়ণ, একাগ্রচিত্ত, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, দেশসেবক, সমাজসেবক হওয়ার জন্য আমরা কি করিতেছি? এ বিষয়ে পরে

আলোচনা করা যাইবে। আজ আর বলিবার সময় নাই।

আশা করি, আপনারা শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা শুনিয়া প্রভূত আনন্দ অনুভব করিবেন। হিন্দুর মানসিক উন্নতির চরমাবস্থায় যে সমস্ত দার্শনিক তত্ত্ব আবিষ্কার হইয়াছিল, আজ আপনারা তাহার আস্বাদ পাইবেন; কিন্তু মনে রাখিবেন, পৃথিবী পরিবর্ত্তনশীল। যে সমুদায় বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার বর্ত্তমান যুগে ইউরোপে ও আমেরিকায় সুখ সম্পদ বৃদ্ধি করিতেছে, সেই সমুদায় আয়ত্ত করিয়া যাহাতে আমরাও সুখ সম্পদ বৃদ্ধি করিয়া লইতে পারি, তাহার চেষ্টা হইতে বিরত হইলে চলিবে না। আমাদের অগ্নি-পরীক্ষার সময় আসিয়াছে, আশা করি, বালক ও যুবক-বৃন্দ তাহার জন্য প্রস্তুত হইবেন, এবং কেবল দার্শনিক তত্ত্বের রসাস্বাদন করিয়া নিশ্চেষ্ট থাকিবেন না। মনে রাখিবেন, অমর কবি হেমচন্দ্র ৪০ বৎসর পূর্ব্বেও বলিয়া গিয়াছেন, "যাও সিন্ধু—"

শ্রীরাধিকামোহন লাহিড়ী।

"এষা"র নামকরণ।(২)(শেষ)

~~একটা কঠিন সূক্তে আর একটা এষশব্দ~~ আছে। ~~অমূল্য বাবু তাহা ধরেন নাই।~~ ~~যে ১০ মণ্ডলের ১০২ সূক্ত~~। ভৃম্যশ্বের পুত্র মুদ্গল তার ঋষি। এখানেও এক আখ্যায়িকা আছে। একদা একটামাত্র বুড়া বলদ রাখিয়া ঋষির আর সব গোরু চোরে চুরি করিয়া নিল। ঋষি বুড়া বলদটাই রথে জুতিলেন। বলদের পাশে, আর বলদ নাই, একটা মুদ্গর (১) বান্ধিয়া লইলেন। রথে চড়িয়া ঋষি গোরুর অন্বেষণে চলিলেন। স্বয়ং ঋষিপত্নী সারথি হইলেন।—

উৎ স্ম বাতো বহতি বাসো অস্যা-

R V. অধিরথং যদজয়ৎ সহস্রম্।

78.4,7-10 রথীরভূন্মুদ্গলানী গবিষ্টৌ

102,7,5. ভরে কৃতং ব্যচেদিন্দ্রসেনা॥

১০।১০২।২

যখন রথযুক্ত (২) গোসহস্র জয় করিতেছিলেন, তখন বায়ু ইঁহার বসন উড়াইতেছিল। গবান্বেষণে মুদ্গলপত্নী সারথি হইয়াছিলেন।

… … …

এমন অপূর্ব্ব ঋক্ ঋগ্বেদেও বেশী নাই। কিন্তু সে কথা এখন থাক্। গবিষ্টিশব্দের সপ্তমীর একবচন, "গবিষ্টৌ"। "গবান্বেষে", "গবিষ্টৌ", একই কথা। গবিষ্টি = গো + ইষ্টি। গোরুর ইষ্টি, এষণ, অন্বেষণ। শব্দটা পাঠক মনে রাখিবেন।

তার পর এক ঋকে ঐ বৃষভের স্তুতি—

তেন সুভর্বং শতবৎ সহস্রং

গবাং মুদ্গলঃ প্রধনে জিগায়।

১০।১০২।৫

তার দ্বারা মুদ্গল চারুচর্ব্বণশীল শতসহস্র গোরু যুদ্ধে জয় করিয়াছিলেন।

---

(১) সূক্তের নবম ঋকে আছে, 'দ্রুঘণ'। তার অর্থ, মুদ্গর (নিরুক্ত, অমর, হেমচন্দ্র, সায়ণ, B.R.) বা কুঠার (হেমচন্দ্র, মেদিনী, ভট্টোজিদীক্ষিত)।

(২) অধিরথশব্দ এই ঋক্ ছাড়া আরও তিনটা ঋকে আছে—১০।৯৮।৪,৯,১০। এই তিন ঋকে সায়ণ ঐ শব্দের যে অর্থ করিয়াছেন, এখানেও আমি সেই অর্থই গ্রহণ করিলাম। ১০।৯৮।৪ ঋকে সায়ণ আরও একটা অর্থ দিয়াছেন। B.R. সর্ব্বত্র সেই অর্থ ধরিয়াছেন। B.R.এর মতে, অধিরথশব্দ ও বক্ষ্যমাণ একাদশ ঋকে তৎকল্পিত রথাশব্দ একার্থক।

আর এক ঋকে ঐ মুদ্গলের স্তুতি। মুদ্গলটা ঋষি চোরের দলের উপর ছুঁড়িয়া মারিয়াছিলেন।—

যেন জিগায় শতবৎ সহস্রং
গবাং মুদ্গলঃ পৃতনাজ্যেষু।

১০।১০২।৯

যার দ্বারা মুদ্গল শতসহস্র গোরু যুদ্ধে জয় করিয়াছিলেন।

পরে এক ঋকে আবার সেই সারথির স্তুতি। সেই ঋক্‌টাই আমি দেখাইতে চাই। তার তৃতীয় পাদ এই—

এষৈষ্যা চিদ্রথ্যা জয়েম।

১০।১০২।১১

বেদভাষামতে এখানে "এষৈষ্যা", "রথ্যা", দুই পদই স্ত্রীলিঙ্গ, তৃতীয়ান্ত, একবচন। করণে তৃতীয়া। প্রথম 'এষৈষী', দ্বিতীয় 'রথী' শব্দের রূপ। প্রথম দ্বিতীয়ের বিশেষণ। রথ ইহার আছে, এই অর্থে 'রথী'। অর্থাৎ সারথি। রথশব্দের সহিত মত্বর্থীয় বৈদিক ঈ প্রত্যয়ের (১) যোগে ঈকারান্ত রথীশব্দ। ঋষিপত্নীকে বুঝাইতেছে বলিয়া এখানে শব্দটা স্ত্রীলিঙ্গ। তার বিশেষণ, এষৈষী। যাহা ইচ্ছা করা যায়, তাই এষ। কর্ম্মে ঘঞ্। অর্থাৎ ইষ্ট, বাঞ্ছিত। ভাষ্যকারের ভাষায়, "এষিতব্যো গোসঙ্ঘ এষঃ"। যে গোরুগুলি ইচ্ছার যোগ্য, সেইগুলিই এষ। অর্থাৎ বাঞ্ছনীয়। এষ যিনি ইচ্ছা করেন, তিনি এষৈষ। অর্থাৎ ইষ্টৈষী, বাঞ্ছিতৈষী, বাঞ্ছিতকাম, বাঞ্ছনীয়কাম। কর্ম্মভূত এষশব্দের পরে ইষধাতুর উত্তর কর্ত্তরি বাচ্যে অণ্ প্রত্যয়। (১) উপপদসমাস। (২) স্ত্রীলিঙ্গে এষৈষী। (৩) অতএব ঐ পাদের সায়ণসম্মত অনুবাদ এই—

বাঞ্ছিতকাম (বা বাঞ্ছনীয়কাম) সারথির দ্বারা আমরা যেন জয়লাভ করিতে পারি।

এ দিকে B.R. এবং তদনুসারী গ্রাস্মানের মতে "এষৈষ্যা", "রথ্যা", দুইই নপুংসকলিঙ্গ, দ্বিতীয়ান্ত, বহুবচন। (৪) কর্ম্মে দ্বিতীয়া। প্রথম 'এষৈষ্য', দ্বিতীয় 'রথ্য' শব্দের রূপ। প্রথম দ্বিতীয়ের বিশেষণ। দ্বিতীয়, 'জয়েম' এই ক্রিয়ার কর্ম্ম। ইহা রথে থাকে, এই অর্থে 'রথ্য'। অর্থাৎ রথস্থ দ্রব্যসমূহ, রথভার। (৫) রথশব্দের পরে ভবার্থে বৈদিক যৎ প্রত্যয়। (৬) তার বিশেষণ, 'এষৈষ্য'। এষ সেই "গবামেষে"র এষ। অর্থাৎ এষণ, অন্বেষণ। ভাবে ঘঞ্। এষ্যশব্দের অর্থ—এষণীয়, প্রাপণীয়, প্রাপ্য। ইষধাতুর পরে কর্ম্মণি বাচ্যে ণ্যৎ। (৭) পাণিনির কথায় পাশ্চাত্যের ব্যাখ্যা বুঝাইতেছি। এষের দ্বারা এষ্য, এষৈষ্য। তৃতীয়া-

(১) ছন্দসীবনিপৌ চ। পাণিনি, ৫।২।১০৯, বার্ত্তিক। রথীশব্দ পুংলিঙ্গ স্ত্রীলিঙ্গ দুইই হয়। ঋগ্বেদেই উভয়বিধ প্রয়োগ আছে। উভয় লিঙ্গেই প্রথমার একবচন, 'রথীঃ'।

(১) পা. ৩।২।১।

(২) ঐ, ৬।২।১৯।

(৩) ঐ, ৪।১।১৫।

(৪) বেদে অকারান্ত ও ব্যঞ্জনান্ত পুংলিঙ্গ শব্দের পরে প্রথমা ও দ্বিতীয়ার দ্বিবচনবৎ অকারান্ত নপুংসকলিঙ্গ শব্দের পরে প্রথমা ও দ্বিতীয়ার বহুবচনের বিভক্তিও অনেক স্থলেই 'আ'। পা. ৭।১।৩৯। কচিৎ স্ত্রীলিঙ্গ নদীসংজ্ঞক শব্দের পরেও প্রথমা ও দ্বিতীয়ার দ্বিবচনে এই 'আ' দেখিতে পাওয়া যায়।

(৫) আমরা যেমন বলি, একগাড়ী মাল। অমরকোশে আছে, "শাকটো ভার আচিতঃ"। দ্বিতীয়কাণ্ড, বৈশ্যবর্গ। একগাড়ী মালের পরিমাণকে এক 'আচিত' বলে।

(৬) পা. ৪।৪।১১০।

(৭) ঐ, ৩।১।১২৪। B.R. দৃষ্টান্ত দিয়াছেন—অথর্ব্ববেদসংহিতা, ১২।২।৩৯, ১২।৪।১৬।

তৎপুরুষ। অর্থাৎ অন্বেষণপ্রাপ্য, অন্বেষণ-যোগ্য। এ ব্যাখ্যায় ঐ পাদের অনুবাদ এই হয়—

অন্বেষণযোগ্য বহু রথশ্রার যেন আমরা জয় করিতে পারি।

অতএব এখানেও বেদভাষ্য অমূল্য বাবুর অনুকূল। কিন্তু এখানেও সে ভাষ্য উপেক্ষার যোগ্য। সায়ণকল্পিত এবৈষীশব্দের অর্থ, ইচ্ছার বিষয় বা ইচ্ছার যোগ্য বিষয় যে স্ত্রী ইচ্ছা করেন। যেন ইচ্ছা করা বলিতেই ইচ্ছার বিষয় বা ইচ্ছার যোগ্য বিষয় ইচ্ছা করা বুঝায় না! অনুবাদে ইষ্টৈষী, বাঞ্ছিতৈষী, বাঞ্ছিতকাম বা বাঞ্ছনীয়কাম বলিয়া কথাটা আমি একটু গিল্টি করিয়াছি মাত্র। কিন্তু সে গিল্টি চেনা যায়। জিনিস ঠিক্ তাই আছে—একটা অপদার্থ পুনরুক্তি! বৈদিক শব্দরচনা সর্ব্বত্রই যে বড় কলাকৌশলের পরিচায়ক, তা নয় সত্য। না হইবারই কথা। কিন্তু তাই বলিয়া 'ইচ্ছার বিষয় বা ইচ্ছার যোগ্য বিষয় যে ইচ্ছা করে', এ অকালকুষ্মাণ্ড আমি বেদে চালাইতেও রাজী নহি। তবে ইষধাতুর অর্থ অন্বেষণও বটে। অতএব সায়ণের ঐ এবৈষীশব্দটা চোঁয়াইয়া 'বাঞ্ছিত বস্তু যে নারী অন্বেষণ করিতেছেন,' এ অর্থও পাওয়া যায়। কিন্তু তাহাতেও শুধু অর্থের ক্লেদই দূর হয়, শব্দশুদ্ধি হয় না। এষশব্দের সায়ণোক্ত ব্যাখ্যায় সংশয় যায় না। কেন না, ঋগ্বেদে ভাবনিষ্পন্ন এষশব্দের অসন্দিগ্ধ দৃষ্টান্ত আছে (১), কর্ম্মনিষ্পন্নের নাই। পক্ষান্তরে, 'এবৈষী'র এষশব্দে অন্বেষণ বুঝিলে পূর্ব্বশ্রুত গবিষ্টি-শব্দের সহিত ইহার ঐক্য থাকে। তাই স্বাভাবিক। এষ সেই ইষ্টিরই প্রতিধ্বনি।

(১) যথা, "গবাম্নেষে"।

"গবান্বেষণে মুদ্গলপত্নী সারথি হইয়া-ছিলেন।" সারথিও অন্বেষণকাম। এ তাঁরই স্তুতি—

অন্বেষণকাম সারথির দ্বারা আমরা যেন জয়লাভ করিতে পারি। (১)

অথবা "এবৈষ্যা"র B.R. যে ব্যাখ্যা দিয়াছেন, তাও অসঙ্গত নয়। সে ব্যাখ্যায় এক লাভ এই যে, তাহাতে স্বরসম্বন্ধে কোনও সংশয় থাকে না। মন্ত্রে "এবৈষ্যা" অন্তস্বরিত। B.R.এর ণ্যৎপ্রত্যয়ান্ত এষ্য-শব্দও তিৎস্বরে অন্তস্বরিত। (২) অতএব সমাসে 'এবৈষ্য'ও কৃদুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরে তাই। (৩) বলিয়াছি, এবৈষ্যশব্দের পরে নপুংসকলিঙ্গে দ্বিতীয়াবহুবচনের বৈদিক বিভক্তি 'আ' যুক্ত হইয়া ঐ 'এবৈষ্যা' পদ সিদ্ধ হয়। শব্দের অন্ত্য অকার স্বরিত, বিভক্তির আকার অনুদাত্ত। (৪) সন্ধিতে স্বরিত ও অনুদাত্ত মিলিয়া স্বরিত হয়। (৫) তাই "এবৈষ্যা"ও অন্তস্বরিত। কিন্তু সায়ণের এবৈষশব্দ অন্তোদাত্ত (১), কেন না তার উত্তরপদস্থ এষশব্দ অণ্‌প্রত্যয়ান্ত বলিয়া প্রত্যয়স্বরে অন্তোদাত্ত (৬)। স্ত্রীলিঙ্গে

(১) ঋগ্বেদে অকর্ম্মক জিধাতুর আরও অনেক প্রয়োগ আছে; যথা—৪।২১।৪, ৮।৪৫।১১, ৮।৯২।১১, ইত্যাদি।

(২) পা. ৬।১।১৮৫। তিৎপ্রত্যয়ান্ত শব্দ অন্তস্বরিত হয়। যে প্রত্যয়ের তকার ইৎ, সেই প্রত্যয়ই তিৎ। ণ্যৎও তাই।

(৩) পা. ৬।২।১৩৯। তৎপুরুষসমাসে গতি কারক বা উপপদের পরবর্ত্তী কৃদন্ত শব্দের নিজের যে স্বর, সমাসেরও সেই স্বর। এই স্বরকেই পাণিনীয়েরা কৃদুত্তরপদপ্রকৃতিস্বর বলেন। উপপদসমাসও অবশ্য তৎপুরুষের অন্তর্গত।

(৪) পা. ৩।১।৪।

(৫) ঐ, ১।১।৫০। ঋ. প্রা. ৩।৬।

(৬) পা. ৩।১।৩

এষৈষী'ও তাই। (১) এষৈষীশব্দের পরে তৃতীয়ার একবচনের বিভক্তি 'আ' যুক্ত হইয়া “এষৈষ্যা”। শব্দের অন্ত্য ঈকার উদাত্ত, বিভক্তির আকার অনুদাত্ত। (২) সন্ধিতে সেই উদাত্ত ঈকারের স্থানে যকার হইয়াছে। এখন, উদাত্ত বা স্বরিতের স্থানে 'য' 'র' 'ল' বা 'ব' হইলে তার পরবর্ত্তী অনুদাত্ত স্বরিত হয়। (২) তাই এখানে বিভক্তির ঐ আকার স্বরিত, এবং “এষৈষ্যা” অন্তস্বরিত। কিন্তু সুপ্‌বিভক্তি অনুদাত্ত, এ সামান্য বিধির অনেক অপবাদ আছে। একটা পাঠক আশ্বিনী খকে দেখিয়াছেন। আর এক অপবাদ এই। উদাত্তের স্থানে যে 'য' 'র' 'ল' বা 'ব' হয়, তার পূর্ব্বে যদি ব্যঞ্জনবর্ণ থাকে, তবে তার পরে দ্বিতীয়া-বহুবচন হইতে আরম্ভ করিয়া যে যে বিভক্তির আদিতে স্বরবর্ণ আছে, সেই সকল বিভক্তি উদাত্ত হয়। (৩) ঋগ্বেদেই ইহার দৃষ্টান্ত আছে। অরণ্যানি, আষ্ট্রী, উরু, তিরশ্চী, দূতী, দেবী, পত্নী, পিতৃ, পুষ্টি, পৃথিবী, ভুজি, মাতৃ, বধ্রিমতী, শ্বশ্রূ, সবিতৃ, সিনীবালী, সূচী,—এই সকল শব্দ অন্তোদাত্ত। যথাক্রমে তদুৎপন্ন অরণ্যানাম্; আষ্ট্র্যাম্; উর্ব্বোঃ; তিরশ্চ্যাঃ; দূত্যাম্; দেব্যা, দেব্যৈ, দেব্যাঃ, দেব্যাম্; পত্ন্যা, পত্ন্যঃ; পিত্রা, পিত্রে; পুষ্ট্যৈ; পৃথিব্যা, পৃথিব্যৈ, পৃথিব্যাঃ, পৃথিব্যাম্; ভুজ্যৈ; মাত্রে, মাত্রোঃ; বধ্রিমত্যাঃ; শ্বশ্রূণাম্; সবিত্রা, সবিত্রে; সিনীবাল্যৈ; সূচ্যা;—এই সকল পদও অন্তোদাত্ত। (১) সায়ণকল্পিত “এষৈষ্যা”র স্থলেও যকারের পূর্ব্বে ব্যঞ্জনবর্ণ এবং তার পরে বিভক্তির আদিতে স্বরবর্ণ আছে। এখানেও তবে ঐ বিভক্তি উদাত্ত এবং “এষৈষ্যা” অন্তোদাত্ত হওয়া উচিত। সায়ণের “রথ্যা”ও তদ্রূপ। ঈপ্রত্যয়ান্ত রথীশব্দ প্রত্যয়স্বরে অন্তোদাত্ত। তারই তৃতীয়ার একবচন, “রথ্যা”। অথচ মন্ত্রে তাও অন্তস্বরিত। সায়ণের ব্যাখ্যায় তাই সংশয় হইতে পারে, অন্তোদাত্ত না হইয়া “এষৈষ্যা” ও “রথ্যা” অন্তস্বরিত হইল কেন? কিন্তু বস্তুতঃ সংশয়ের কোনও কারণ নাই। বেদে এ অপবাদ নিত্য নহে, বৈকল্পিকমাত্র। ঋগ্বেদ হইতেই আবার দৃষ্টান্ত দিই। অহী, ওষি, চক্রী, তুগ্রাবী, দেহী, নদী, নপ্তী, নান্দী, নিষ্টিগ্রী, মণ্ডূকী, মেষী, যমী, যহ্বী, যাতুধানী, রথী, বৃকী, বেশী, সুপ্রাবী, সূর্মি, সুরী, স্ফিগী—এই সকল শব্দও অন্তোদাত্ত। অথচ যথাক্রমে তদুৎপন্ন অহ্যঃ; ওষ্যোঃ; চক্র্যা, চক্র্যোঃ; তুগ্রাব্যঃ; দেহ্যঃ; নদ্যঃ; নপ্ত্যঃ, নপ্ত্যোঃ; নান্দ্যো; নিষ্টিগ্র্যঃ; মণ্ডূক্যা; মেষ্যো, মেষ্যঃ; যম্যঃ; যহ্ব্যঃ; যাতুধান্যঃ; রথ্যঃ, রথ্যো; বৃক্যো; বেশ্যা; সুপাব্যো, সুপ্রাব্যঃ; সূর্ম্যা; সূর্য্যঃ; স্ফিগ্যা;—এ সমস্ত পদই অন্তস্বরিত। (১) পাণিনিসূত্রোক্ত ঐ অপবাদ নিত্য না বৈকল্পিক, ভাষ্যবার্ত্তিকে তার সমাধান নাই। বৃত্তিকার এবং ভট্টোজিদীক্ষিতের মতে নিত্য বলিয়াই বোধ হয়। পাণিনির অভিপ্রায় যাই হউক, অন্ততঃ বেদে সে অপবাদ নিত্য নহে।

(১) পা, ৬।১।১৬১।

(২) ঐ, ৮।২।৪। ঋ. প্রা. ৩,৭; বলা বাহুল্য, এ স্বরিত স্বতন্ত্রস্বরিত।

(৩) পা. ৬।১।১৭৪।

(১) প্রয়োগস্থলগুলি আর এখানে দেখাইলাম না। কুতূহলী পাঠক তাহা মোক্ষমূলরের Index Verborum বা গ্রাস্মানের অভিধানে পাইবেন। তৃতীয়ান্ত অন্তস্বরিত বলিয়া গ্রাস্মান্ আর যে দুইটা 'রথ্যা' (৩।৩৬।৬, ৭।৯৫।১) ধরিয়াছেন, সম্ভবতঃ তাহা তৃতীয়ান্তও নয়, রথীশব্দোৎপন্নও নয়।

কিন্তু BR. "রথ্যা"র যে ব্যাখ্যা দিয়াছেন, সে ব্যাখ্যা অগ্রাহ্য। স্বরসম্বন্ধে ঠিক্ অগ্রাহ্য না হইলেও অর্থসম্বন্ধে অগ্রাহ্য। মন্ত্রে "এবৈষ্যা"র মত "রথ্যা"ও অন্তস্বরিত। BRএর মতে, রথ্যশব্দ যৎপ্রত্যয়ান্ত এবং "রথ্যা" তারই নপুংসকলিঙ্গে দ্বিতীয়াবহুবচনের রূপ। বলিয়াছি, তিৎপ্রত্যয়ান্ত শব্দ অন্তস্বরিত হয়। যৎও তিৎ। অতএব রথ্যশব্দেরও অন্তস্বরিত হইবারই কথা। কিন্তু তিৎস্বরের একটা প্রসিদ্ধ অপবাদ আছে। নাব্যশব্দ ছাড়া যৎপ্রত্যয়ান্ত দ্বিস্বর-বর্ণবিশিষ্ট আর সকল শব্দ অন্তস্বরিত না হইয়া আদ্যুদাত্ত হয়। (১) 'রথ্য'ও সেইরূপ শব্দ। অতএব তাও অন্তস্বরিত না হইয়া আদ্যুদাত্ত হওয়া উচিত। এখানে BR. এর স্বপক্ষে এই বলা যায় যে, ঋগ্বেদে এ অপবাদেরও বহু ব্যভিচার আছে। (২) তবে রথ্যশব্দেই বা ব্যভিচার মানিতে বাধা কি? পক্ষান্তরে, নিঃসংশয় রথশব্দোৎপন্ন রথ্যশব্দ ঋগ্বেদে উনিশ বার পাওয়া যায়, এবং তার আঠার বারই তাহা আদ্যুদাত্ত। একবারমাত্র অন্তস্বরিত। (৩) ইহাতে BRএর ব্যুৎপত্তিতে সংশয় হয়। এক বার হইলে দুই বার হইতেও বাধা নাই বটে, তবু সংশয় হয়। কেম না, আঠার বারই আদ্যুদাত্ত। সেই যে একটা অন্তস্বরিত, সেখানেও আর কোনও ব্যুৎপত্তি সম্ভবপর নয়, তাই হয়ত অগত্যা ব্যভিচারস্বীকার আবশ্যক হইতে পারে। কিন্তু এখানে অন্য ব্যুৎপত্তি আছে। তাহাতে অর্থও সমীচীন হয়। বলিয়াছি, অর্থসম্বন্ধে BRএর ব্যাখ্যা অগ্রাহ্য। রথভারার্থে ঋগ্বেদের আর কোথাও রথ্যশব্দের প্রয়োগ নাই। পাণিনি অন্ততঃ তিন অর্থে ঐ শব্দ জানিতেন। (১) বার্ত্তিকে কাত্যায়ন তার আরও একটা অর্থ দিয়াছেন। (২) কিন্তু BRএর ব্যাখ্যা উভয়ের অবিদিত। পাণিনিসূত্রে ভবার্থে বৈদিক যৎপ্রত্যয়ের বিধান (৩) দেখিয়াও এমত বলা যায় না যে, ঐ ব্যাখ্যা সূত্রকারের অনুমোদিত। বেদে, বিশেষতঃ যজুর্ব্বেদের শতরুদ্রিয়প্রকরণে (৪), ভবার্থে যৎপ্রত্যয়ান্ত

(১) পা. ৬।১।২১৩।

(২) বেন্‌ফাই (S. 615) তার দৃষ্টান্ত দিয়াছেন—উক্থ্য, ওক্য, কক্ষ্য, দূত্য, দেব্য, পথ্য, বুধ্ন্য, যূথ্য, বধ্য, বীর্য, শূন্য, স্বর্য। সবই অন্তস্বরিত। কিন্তু বধ্যশব্দে ব্যভিচার মানিবার প্রয়োজন নাই। পাণিনিমতে সে শব্দ যৎপ্রত্যয়ান্ত নয়, ণ্যৎপ্রত্যয়ান্ত, অতএব তিৎস্বরেই অন্তস্বরিত। বীর্যশব্দ যে আদ্যুদাত্ত নয়, পাণিনিও তাহা ইঙ্গিতে বলিয়াছেন। পা. ৬।২।১২০। তাও অন্তস্বরিত। ফিট্‌সূত্র, ৪।৯।

(৩) রথ্যানো অশ্বাঃ। ঋ. ৬।৩৭।৩। রথ্যশব্দ এখানে অন্তস্বরিত, তাই তার প্রথমার বৈদিক বহুবচন ঐ "রথ্যাসঃ" মধ্যস্বরিত। অল্‌দেনবের্ক বলেন, এ স্বর আমাদের অন্যথা করিবার অধিকার নাই। ৬।৩৭।৩ ঋকের টিকা। কিন্তু একই অর্থে ২।৪।৪, ২।৩১।৭ এবং ৯।৩৬।১ ঋকে সে শব্দ আদ্যুদাত্ত। শুধু তাই নয়। একই অর্থে সেই একই পদ "রথ্যাসঃ" ৯।৮৬।২ ঋকে আদ্যুদাত্ত। অন্য অর্থে তো যৎপ্রত্যয়ান্ত রথ্যশব্দ সর্ব্বত্রই আদ্যুদাত্ত। ঋ. ১০।১৩০।৭—বা. সংহি. ৩৪।৪৯ মন্ত্রে যে অন্তস্বরিত "রথ্যঃ" আছে, উবট ও মহীধরের মতে তাহা অকারান্ত অন্তস্বরিত রথ্যশব্দেরই প্রথমার একবচন। কিন্তু সায়ণের মতে সে পদ ঈকারান্ত অন্তোদাত্ত রথীশব্দের প্রথমার বহুবচন। বলিয়াছি, তাও অন্তস্বরিতই হয়। পা. ৮।২।৪; ঋ. প্রা. ৩.৭। সায়ণের ব্যাখ্যাই সঙ্গত। মন্ত্রে সপ্তর্ষি উপমেয়, "রথ্যঃ" উপমান। উপমেয় বহু, অতএব উপমানপদটাও বহুবচনান্ত হওয়াই সম্ভবপর।

(১) পা. ৪।২।৫০, ৪।৩।১২১, ৪।৪।৭৬।

(২) ঐ, ৫।১।৬, বার্ত্তিক।

(৩) ঐ, ৪।৪।১১০।

(৪) তৈত্তিরীয়সংহিতা, ৪।৫।৫—৯। বা. সংহি- ১৬।৩০—৩৫, ৩৭—৩৯, ৪২—৪৫।

[আ]ছে যৌগিক শব্দ দেখিতে পাই। তারই জন্য পাণিনি ঐ সূত্র করিয়া থাকিবেন। কন্তু রথে যাহা থাকে, তাই B.R.এর 'রথ্য' নহে। কেন না, রথে রথস্বামী এবং সারথিও থাকে। এব B.R.এর কল্পিত রথ্যাশব্দ যৌগিক নয়, রূঢ় বা যোগরূঢ়। সেরূপ অর্থে পাণিনি ঐ শব্দ জানিতেন বলিয়া বোধ হয় না। তা ছাড়া, পাণিনি বা কাত্যায়নের পরিচিত কোনও রথ্যাশব্দই অন্তস্বরিত নয়। পাঠক দেখিয়াছেন, ঐ তবার্থসূত্রে নিষ্পন্ন হইলেও সে শব্দ অন্তস্বরিত হয় না। এ দিকে প্রকৃত ঋকের প্রথম দুই পাদে ঋষিপত্নারই বর্ণনা। ঋষির সে অভিযানে তিনিই সারথি। তিন সহায় লইয়া ঋষি গবান্বেষণে গিয়াছিলেন—বৃষভ, মুদ্গর, এবং সেই সারথি। তিনেরই সাহায্যে ঋষি আপ্তকাম। সূক্তের পঞ্চম ও নবম ঋকে তাই বৃষভ ও মুদ্গরের স্তুতি—বৃষভের দ্বারা জয় করিয়াছিলেন, মুদ্গরের দ্বারা জয় করিয়াছিলেন। একাদশ ঋকেও ইহাই সর্ব্বথা সম্ভবপর যে, এই তৃতীয় পাদ সেই সারথিরই স্তুতি। সায়ণের মতে তাই "রথ্যা" সারথিবাচক রথীশব্দের রূপ। অল্‌দেন্‌বের্ক্‌ও এই ব্যাখ্যারই পক্ষপাতী। (১) স্বর পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি। B.R.এর "এষৈষ্যা" এবং সায়ণের "রথ্যা" ধরিয়া এ পাদের অনুবাদ এইরূপও করিতে পারি—

> সারথির দ্বারা যেন আমরা অন্বেষণযোগ্য দ্রব্যসমূহ জয় করিতে পারি।

"এষৈষ্যা" দ্বিতীয়ান্ত কর্ম্মপদ, সামান্যে নপুংসক। "রথ্যা" করণে তৃতীয়ান্ত।

আর দুইটা ঋকে এক প্রথমান্ত অন্তোদাত্ত "এষঃ" পাওয়া যায়। তাহা এষশব্দের রূপ না এতদ্ শব্দের রূপ, তদ্বিষয়ে বৈদিকদিগের মধ্যে মতভেদ আছে। কিন্তু সে মতভেদে অমূল্য বাবুর লাভ নাই। তার একটা ঋক্ এই—

> বৃহস্পতিঃ সর্ব্বগণস্বস্তয়ে
> মহো ব্রজান্ গোমতো দেব এষঃ।
> ৬।৭৩।৩

সায়ণের মতে এখানে "এষঃ" এতদ্‌শব্দের প্রথমার একবচন। তাও অন্তোদাত্ত বটে। (১) এষঃ = এই। B.R.এর মতও তাই বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু গ্রাস্মানের মতে, উহা এষশব্দেরই রূপ। অর্থ, গতিশীল। ম্যাক্‌ডনেল্‌ও এই মতাবলম্বী। (২) আর একটা ঋক্ এই—

> (৩) বিচক্রমে পৃথিবীমেষ এতাং
> ক্ষেত্রায় বিষ্ণুর্মনবে দশস্যন্। (৩)
> ৭।১০০।৪

এ মন্ত্রেও সায়ণের মতে, "এষঃ" = এই। এখানে গ্রাস্মান্‌ও সায়ণের অনুগামী। কিন্তু B.R.এর মতে এখানে "এষঃ" এষশব্দেরই রূপ। অর্থ, গতিশীল। এ দুই ঋকে কোন্ ব্যাখ্যা উপাদেয়, আমি নির্ণয় করিতে পারি নাই।

(১) ৬।৩৭।৩ ঋকের টীকা।

(১) উণাদিসূত্র, ১।১৩০। তাহাতে 'এতদ্' প্রত্যয়স্বরে অন্তোদাত্ত। অতএব 'এষঃ'ও তাই। উণাদিসূত্র কেন, বেদব্যবহারই তাই।

(২) P. 38, S. 17.

(৩) B.R. হইতে অসাবধানে প্রমাণ তুলিবার ফলে, এই অর্দ্ধর্চের পরে মহাভারতের 'ভর্ত্তুরেষণে' জুড়িয়া আগা গোড়া সবটাকে অমূল্য বাবু "মহাভারত ১, ৮৩৯৯" বলিয়া উদ্ধৃত করিয়াছিলেন। কিন্তু 'ভর্ত্তুরেষণে' এটুকুই শুধু মহাভারত। আদিপর্ব্ব, ২৩১ অধ্যায়, ১৪ শ্লোক। তাহাতে আবার এষশব্দই নাই। মহাভারতের যেখানে বরং ঐ শব্দ থাকিবার সম্ভাবনা ছিল, সেখানেও তাহা নাই। প্রসিদ্ধ বিষ্ণুসহস্রনামের মধ্যে এষশব্দ পঠিত হয় না। অনুশাসনপর্ব্ব ১৪৯ অধ্যায়। এষণ শব্দের অর্থ, অন্বেষণ।

ঋগ্বেদ সংহিতায় এ সকল ছাড়া আর কোনও এষশব্দ নাই। স্ত্রীলিঙ্গ এষাশব্দ একেবারেই নাই। "এষঃ" ও "এষ" অবশ্য অসংখ্য স্থলেই আছে। যথাক্রমে তাহা পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গে, এতদ্‌শব্দের প্রথমার এক বচন।

অমূল্য বাবুর বাকী প্রমাণগুলি তাঁর নিজ ভাষায় উদ্ধৃত করি—

"তার পর আমরা নিঘণ্টু, নিরুক্ত, মুদ্গল ও সায়ণ ভাষ্যে 'স্মরণযোগ্য' অর্থে 'এষঃ' ও 'এষা'র প্রয়োগ বহুবার পাইয়াছি; যথা,—

ঋক্‌ প্রাঃ ৪, ৭; শতপথ ব্রাঃ ২।৪।২।৪; নিরুক্ত ৪।২; অথর্ব্ব প্রাঃ ১।৩৭; ইত্যাদি।"

নিঘণ্টু, মুদ্গল ও সায়ণ ভাষ্যের প্রমাণ দিতে "যথা" বলিয়া ঋক্‌প্রাতিশাখ্য, শতপথ-ব্রাহ্মণ ও অথর্ব্বপ্রাতিশাখ্যের উদাহরণ! কিন্তু এ অতিছোট ক্রটি। প্রমাণগুলি একে একে দেখাই।

প্রথম, নিঘণ্টু। নিঘণ্টুর পাঁচ অধ্যায়ে কোথাও এষ বা এষা শব্দ নাই।

দ্বিতীয়, সায়ণভাষ্য। এষশব্দসম্বন্ধে সায়ণের ঋগ্বেদভাষ্য তন্ন তন্ন করিয়া মন্থন করিয়াছি। পরে শতপথভাষ্যের উল্লেখ করিব।

তৃতীয়, মুদ্গলভাষ্য। এও ঋগ্বেদেরই ভাষ্য। মোক্ষমূলরই প্রথম ইহার পরিচয় দিয়াছিলেন। (১) তাহাতে জানি, এ ভাষ্য সায়ণভাষ্যেরই একটা তুচ্ছ নকল মাত্র। যদি তাই হয়, তবে সায়ণের সমালোচনায় ইহারও সমালোচনা হইয়াছে। মুদ্গলভাষ্যে যদি অমূল্য বাবু বহুবার 'এষঃ' ও 'এষা' পাইয়া থাকেন, তবে তাহা সেই এতদ্‌শব্দের রূপ ছাড়া আর কিছু হওয়ার সম্ভাবনা নাই। সে 'এষঃ' ও 'এষা' ঋগ্বেদে বার বারই আছে, বলিয়াছি। আমি এ মুদ্গলভাষ্য কখনও দেখি নাই। এ পর্য্যন্ত তাহা মুদ্রিত হইয়াছে বলিয়াও আমার জানা নাই। তার পুঁথিও বড় সুলভ বলিয়া বোধ হয় না। (১)

চতুর্থ, ঋক্‌প্রাতিশাখ্যে ৪।৭। মূলের এ স্থলে কিছু নাই। কিন্তু তার উবটভাষ্যে অনেক ঋকের মধ্যে এই একটা প্রসিদ্ধ ঋকের অর্দ্ধপাদ উদাহৃত আছে—

ভদ্রৈষাং লক্ষ্মীঃ।

১০।৭১।২

নিরুক্ত (২) ও মহাভাষ্যে (৩) ঋক্‌টার ব্যাখ্যা আছে। ভদ্রা + এষাম্‌ + লক্ষ্মীঃ। এ "এষাম্‌" পুংলিঙ্গে ষষ্ঠীবহুবচনান্ত ইদম্‌শব্দের রূপ। প্রাতিশাখ্যেও তার অভাব নাই। তাহাতে এতদ্‌শব্দের 'এষঃ'ও অনেক আছে। কিন্তু ঋক্‌প্রাতিশাখ্যের কোথাও এষ বা এষা শব্দ নাই।

পঞ্চম, শতপথব্রাহ্মণে ২।৪।২।৭। সে শ্রুতি এই—

অথৈনং পশব উপাসীদন্‌। তেভ্যঃ স্বৈরমেব চকার যদৈব যূয়ং কদা চ লভাধ্বৈ (৪) যদি কালে যদ্যনাকালেঽথৈবাশ্নাথেতি। তস্মাদেতে যদৈব কদা চ লভন্তে যদি কালে যদ্যনাকালেঽথৈবাশ্নন্তি।

(১) Rigvedasamhita, First Edition, Vol. III, Preface, xii.

(১) আউফ্রেহ্‌ৎ (Aufrecht, *Catalogus Catalogorum*, 3 Vols. Leipzig, 1891—1903) হস্তলিখিত পুঁথির কোনও মুদ্রিত তালিকায় মুদ্গল-ভাষ্যের উল্লেখ না পাইয়া তজ্জন্য মোক্ষমূলরের ঐ ভূমিকাই দেখিতে বলিয়াছেন। মোক্ষমূলরকে ইহার একখানা পুঁথি ডাক্তর হল্‌ কাশী হইতে পাঠাইয়াছিলেন।

(২) ৪।৯, ১০।

(৩) ১ অধ্যায়, ১ পাদ, ১ আহ্নিক।

(৪) "লভাধ্বৈ" ও "অশ্নাথ", দুই পদই লেট্‌র। লিঙের অর্থে বেদে লেট্‌ হয়। পা. ৩।৪।৭। পাশ্চাত্যেরা ইহাকে Subjunctive বা Conjunctive

এ দৃষ্টান্তটা B.R. হইতে ধার করা। তাই ইহাতে এষশব্দও আছে। "স্বৈষম্" স্বৈষ-শব্দের দ্বিতীয়ার একবচন। পদটা অন্তোদাত্ত। অতএব 'স্বৈষশব্দও' তাই। (১) স্ব অর্থাৎ নিজের এষ, স্বৈষ। ষষ্ঠীতৎপুরুষ। তাহাতে শব্দটা অন্তোদাত্তই হয়, পূর্ব্বে এক ফুটনোটে 'বক্ষেষ' ও 'শ্রবএষ'র ব্যাখ্যায় দেখাইয়াছি। অথবা স্ব অর্থাৎ স্বীয় এষ, স্বৈষ। কর্ম্মধারয়। তাহাতেও সে শব্দ সাধারণ সমাসস্বরেই অন্তোদাত্ত হয়। (২) কিন্তু স্বরে এখানে অর্থনির্ণয়ের সাহায্য হয় না। 'এষ' যে ইচ্ছার্থক ইষুধাতু হইতে [illegible]পন্ন, তাহাতে সন্দেহ নাই। শব্দটা যে [illegible]ক্ত, তাহাতেও সন্দেহ নাই। কিন্তু কোন্ [illegible]র্থে ঘঞ্? ভাবে, না কর্ম্মে? (৩) শব্দটার [illegible]র্থ এখানে ইচ্ছা, না ইষ্ট অর্থাৎ বাঞ্ছিত? সায়ণের ভাষ্যে ইহার উত্তর নাই। B.R.এর মতে, 'এষ' = ইচ্ছা; 'স্বৈষ' = স্বেচ্ছা, যথেচ্ছাচার। এই ব্যাখ্যাই ঠিক্। উদ্ধৃত শ্রুতির অর্থ এমত নয় যে, যখনই কিছু পায়, কালাকালবিচার না করিয়া তখনই যেন তাহারা তাহা খাইতে পারে, পূর্ব্ব হইতেই পশুদিগের ইহা ইষ্ট অর্থাৎ বাঞ্ছিত ছিল, এবং প্রজাপতি তাহাদের "স্বৈষই করিলেন" অর্থাৎ স্বীয় বাঞ্ছিতই মঞ্জুর করিয়া দিলেন মাত্র। ভোজন-সম্বন্ধে ঐরূপ যথেচ্ছাচার পূর্ব্ব হইতেই পশুদিগের বাঞ্ছিত ছিল, এ শ্রুতিতে বা শ্রুত্যন্তরে কোথাও এ কথা নাই। শতপথের ২ কাণ্ডে ৪ অধ্যায়ে ২ ব্রাহ্মণে প্রথম তিন কণ্ডিকায় আছে, প্রজাপতি দেবপিতৃমনুষ্য-গণের ভোজনসম্বন্ধে দ্রব্যনিয়ম ও কাল-নিয়মের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এই চতুর্থ কণ্ডিকায় শ্রুতির অভিপ্রায় এই যে, পশু-দিগের ভোজনসম্বন্ধে প্রজাপতি সেরূপ কোনও নিয়ম না করিয়া, তাহাদের পক্ষে স্বেচ্ছাই বিধান করিলেন। এক পক্ষে দ্রব্য এবং কালই নিয়ামক, স্বেচ্ছার কোনও স্থান নাই। আর এক পক্ষে স্বেচ্ছাই একমাত্র নিয়ামক, অন্য কিছুর স্থান নাই। "স্বৈষমেব" এই 'এব'তেও সেই বিরোধই সূচিত হই-তেছে। অতএব এ শ্রুতিও অমূল্য বাবুর অনুকূল নয়।

B.R.এর ধৃত আর এক শতপথশ্রুতি-তেও একটা এষশব্দ আছে—

তস্মাদ্দিবা নষ্টৈষ এতি।

১৩।১।৪।৩

তাই দিবসে নষ্টান্বেষণে যায়।

এ শ্রুতিতেও অমূল্য বাবুর উপকার নাই। "নষ্টৈষঃ" অন্তোদাত্ত, নষ্টৈষশব্দের প্রথমার একবচন। নষ্টশব্দের অর্থ, হারানো। 'এষ'র অর্থ এখানে, যে অন্বেষণ করে, অন্বেষী। 'নষ্টৈষ' = নষ্টান্বেষী। (১) নষ্টকে যে অন্বেষণ করে, সে 'নষ্টৈষ'। কর্ম্মভূত নষ্টশব্দের পরে ইষধাতুর উত্তর কর্ত্তৃবাচ্যে অণ্ প্রত্যয়।৮ উপপদসমাস। সমাসের

Mood বলেন। অনাকালশব্দটা কঠিন। আকাল না, অনাকাল। নঞ্ তৎপুরুষ। কাল ও আকাল, বোধ হয়, একার্থক। একটা 'আকাল' পা. ৫।১।১১৪ ও তার বার্ত্তিকে আছে। সেখানে শব্দটার অর্থ কি? কৈয়টের ব্যুৎপত্তি কৃত্রিম বলিয়া মনে হয়।

তার পর পশুরা ইঁহার নিকটে গিয়া বসিল। তাহা-দের জন্য স্বেচ্ছাই বিধান করিলেন, "যখনই তোমরা পাও, সময়ে হউক, অসময়ে হউক, তখনই খাইতে পার"। তাই ইহারা যখনই পায়, সময়ে হউক, অসময়ে হউক, তখনই খাইয়া থাকে।

(১) পা. ৬।১।১০৭, ৮।২।৫।

(২) ঐ, ৬।১।২২৩।

(৩) আর কোনও অর্থের সম্ভাবনা নাই

(১) ঐতরেয়ব্রাহ্মণে (৩।৪৩) এই অর্থে এই নষ্টৈষিন্‌শব্দেরই প্রয়োগ আছে

উত্তরপদস্থ এষশব্দ প্রত্যয়স্বরে অন্তোদাত্ত, অতএব নষ্টৈষশব্দও কৃদুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরে তাই। যেমন, সায়ণের সেই 'এষৈষ'। ভ্রমে BR. 'নষ্টৈষ'র 'এষ'ও আদ্যুদাত্ত এষশব্দের প্রকরণে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। (১)

ষষ্ঠ, নিরুক্তে ৫।২। এ স্থলে কেন, সপরিশিষ্ট নিরুক্তের চৌদ্দ অধ্যায়ের কোনও স্থলে এষ বা এষা শব্দ নাই। এমন কি, যে কয়েকটা ঋকে এষশব্দ আছে, তার একটাও নিরুক্তে উদ্ধৃত নাই। তবে এতদ্‌শব্দের 'এষ' ও 'এষা' অনেক স্থলেই আছে। দুই স্থলে এষণশব্দও আছে। (২) তার অর্থ, এক স্থলে গন্তা বা অন্বেষী, আর এক স্থলে ইচ্ছা বা যার দ্বারা গমন করা যায়। এক স্থলে প্রৈষশব্দ আছে। (৩) তার অর্থ বোধ হয়, প্রৈষ্য অর্থাৎ পরিচারক। দুই স্থলে আবার সম্প্রৈষশব্দ আছে। (৪) তার অর্থ—প্রেষণ, প্রেরণ, নিয়োগ, ব্যাপারণ।

শেষ, অথর্ব্বপ্রাতিশাখ্যে ১।৬৭। এ সূত্রে কেন, এ গ্রন্থেরও কুত্রাপি ঐ শব্দ নাই। এ সূত্রে নয়, আর এক সূত্রে একটা "এষঃ" আছে বটে। যথা—

এষ স যাপ্পনে। ২।৫৭

(১) 'নষ্টৈষ'র 'এষ'কে কর্ম্মপ্রত্যয়নিষ্পন্ন আদ্যুদাত্ত শব্দ ধরিয়া 'নষ্টই এষ অর্থাৎ অন্বেষণীয় যার' এইরূপ বহুব্রীহি করিলেও শ্রুত্যর্থের বড় একটা হানি হয় না বটে। কিন্তু বহুব্রীহি শ্রুতির অভিপ্রেত নয়। কেন না, নষ্টশব্দ প্রত্যয়স্বরে অন্তোদাত্ত। পা. ৩।১।৩। অতএব বহুব্রীহিতে নষ্টৈষশব্দ পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরে মধ্যোদাত্ত হইয়া পড়ে। পা. ৬।২।১। বলিয়াছি, শ্রুতিতে সে শব্দ অন্তোদাত্ত আছে।

(২) ৪।৭; ৬।২২।

(৩) ৩।৭।

(৪) ৯।৪১, ৪২। যজ্ঞপরিভাষার 'প্রৈষ'ই এই 'সম্প্রৈষ'। এই দুই শব্দ এবং পা. ৩।৩।১৬৩ ও ৮।২।১০৪ সূত্রের প্রৈষশব্দ মূলে একার্থক।

এই সূত্রটাই কি তবে অমূল্য বাবুর মনে ছিল? তাও অসম্ভব। এ যে বিসর্গসন্ধিরই একটা মোটা নিয়ম, যাহা স্কুলের বালকেরাও জানে।

"এষা"র দ্বিতীয় সংস্করণে অমূল্য বাবুর সিদ্ধান্তের পৈশাচী অংশটা পরিত্যক্ত হইয়াছে। ভালই হইয়াছে। কিন্তু সেটাও একটু তুলিয়া দেখাই।—

(৫) "প্রাকৃতের মধ্যে 'ঢক্কী' ও 'পৈশাচী' রীতির কোন কোন স্থানে 'স্মরণযোগ্যা' অর্থে কেবল 'এষা'রই প্রয়োগ আছে,—

"হোসেসা তুবং পিউচ্ছাতি"—প্রভৃতি।

'প্রাকৃতলক্ষ্মীনামমালা'য়ও 'স্মরণযোগ্যা' অর্থে 'এষা'র উল্লেখ আছে।"

উদ্ধৃত প্রাকৃত বাক্য কোথায় আছে, অমূল্য বাবু বলেন নাই। তা না জানিলে দৃষ্টান্তটা বুঝিয়া দেখিতে পারি না। আমার বড় সন্দেহ হয়, এ 'এসা'ও এতদ্‌শব্দেরই দৌহিত্রী।

কিন্তু ধনপালপ্রণীত "পাইয়লচ্ছী"তে (১) 'এস' বা 'এসা' শব্দ নাই, তাহা নিশ্চিত। হেমচন্দ্রের "দেশীনামমালা"তেও (২) আমি সে শব্দ খুঁজিয়া পাই নাই।

অমূল্য বাবুর ভূমিকা পরীক্ষা করিলাম। তাঁর সে সিদ্ধান্তটা অসিদ্ধ। চারিটা ঋকের সায়ণভাষ্য তাঁর অনুকূল বটে, কিন্তু সে ভাষ্য অপ্রামাণিক। কবির কাজ হয়ত সায়ণের নজীরেই চলিতে পারে। কিন্তু অমূল্য বাবুর চলা উচিত হয় নাই। কেন না অমূল্য বাবু কবি নহেন, গোঁড়াও নহেন। বেদমন্ত্রে যিনি একেশ্বরবাদের ইতিহাস খুঁজিয়াছেন, তিনি গোঁড়া নহেন। গোঁড়া মতে বেদে ইতিহাস

(১) Edited by G. Buehler. Goettingen, 1879. "পাইয়লচ্ছী"ই সংস্কৃতরূপ, 'প্রাকৃতলক্ষ্মী'।

(২) Bombay Sanskrit Series, No. 17.

হয় না। অনাদিমহাভূতনিঃশ্বাসরূপ সে অনাদি শব্দরাশিতে ইতিহাস নাই। সায়ণের নজীরে কবির কাজও চলা উচিত কি না, কবিরও তাহা বিচার করা ভাল। সংস্কৃত ভাষার দৌলতে, কবির কাজ আটকাইবে না। সায়ণ গেলেও কিন্তু "এষা" যায় না। কৃত্রিম বেদগন্ধটুকু যায় বটে, কিন্তু শব্দটা যায় না। নূতন শব্দ বলিয়া যদি ভূমিকারই প্রয়োজন হইয়াছিল, এক কথায় তাহা হইতে পারিত। "যাকে অন্বেষণ করিতেছি, সে-ই এষা।"

কেন ঐ চারি ঋকে এষশব্দের সায়ণ-ভাষ্য প্রামাণিক নয়, সবিস্তরে তার আলোচনা করিয়াছি। গোঁড়ামির প্রসঙ্গে এখানে একটা কথা আমার মনে পড়িতেছে। সায়ণের গোঁড়ারা অনেকে জানেন না যে, তাঁর বেদভাষ্যের প্রতিবাদ ইউরোপে আরম্ভ হয় নাই, এই দেশেই প্রথম আরম্ভ হইয়াছিল। খ্রীষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে সে ভাষ্য প্রণীত হয়। ষোড়শ বা সপ্তদশ শতাব্দীতেই ভট্টোজিদীক্ষিতের গ্রন্থে তার প্রতিবাদ দেখিতে পাই। অতিগর্ব্বিত আউফ্রেহ্‌ৎও দীক্ষিতের বেদবিদ্যা অপহ্নব করিতে সাহস পান নাই। (১) কত স্থলে যে দীক্ষিত বেদভাষ্যের সমর্থন করিয়াছেন, বেদভাষ্যকে প্রমাণ মানিয়াছেন, বেদভাষ্যবিরুদ্ধ বলিয়া অন্য মতে অবজ্ঞা করিয়াছেন, তারও সংখ্যা নাই। আবার কত স্থলে তার প্রতিবাদ করিয়াছেন। মনোরমার উণাদিপ্রকরণ হইতে সে প্রতিবাদের একটা দৃষ্টান্ত দিই—

যৎ তু মা নঃ শংসো অররুষ ইতি মন্ত্রস্য ভাষ্যে সান্তোঽয়মিতি মাধবেনোক্তং তৎ প্রৌঢ়িবাদমাত্রং ন তু বাস্তবম্। পদস্যাদ্যুদাত্তত্বানুপপত্তিপ্রসঙ্গাৎ। উক্তপ্রয়োগস্য কথন্তেন রাতিনা নঞ্‌সমাসে সৌত্বাৎ। গুরু দ্বেষো অররুষে দধন্তীত্যত্র স্বয়মেব তথা ব্যাখ্যানাৎ। যো নো অগ্নে অররিবাঁ অঘায়ুরিত্যাদিমন্ত্রান্তরসংবাদাচ্চেতি দিক্।

মনোরমাধৃত ঐ "মা নঃ শংসো অররুষঃ ইত্যাদি ঋকে (১) "অররুষঃ" ষষ্ঠ্যন্ত, আদ্যুদাত্ত। সায়ণের মতে পদটা সকারান্ত অররুস্-শব্দের রূপ। কিন্তু পাণিনিতে সে শব্দ নাই। উণাদিসূত্রেও (২) ঋধাতুর পরে উকারান্ত অরুপ্রত্যয় করিয়া উকারান্ত অররুশব্দ সিদ্ধ আছে বটে, কিন্তু সকারান্ত 'অররুস্' নাই। সায়ণ অগত্যা উণাদির সেই অরুপ্রত্যয়টাকেই 'অরুস্' করিয়া লইয়াছেন। কিন্তু তাহাতেও রক্ষা নাই। 'অররু'র মত 'অররুস্'ও প্রত্যয়স্বরে (৩) মধ্যোদাত্ত হইয়া পড়ে, আদ্যুদাত্ত হয় না। বিপদে পড়িয়া সায়ণ তাই বৃষাদির (৪) শরণাপন্ন। এষশব্দের স্বরপ্রসঙ্গে বার বার যাহা বলিয়াছি, এখানেও সেই কথা। তখন যে আপত্তি করিয়াছিলাম, এ ভাষ্যে ভট্টোজি-দীক্ষিতের আপত্তিও তাই। "অররুষঃ"র যদি আর কোনও ব্যুৎপত্তি না থাকিত, তবে অবশ্য সাধারণ প্রত্যয়স্বরের ব্যভিচার স্বীকার করিয়া বৃষাদির আশ্রয় লইতে হইত। কিন্তু দীক্ষিত দেখাইতেছেন, সে পদের অন্য উৎকৃষ্ট ব্যুৎপত্তি আছে। তাহাতে অসাধারণ স্বর মানিতে হয় না, অথচ অর্থ সুসঙ্গত হয়। দানার্থক রাধাতুর পরে ক্বসুপ্রত্যয়ের যোগে ররিবস্‌শব্দ। সে শব্দ প্রত্যয়স্বরে অন্তোদাত্ত

(১) Aufrecht, *Unadi-Sutras*, Preface.

(১) ১।১৮।৩।

(২) ৪।৭৮। উকারান্ত অররুশব্দ ঋগ্বেদেরই মন্ত্রান্তরে আছে—১।১২৯।৩, ১০।৯৯।১০।

(৩) পা. ৩।১।৩

(৪) ঐ, ৬।১।২০৩। বলিয়াছি, বৃষাদি আদ্যুদাত্ত এবং আকৃতিগণ।

বটে। (১) কিন্তু নঞের সহিত তার তৎ-পুরুষসমাসে অররিবস্‌শব্দ আদ্যুদাত্ত। (২) তারই ষষ্ঠীর একবচন, "অররুষঃ"। ঐ আর একটা ঋকে (৩) সায়ণই নিজে চতুর্থ্যন্ত "অররুষে"র এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। প্রকৃত ঋকেরই সদৃশার্থক ঐ আর এক ঋকে (৪) আবার এই অররিবস্‌ শব্দেরই প্রথমার একবচন "অররিবান্‌" প্রযুক্ত আছে। অতএব সায়ণের ঐ ভাষ্য "প্রৌঢ়িবাদমাত্র, বাস্তব নহে"। এটা তিরস্কারের শিষ্টভাষা। সব্রাহ্মণ সারণ্যক চতুর্ব্বেদে ভাষ্যকার, পরম বৈয়াকরণ, পরম ধর্ম্মশাস্ত্রবিৎ, সর্ব্বদর্শন-নিষ্ণাত, উভয়মীমাংসাধুরন্ধর, ব্রহ্মবাদি-বরেণ্য মাধবাচার্য্য! তাঁর নামে এ দেশে কার মাথা না হেঁঠ হয়? কিন্তু ভট্টোজি-দীক্ষিত তাঁহাকেও অভ্রান্ত মানেন নাই। আমাদেরও মানিবার প্রয়োজন নাই।

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র গুহ।
এম-এ, বি-এল

মধ্যযুগের ইউরোপীয় দর্শন।

সেণ্ট্‌ আগষ্টাইন্‌।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

সৃষ্টি সম্বন্ধে ঐশ্বরিক পূর্ব্বজ্ঞান স্বীকার করিতে হইলে বর্ত্তমান পাপ বা অমঙ্গলের উৎপত্তি সিদ্ধ হয় না, এবং মানবেচ্ছার স্বাধীনতাও লোপ পায়। এতদুভয়ের চির-বিরোধ সেণ্ট্‌ আগষ্টাইন্‌ বিশেষ ভাবেই অবগত ছিলেন। ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া মানবের কার্য্যকলাপ সর্ব্বদাই পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন। তাহা হইলে ত মানবের কর্ম্ম-প্রসক্তির একটা বাঁধাবাঁধি নিয়ম থাকিবেই। মানব স্বেচ্ছায় কোন কাজই করিতে পারে না, এবং স্বাধীন ইচ্ছা, দায়িত্ব ও পাপ প্রভৃতি শব্দের অর্থও নাই। ঈশ্বর যদি বস্তু মাত্রেরই মূল কারণ হন, তবে ত আমরা বলিতে বাধ্য যে, অমঙ্গলও ঈশ্বরের ইচ্ছা-প্রসূত। আর, মঙ্গলের অভাবকেই যদি অমঙ্গল বলা যায়, তবে কি ইহাও সত্য নয় যে, ঈশ্বর মানবাত্মাকে জ্ঞানালোক প্রদানে অসম্মত হইয়াছিলেন বলিয়াই, জগতে এই অভাবের উৎপত্তি হইয়াছে?

এস্থলে সেণ্ট্‌ আগষ্টাইন্‌ পূর্ব্বনির্দ্দেশ সম্বন্ধে তাঁহার দার্শনিক যুক্তির অসংলগ্নতা ভক্তির দ্বারা দূর করিতে চাহিয়াছেন। মানব-মাত্রেই জানে যে, সে পাপী এবং স্বীয় চেষ্টায় পাপ দূর হয় না। স্বভাব-মানব অমঙ্গলের দাস এবং ঈশ্বরানুকম্পাই রক্ষার উপায়। কিন্তু ঈশ্বরানুগ্রহ লাভ কি মানবের ইচ্ছাধীন? কখনই নহে। উহা ঈশ্বরেরই অভিরুচি। ঈশ্বর ইচ্ছা করিয়াই মানবকে ত্রাণ করেন, নতুবা সকল লোকেই ত্রাণ পাইত। যাহারা তাঁহার অনুকম্পার উপযুক্ত, কেবল তাহা-দিগকেই তিনি মুক্তির জন্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার এই নির্দ্দেশ বা মনোনয়ন (election) সনাতন সত্যরূপে মানব সৃষ্টির

---

(১) যথা, ঋ. ১।১৩৮।৪।

(২) পা. ৬।২।২, বার্ত্তিক ৩।

(৩) ৭।৫৬।১৯। তার চতুর্থ পাদ, "গুরু দ্বেষো অররুষে দধন্তি"।

(৪) ১।১৪৭।৪। তার প্রথম পাদ, "যো নো অগ্নে অররিবাঁ অঘায়ুঃ"।

শ্রীশ্রীমহামায়া বিজয়তে ।

দৃপ্তৈর্বিবাদশতসংশমনৈর্ব্বলাদ্ভি-
র্বাদৈরজস্রমুরুশক্তিনিধীরনাদৈঃ ।
যস্যার্জুনাদ্যনুরণান্বিত রামসম্মী
বিদ্যার্থিকারনিলয়া বরিশালপুর্য্যাম্ ॥ ১ ॥

তত্রৈব হর্ম্ম্যে স্বামিজোমিতাখ্যাৎ-
বসদ্বিশালে ব্যবহারকাণঃ ।
আদীপয়দ্বীপমিমং হিমাংশোঃ
স্বরূপচন্দ্রঃ স গুহান্বয়ার্কঃ ॥ ২ ॥

স্বামী স্বকালার্চিতসর্ববাচ-
স্পতীশ্বরোঽদভ্রভুজঃ সমন্তুঃ ।
বোঢ়াপি বিদ্যার্থিধুরাঃ সহস্রং
চতুর্ধুরীণো বিষয়ৈকনাথঃ ॥ ৩ ॥

অথ মানিযুতদুর্গানামতদ্ধর্ম্মপত্ন্যা
বিয়দগুবসুসোমোন্মীলিতে শাকবর্ষে ।
জগদধিবসতীমাং যামহো বিশ্বধাত্রীং
বসতিরিহ হি তস্যৈ দিৎস্যতে সুশ্রদ্ধয়েষা ॥ ৪ ॥

অর্পিতং মহামায়ায়া এতন্মন্দিরকং শুভম্ ।
দুর্গায়ৈ দুর্গয়ানেন প্রীয়তাং পরমেশ্বরী ॥ ৫ ॥

...শিপুর, সন ১৩৩৫ । ——শ্রী অবিনাশচন্দ্র গুহ, এম্-এ, বি-

* বাকরগঞ্জ

[redacted] জিলার অন্তঃপাতী কাশীপুর কাঠগড় পল্লীতে বাকলা-চন্দ্রদ্বীপের রাজত্বকালীন রাজা উদয় নারায়নের সময় একটি পুষ্করিনী খননকালে "মহামায়া দেবী"র বিখ্যাত প্রতিমূর্ত্তি প্রাপ্ত হওয়া যায়। রাজা উদয়নারায়ন দেবী কর্ত্তৃক স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া স্বয়ং পারিষদবর্গের সমভিব্যাহারে কাঠগড় পল্লীতে আসিয়া বিগ্রহটি সাবিরপাশা রাজধানীতে লইয়া যাওয়ার জন্য অভিলাষী হয়েন। দেবীর দ্বিতীয়বার স্বপ্নাদেশে উক্ত মূর্ত্তি কাশীপুর কাঠগড় পল্লীতেই রাজা কর্ত্তৃক যথাশাস্ত্রমতে স্থাপিত হয়। এই ইতিহাস প্রসিদ্ধ স্থানে বরিশাল-রামচন্দ্রপুর নিবাসী প্রসিদ্ধ উকীল ও জমীদার ৺স্বরূপ চন্দ্র গুহ চৌধুরী মহাশয়ের দ্বিতীয়া পত্নী শ্রীযুক্তা দুর্গামনি গুহ চৌধুরানী মহোদয়া নিজ প্রভূত অর্থব্যয়ে ৺মহামায়া বিগ্রহের ইষ্টক নির্ম্মিত মন্দির প্রস্তুত করাইয়া দেবীর নামে উৎসর্গ করতঃ পূজা-অর্চনাদির সুবন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছেন। প্রতি বৎসর মাঘী সপ্তমীর দিন উল্লিখিত স্থানে (কাশীপুর কাঠগড় পল্লীতে) মেলা হয় এবং ঐ দিন নানাস্থান হইতে বহু সহস্র লোকের সমাগম হইয়া থাকে। "শ্রীশ্রীমহামায়া বিজয়তে" শীর্ষক সংস্কৃত কবিতাটি([redacted] দেবীর নূতন ইষ্টক নির্ম্মিত মন্দির প্রতিষ্ঠা কল্পে লিখিত হয়।

("কায়স্থ-সমাজ", ১৮শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, শ্রাবণ, ১৩৪৪, পৃ: ১২৫-১২৬ এবং উহাদের পাদটীকা দ্রষ্টব্য)।

স্বরলিপি প্রকাশন — "মন্দিরা", আষাঢ়-১৩৬১, পৃ: ১৮৭-১৯২; "সঙ্গীত-বিজ্ঞান প্রবেশিকা," পৌষ ১৩৬৩, পৃ: ৩২-৩৭।

Old Dhyan.

(Her right) leg bent forward and poised on the chest of the corpse, laughing a boisterous terrific laugh, supre[me] with a sword, a blue water-lily, a knife and a skull-bone in (her) hands, born of the seed hum, of small stature, and bedecked with one huge blue-and-brown matted lock and many a serpent Ugratara throws the lassitude of the three worlds into the skull-bone and kills it out.

Tara-rahasya-Tantra, III. 2. 3.

New Dhyan.

Let him worship (her, who is the embodiment of) [v]olition, knowledge and action, the desirous female, [t]he fulfiller of desires, (the embodiment of) gratificat[ion], [h]erself fond of gratification, the afforder of gratification, [th]e Great Goddess upon the corpse, the great corpse with a smile (on its face) as engaged in coitus — [in] the reverse order, who is Ugratara, higher than [th]e highest, with a knife and a sword in her right (hands), the Supreme Saviour, with a blue lotus on her left side and a drinking bowl under it, beautiful in rows of necklaces [of] heads, adorned with streaks of blood, laughing the terrific laugh, having three eyes, imparting knowledge for evermore, wearing a single lock of hair, wearing a huge lock of hair, bedecked [w]ith the king of serpents, resplendent with golden crowns and with teeth (as white as) Kunda blossoms.

Tara-rahasya-tantra, III. 2. 8.

(Rendered into English from Original Sanskrit by Avinas Ch. Guha, M. A., B. L., Vakeel, High Court Calcutta). Published in Barisal Hitaishi, Barisal Bengal 5th April, 1945, p. 5, col. 1 & p. 4, cols. 1-2.

~~Old Dhyan.~~

~~(Her right) leg bent forward and poised on the c hestoff t~~

নবধ্যানম্।

শবোপরি মহাদেবীং শবেশ হস্ত্য সংযুতাম্।
বিপরীত রতাসক্তাং উগ্রতারাং পরাৎপরাম্॥
কর্তৃকাং খড়্গ সংযুক্তাং দক্ষিণে ধারিণীং পরাম্।
বামহস্তে নীলপদ্মং চষকং তদধঃ সৃতম্॥
মুণ্ড মালা বলি রম্যাং রক্তবাস বিভূষিতাম্।
স্মিতহাস্যাং ত্রিনেত্রাঞ্চ সর্ব্বদা জ্ঞানদায়িনীম্॥
এক বেণীং সহস্র বেণীং স্বর্ণরত্ন বিভূষিতাম্।
সুবর্ণ মুকুটৈঃ শোভাং রাজতে দন্ত কুন্দকাম্॥

প্রাচীন ধ্যানম্।

প্রত্যালীঢ় পদার্পিতাঙ্ঘ্রি শবহৃদ্ ঘোরাট্টহাসাপরা।
খড়্গেন্দীবর কর্ত্রী খর্পর ভুজা হুঙ্কার বীজোদ্ভবা॥
খর্ব্বানীল বিশাল পিঙ্গল জটাজূটৈক নাগৈর্যুতা।
জাড্যং ন্যস্য কপালকে ত্রিজগতাং হন্ত্যুগ্রতারা স্বয়ম্॥
